চাষীর ফসল

শ্রীঅমরনাথ রায়

ফেলো অফ দি রয়েল হর্টিকালচারল সোসাইটী; মেম্বর,
রয়েল এগ্রিকালচারল সোসাইটী; মেম্বর, ন্যাশান্যাল রোজ
সোসাইটী (লণ্ডন); বণ্ডেড মেম্বর, ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ
ডেলিভারী এসোসিয়েসন (ইউ. এস্. এ.);
ফার্ম্মার ও কৃষি-লক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক;
গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী এবং
বহু কৃষিগ্রন্থ-প্রণেতা।

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীঅমরনাথ রায়
দি গ্লোব লাইব্রেরী
২৫, রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৪০ সাল—১২০০ সংখ্যা
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ সাল—১২০০ সংখ্যা
তৃতীয় সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৪৮ সাল—১২০০ সংখ্যা

মুদ্রাকর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

অন্ন-সমস্যা যখন তার বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে অতি প্রকট-ভাবে এদেশে দেখা দিল এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হাজার হাজার ডিগ্রীধারী ছাত্র যখন রোজগারের কোন পন্থা খুঁজে না পেয়ে বৎসরের পর বৎসর বেকারের দলকে পুষ্ট করতে লাগল, তখন এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকে মস্তক সঞ্চালন সুরু করলেন। এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক মত দেখিয়েছেন কিন্তু কোন মনোমত উপযুক্ত পন্থা আজও উদ্ভাবিত হয়নি। অনভিজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে যে দিন থেকে আমরা কৃষিকার্য্যের গুরু দায়িত্বভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, সেই দিন থেকেই আমাদের এই দুর্দ্দশার আরম্ভ। আজকাল এই সমস্যার জন্য বা যে কোন কারণেই হউক শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে চাষ-বাস সম্বন্ধে বেশ একটা আগ্রহের ভাব দেখা যাচ্ছে। দেশের পক্ষে এটা অতি সু-খবর বলতে হবে। এই সময়ে কৃষিকার্য্য বা চাষ-আবাদ সম্বন্ধে একটু উপদেশ পেলে ভদ্র কৃষকদের সামান্য উপকার হতে পারে এবং কয়েকটি নূতন জাতীয় বিশেষ আয়কর ফসলের চাষ প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশের শিক্ষিত ভদ্র বেকার যুবকগণের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করতে পারলে এই সমস্যার আংশিক সমাধান এবং লুপ্ত কৃষিশিল্পের পুনরুদ্ধার হতে পারে এই আশা করে

'চাষীর ফসল' নামক পুস্তকখানি লেখা হয়েছে। পুস্তকখানিতে খুব সহজ ও সরল ভাষায় চাষ সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনভিজ্ঞ ও ভদ্র কৃষকমণ্ডলী এই পুস্তক পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে শ্রম সফল জ্ঞান করব। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তাঁদের জানাচ্ছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা ফুরাইয়া যাওয়ায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তৃতীয় সংস্করণ বাহির করা হইল।

বিনীত—

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভারতবর্ষ চাষীর দেশ। এদেশের শতকরা নব্বইজন লোক তাদের প্রতিদিনের অন্নের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাষের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু চাষের সঙ্গে যে দেশের এমন একটা ঘনিষ্ঠ সংশ্রব সেই দেশেই চাষে সবচেয়ে বেশী অবহেলা। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, হিমে কেঁপে যারা জাতির মুখে অন্ন তুলে দেয় তাদেরই করি আমরা সবচেয়ে বেশী অবজ্ঞা। তাই এদেশে 'চাষা' কথাটা একটা ঘৃণার আখ্যা। এই অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ফলে এদেশে ঘটেছে চাষের অবনতি এবং একদিন যার নাম ছিল শস্যশ্যামলা, সেই দেশেই শস্য ফলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম —দুর্ভিক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে দেশের নিত্যসহচর। তাই এদেশে কৃষি বিষয়ে কোনো সাহিত্য নেই। চাষ সম্বন্ধে যে দু'চারখানা বই আছে সেগুলো যথার্থ বিদেশী কৃষি-সাহিত্যের ছায়ানুকরণমাত্র।

কিন্তু এখন এসেছে একটা দ্রুত বিবর্ত্তনের যুগ, পৃথিবীর সকল জাতিরই মধ্যে পড়েছে জাগরণের সাড়া। এই জীবন দিনে যে জাতি অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে, চলমান জাতিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে না পারবে, সে অক্ষম জাতির লোপ বহুদূর নয়। এই জাগরণের ঢেউ

এসে লেগেছে আমাদের দেশে। তাই একদিন যাদের দিক থেকে আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়েছে তাদেরই দিকে, তাঁরা বুঝেছেন যে চাষের মধ্যেই যে জাতির ভিত্তি নিহিত, চাষের উন্নতি ছেড়ে সে জাতির উন্নতি হ'তে পারে না। তারপর বর্ত্তমানে আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে যখন সহরে বেকার-সমস্যা দিন দিন জটিলতর হ'য়ে উঠেছে তখন অ-কর্ম্মান্বিত শিক্ষিত যুবকদের অনন্যোপায় হয়ে চাষের দিকেই ব্যাকুলভাবে চাইতে হচ্ছে। তাই এখন রব উঠেছে—"Back to the village back, to the land"—ফিরে চল মাঠের পানে। কিন্তু মাঠের পানে চলবার পাথেয় তাদের নেই। কলেজের সেক্সপীয়ার, টেনিসন তাদের স্থূল মাটির রহস্যের সন্ধান দেয় না, এবং পূর্ব্বেই বলেছি চাষ সম্বন্ধে যে দু'চারখানা বই বাংলা ভাষায় আছে সেগুলো প্রায়ই বিদেশী বইএর প্রতিধ্বনিমাত্র।

এমন দিনে খ্যাতনামা 'গ্লোব নার্শরী'র উদ্যোগী স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় বাংলা ভাষায় বাংলার চাষীদের জন্য 'চাষীর ফসল' বইখানি রচনা করেছেন। তাঁর এ অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অমরবাবুকে আমি ভালরূপে জানি। কেতাবি বিদ্যার পুঁজি তাঁর কিছু নেই, প্রবীণতার গর্ব্ব করবার বয়সও তাঁর নয়। সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারভাবে উদয়াস্ত মাটির উপরে

নিজের হাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করেছেন সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই তাঁর সম্বল। সুতরাং 'চাষী' হবার দুঃসাহসিকতা যাঁদের মনে জেগেছে তাঁদের কাছে এই 'চাষীর ফসল' সমাদৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বইখানি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হ'য়ে কৃষি সন্ধানীদের সহায় হোক —এই কামনা করি।

৫ই মাঘ,
১৩৪০

শ্রীনির্ম্মল দেব, এল, এজি
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সরকারী কৃষিফার্ম্ম,
রাজসাহী

উৎসর্গ

প্রবীণ সাহিত্যিক ও কাশীমবাজার রাজ ষ্টেটের
ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়

শ্রীচরণেষু

আমার সামান্য শক্তিতে কৃষি-সেবার উচ্চাশা একরূপ
দুরাশা মনে করে যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম
তখন আপনিই আমাকে আশার আলোক
দেখিয়েছিলেন। আপনারই শুভ আশীর্ব্বাণী
নিয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর
হয়েছি। সেজন্য

'চাষীর ফসল'

নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ
আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত:

'অমর'

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

চাষের প্রথম কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তন্তুবর্গ (Fibre Crops)

তৃতীয় অধ্যায়

মিষ্টবর্গ (Sugar Crops)

চতুর্থ অধ্যায়

তৈলবর্গ (Oil Crops)

পঞ্চম অধ্যায়

ডাইল শস্য (Pulses)

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্যশস্য (Cereal Crops)

সপ্তম অধ্যায়

নেশার গাছ ও মসলা (Spices & Narcotics)

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ফসল (Underground Crops)

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্টাংশ

(ক)

(খ)

চাষীর ফসল

প্রথম অধ্যায়

চাষের প্রথম কথা

কৃষিকার্য্য ও তাহার উদ্দেশ্য

মানুষ তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য যে সমস্ত কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রকৃতি হইতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্যাদি আহরণ করে, সেই উপায় বা প্রণালীকে কৃষি আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং কৃষি বলিলে ব্যাপক অর্থে উদ্ভিদ্ উৎপাদন ও পশুপক্ষী পালন ইত্যাদি সমস্তই বুঝায়। কিন্তু সচরাচর আমরা কৃষির ব্যবহারিক অর্থ হিসাবে ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করা ইহাই বুঝিয়া থাকি। কৃষিকার্য্য প্রাচীনকালে গৌরবজনক কার্য্য ছিল। রাজা, প্রজা, ধনী, বিজ্ঞানবিদ্ সকলেই কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষিকার্য্য

গৌরবজনক কার্য্য নহে বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে ও এদেশে ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকুরীকেই তাঁহাদের জীবনযাপনের প্রধান অবলম্বন জ্ঞান করিয়া কৃষিকার্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্যকে অবহেলা করেন এবং উহা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! দেশের নবীন যুবক পরাধীনভাবে থাকিয়া চাকুরী দ্বারা উপার্জ্জনের ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আজকাল কৃষি বিষয়ে মনোযোগী হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া আমরা আজ সব হারাইয়া বসিয়াছি, কারণ শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন দেশ, কোন জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। সেই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল ভিত্তি—কৃষি। আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ কৃষির অবমাননা বা কৃষিকার্য্যে অবহেলা করা।

দেশের নিরক্ষর লোকদিগের হস্তে আমরা যাবতীয় কৃষিকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া নিরস্ত হইয়া আছি। পূর্ব্বে লোকের কৃষিকার্য্যের ধারা জানা ছিল। কোন্ সময়ে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল দেওয়া উচিত, কোন্ জমি ভাল, কোন্ জমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী, কোন্ শস্যের পর কি শস্য পর্য্যায়-ক্রমে চাষ দিলে ফলন অধিক হয়, কোন্ ফসলে কি সার দেওয়া আবশ্যক, কোন্ সারে কি শস্যের উপকার হয়, কোন্ কোন্ মাসে কি কি ফসলের চাষ দেওয়া উচিত, কোন্ সার কত

পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কোন্ বৎসরে কোন্ শস্য ভালরূপ জন্মিবে, কোন্ শস্যের কিরূপ ফলন এবং কি উপায়ে তাহা অপেক্ষা অধিক ফলাইতে পারা যায়—এ সমস্ত বিষয় তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত কৃষিজীবীর সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস হওয়ায় এ-সমস্ত বিষয় নিরক্ষর কৃষকদিগের অবিদিত। কৃষি সম্বন্ধীয় দুই এক-খানা পুস্তক পড়িয়া কিংবা যে-কোন কৃষিশস্য হউক না কেন, দুই এক বৎসরের পরীক্ষায় তাহার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে।

ধান, যব, গম, ভুট্টা, মুগ, ছোলা, তিল, মটর, অড়হর, ইক্ষু, পান, তামাক, আলু, কচু, ওল, মূলা, কপি, বেগুন, পটল, শাকসজী প্রভৃতি এবং পাট, শণ, কার্পাস, চা, কাফি, রবার, নীল, লাক্ষা, রেশমকীট বা গুটিপোকা ও শাল, সেগুন, মেহগ্নি, শিশু, জারুল প্রভৃতি বাহাদুরী কাষ্ঠ সমস্তই কৃষিদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মানবের খাদ্যের জন্য যাহা উৎপন্ন করা হয়, তাহা খাদ্য-কৃষি এবং পাট, রেশম, কার্পাস ও কাষ্ঠাদি হইতে বস্ত্র, রং প্রভৃতি শিল্পের উপাদানের নিমিত্ত যাহা উৎপন্ন করা হয়, তাহাকে ব্যবহারিক-কৃষি বলা হইয়া থাকে। কিরূপ সার প্রয়োগ করিলে জমি হইতে ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে, সার না দিয়াও বা অল্পসারে অথচ জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস না করিয়া কিরূপে জমিতে অধিক ফসল হইতে পারে, কি

উপায় অবলম্বন করিলে জমি হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করা যায়; কি পর্য্যায়ে জমি চাষ করিলে জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয় না, যে স্থানে যে দ্রব্য জন্মে না, কিরূপে সে স্থানে সেই দ্রব্য জন্মান যাইতে পারে—এইরূপ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করা কৃষিকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞতা

কৃষিকার্য্যে সফলকাম হইতে হইলে কয়েকটি বিষয় বিশেষ যত্নসহকারে পালন করা আবশ্যক। আমরা শস্যাদি বা কোন কৃষিদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি না। কোন একটি দ্রব্যের সহিত ২।৩ প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে তাহা হয়ত সামান্য পরিশ্রমে পৃথক্ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা উহা ভেজাল ও ময়লা দ্বারা পূর্ণ রাখি। হয়ত বা কোন উপায় অবলম্বন করিলে শস্য বিশেষের উন্নতি করিতে পারা যায় কিন্তু আমরা চিরপুরাতন প্রণালী ছাড়িয়া নূতন উপায় অবলম্বন করিতে চাই না, এইজন্য কৃষিকার্য্যে আমরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই না। যে-কোন উৎপন্ন দ্রব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলে, উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইতে পারিলে, বীজ সমুদয়

সতেজ এবং সুপুষ্ট হইলে, তাহা স্বতঃই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহা বিক্রয়েও অধিক লাভ করিতে পারা যায়।

কৃষিকার্য্য করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা আবশ্যক, ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব অল্পই হইয়া থাকে। চাষের জমি যেন হাট-বাজারের নিকটে হয়, সে স্থান হইতে রেলপথ যেন অধিক দূরে না হয়, জমির সন্নিকটে যেন কোন নদী বা জলাশয় থাকে, শকটাদি চলাচলের রাস্তা থাকে এবং আবশ্যক মত কর্ম্মঠ লোকের যেন অভাব না ঘটে। খরচ কম লাগিবার জন্য অল্প মজুরিতে অজ্ঞ অলস লোক নিযুক্ত করিলাম। যে-কার্য্যটি পাঁচজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সেস্থানে দশজন লোক লাগাইলাম। গো-মহিষাদির দ্বারা যে কাজ শীঘ্র ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেখানে মজুর নিযুক্ত করিলাম। চাষের সময়ে হয়ত লোক পাওয়া গেল না। এইরূপ গোলযোগ ঘটিলে কৃষিকার্য্যে খরচের মাত্রা লাভ ছাড়াইয়া উঠে। বস্তুতঃ কৃষিকার্য্য সখের বা অবহেলার বিষয় নহে। ইহাতে যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। কৃষিকার্য্যে অনেক কিছু শিখিবার বস্তু আছে, এইজন্য দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর কৃষকদিগকেও অবহেলা করা উচিত নহে। উহাদের নিকট হইতেও অনেক শিখিবার বা জানিয়া লইবার আছে। বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ কৃষকদিগের সহিতও কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরামর্শমত কার্য্য করা ভাল।

কৃষিকার্য্য অপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং জটিল বিষয় আর কিছুই নাই। শিল্প, বিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি সমস্তই কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

মূলধন

পূর্ব্বে দেশের ইতর-ভদ্র অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা নিজেরাই স্বহস্তে চাষের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কৃষকদের অল্প সংসার, অল্প অভাব—কাজেই অল্প পয়সায় কৃষিকার্য্য চলিত। কোনদিনই গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব তাঁহাদের অনুভব করিতে হইত না; আবশ্যকীয় দ্রব্যের কিছুরই অভাব ছিল না, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইত। আজকাল কৃষিকার্য্য বিনা পয়সায় নির্ব্বাহ হয় না। দেশের লোকের মনে আর তেমন উৎসাহ নাই, তাঁহাদের মনে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা জাগে না—তাঁহারা নিরুদ্যম, সামর্থহীন ও দুর্ব্বল। স্বহস্তে কোন পরিশ্রমজনক কার্য্য করিবার মত তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। এইজন্য সমস্ত কাজেই তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহাতে অর্থেরও আবশ্যক। ভদ্রলোক পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নিজে করিতে পারেন না। এক বিঘা জমি চাষ করিতে ধরুন দুইজন লোক আবশ্যক কিন্তু সে স্থলে নিজে মজুরের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য্য

করিলে হয়ত সে স্থলে তুই বিঘা জমি চাষ করা যাইতে পারে। নিজে সঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করিলে মজুরেরা ফাঁকি দিতে পারে না, সুতরাং কাজের পরিমাণও বেশী হয়।

"খাটে খাটায় লাভের গাতি তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি।
ঘরে বসে সুধায় বাত তার কপালে হা-ভাত ॥"

ভদ্রলোকের দ্বারা এ সমস্ত কার্য্য হয় না, সুতরাং ভদ্র কৃষি-জীবীর যেরূপ অধিক পরিমাণ জমি আবশ্যক, তদনুযায়ী ব্যয়ও তাঁহাকে করিতে হইবে। এইজন্য কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কিছু মূলধন থাকা আবশ্যক। সামান্যমাত্র মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম এবং দৈববিড়ম্বনাবশতঃ এক বৎসর হয়ত শস্য বা ফসল নষ্ট হইল, সুতরাং অর্থের অভাব হইল; পুনরায় অর্থ সংস্থান করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দিলাম এবং আমার দ্বারা এসব কার্য্য চলিবে না, ভাগ্য খারাপ প্রভৃতি বাক্যে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকিলাম—এরূপ করিলে কৃষিকার্য্য চলে না। যদিও বা দৈব-তুর্ব্বিপাকে এক বৎসর ফসল নষ্ট হইল সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পর বৎসর পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কিসে উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক ফলন পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

কৃষিকার্য্যে লাভালাভ

অনেকে দুই-একটি বিশেষ কৃষি মনোনীত করিয়া সেইমত কার্য্য আরম্ভ করেন। একটি বিস্তীর্ণ জমি ও কিছু অধিক মূলধন লইয়া বহুবিধ কৃষির অনুষ্ঠান করিতে পারিলে একটি বিশেষ চাষে লোকসান হইলেও গড়পড়তা লাভের মাত্রাই অধিক হওয়া সম্ভব কিন্তু ইহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। বিশেষত এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা যদি নিজে সুনিপুণ, সুচতুর, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী না হন তাহা হইলে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দৈনিক কার্য্যের হিসাব করা এবং সমস্ত দিনে কি কি কার্য্য করা হইল এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট রহিল, পরদিন প্রথমেই কোন্ কার্য্য আরম্ভ করা উচিত ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিলে পরদিন প্রাতঃকালেই সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। ক্ষেত্রস্বামী এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

যাবতীয় কৃষিকার্য্যেই অল্প-বিস্তর লাভালাভ হইয়া থাকে। ধান, যব, গম, পাট, শণ, সর্ব্ববিধ কলাই প্রভৃতি রবিশস্যে এবং ধনিয়া, জিরা, মৌরী, মেথি, হলুদ প্রভৃতি বেনেতি শস্যে লাভ কম হইলেও ইহাদের আবশ্যকতা খুব বেশী। কার্পাস,

ইক্ষু, পান, লঙ্কা, তামাক এবং আলু, বেগুন, ওল, কচু, মান, সীম, কপি, মটর প্রভৃতি নানাবিধ তরিতরকারী ও শাকসব্জীর চাষ বিশেষ লাভজনক। আম, জাম, লিচু, জামরুল, কলা, পেয়ারা, পেঁপিয়া, আঙ্গুর, লেবু, আনারস, তাল, সুপারি, খেজুর, নারিকেল, তরমুজ, ফুটী, শশা, খরমুজ প্রভৃতি ফলের চাষেও উত্তম লাভ হইয়া থাকে। বেল, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, নবমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের চাষও বিশেষ লাভজনক। * শাল, সেগুন, শিশু, জারুল, বাবলা, কাঁঠাল, মেহগ্নি প্রভৃতি গাছও কাষ্ঠের জন্য চাষ করা যাইতে পারে। ইহাদের চাষ অতি লাভজনক হইলেও গাছগুলি বড় হইয়া কাজে লাগিতে বহুদিন বিলম্ব ঘটে। চা, কাফি, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, খদির, জায়ফল, নটকান, রবার, টাং প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ লাভজনক। অশোক, বাকস, সিনকোনা, অশ্বগন্ধা, কুঁচিলা, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষও বিশেষ লাভজনক। উপরিউক্ত কৃষি উদ্ভিদের চাষ করিতে পারিলে বিপুল ধনাগম হইতে পারে কিন্তু যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বা মূলধন ব্যতীত কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে।

---

* এই সমস্ত ফুলের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে লেখকের ‘পুষ্পোদ্যান’ নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

মৃত্তিকা-পরীক্ষা ও জমি-নির্ব্বাচন

ভূমিই কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। যদিও বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল পরীক্ষাগারে মৃত্তিকাহীন টবে ও জারে সার ও জলদ্বারা নানারূপ ফসল ফলাইতেছেন ও তাঁহারা আশ্বাস দিতেছেন ভূমিশূন্য স্থানেও তাঁহারা কৃষিকার্য্যে সফলকাম হইবেন এবং সেরূপ সুদিন সমুপস্থিত—তাহা হইলেও বিস্তীর্ণ (extensive) কৃষিযুগ চলিয়া যাইবে না। সুতরাং ভূমিই কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন। সেইজন্য স্বভাবতই কৃষিকার্য্যের কথা উঠিলে প্রথমেই কৃষকের মনে পড়ে তাহার ক্ষেত্রের কথা; জমির উর্ব্বরতা, তাহার অবস্থান, যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা, খাজনা, মূল্য প্রভৃতি। মৃত্তিকা বলিলেই চকিতে মনের কোণে উঁকি মারিয়া উঠে আমাদের পদতলের মাটি হইতে পারিপার্শ্বিক নানাবিধ মাটির স্তর। আর এই স্তর লইয়াই পৃথিবী গঠিত হইলেও আমরা সাধারণ মাটি বলিতে মনে করি শুধু বালু-কাদা দিয়াই পৃথিবী গঠিত—তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। যাহা হউক, মাটি বা জমি বলিতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, আমরা যাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট কিংবা জমিদারকে খাজনা দিই তাহার নামই জমি। আর এই কর বা খাজনা নিরূপণ হয় জমির উর্ব্বরতা, ব্যবসায় কেন্দ্রের সুবিধা ও মূল্যবান ফসল বা নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা ও পারিপার্শ্বিক

অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া। সেইজন্য জমি নির্ব্বাচন করিতে হইলে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি নজর রাখিয়া জমি ক্রয় করিতে হয়। তাহার পরই জমি নির্ব্বাচন করিতে হইলে সেই জমিতে কিরূপ মৃত্তিকা ও তাহাতে কি কি পদার্থ আছে এবং সেই মাটিতে কিরূপ উদ্ভিদ্ ভালরূপ জন্মিতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। মৃত্তিকায় কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আছে তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা দরকার। নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ উপায়ে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথমে সামান্য মাটি উঠাইয়া ওজন করিতে হইবে এবং তাহা উত্তমরূপে রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া পুনরায় ওজন করিলে যে পরিমাণ কম হইবে মাটিতে সেই পরিমাণ জল ছিল বুঝিতে হইবে। ঐ শুষ্ক মাটি ভাঙ্গিয়া অগ্নির উত্তাপে ভালরূপে পোড়াইয়া ওজন করিলে যে পরিমাণ কম হইবে তাহা উদ্ভিজ্জাংশ এবং অবশিষ্ট মৃত্তিকা রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা পরীক্ষা করিলে লৌহ, চূণ, ক্ষার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যাইবে। অগ্নির উত্তাপে পোড়াইবার পূর্ব্বে রৌদ্র-শুষ্ক মৃত্তিকার কিয়দংশ জলে গুলিয়া অল্পক্ষণ পরে জল স্থির হইলে কর্দ্দমাক্ত জল অন্য পাত্রে রাখিতে হইবে। এইরূপে তিন-চারিবার বা ততোধিকবার রাখিবার পর যখন কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল বাহির না হইয়া পরিষ্কার জল বাহির হইবে তখন পাত্রস্থিত পদার্থ শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যাহা হইবে সেই পরিমাণ বালুকা এবং পাত্রস্থ জল থিতাইলে আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তলার ঘন

পদার্থ রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া ওজন করিলে যাহা হইবে তাহা এঁটেল মাটির অংশ বুঝিতে হইবে। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা মৃত্তিকায় কত পরিমাণ বালুকা, কত পরিমাণ এঁটেল মাটি, কত পরিমাণ উদ্ভিজ্জাংশ এবং কত পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য আছে জানিতে পারা যাইবে।

মৃত্তিকা বিভাগ

কৃষি সম্বন্ধে মৃত্তিকার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে কি প্রকারে বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকার উদ্ভব হয়, কত প্রকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের উপযোগী তাহা কৃষকের জানা একান্ত আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ মধ্যে মৃত্তিকাস্তরের বিভিন্ন গঠনপ্রণালী বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর যথেষ্ট অনুসন্ধান হইয়াছে ও আজ আমরা বৈজ্ঞানিকগণের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মৃত্তিকার উপাদানাদির বিষয় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া কৃষিকার্য্যে জমির ব্যবহারিক দিক সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারি। যে-কোন স্থানের মৃত্তিকাকে, প্রধানত, উপরের স্তরের মৃত্তিকা (turf or surface soil), প্রধান মৃত্তিকা (soil) বা নিম্নস্তরের মৃত্তিকা (sub-soil), কঙ্করময় মৃত্তিকা (rubble), তল পাথর (rock) ইত্যাদিতে

ভাগ করা হয়। প্রথম তিন প্রকার মৃত্তিকার সহিত কৃষি-কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ মৃত্তিকাই, জল, বায়ু ও উত্তাপের রাসায়নিক ক্রিয়াবশতঃ পাহাড় সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরিস্তরের মৃত্তিকা সর্ব্বদা জল বায়ু রৌদ্র শীত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সকলের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়ার অতি কোমল, চিক্কণ ও সচ্ছিদ্র হইয়া পড়ে। কিন্তু নিম্নস্তরের মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্তরূপে পরিবর্ত্তনের অভাবে এবং উপরিস্থিত স্তরের প্রচণ্ড চাপবশতঃ অনেক পরিমাণে স্থূল, কর্কশ ও কঠিন ভাবাপন্ন থাকে। উপরের স্তরের মৃত্তিকা অপেক্ষা ইহা অনুর্ব্বর। কোন কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকার বিষয় বলিতে গেলে উক্ত উভয়বিধ মৃত্তিকা সম্বন্ধেই আমাদিগকে বলিতে হয়। সাধারণ মৃত্তিকা নিম্নলিখিত এক বা ততোধিক বা সর্ব্ববিধ উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে।

১। খনিজ পদার্থ:—বালুকা, কর্দ্দম, চূণ, লবণ, সোরা, ক্ষার প্রভৃতি।

২। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ:—নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের দেহের বিভিন্ন অংশ এবং প্রাণিগণের মল, মূত্র, রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদি বিগলিত হইয়া এই মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়।

সাধারণতঃ মৃত্তিকাকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করিয়া পুনরায় তাহাকে আরও বিভাগ করিয়া নানারূপ মৃত্তিকার নামকরণ করা হয়। আমরা এই পুস্তকে যে সমস্ত ফসলের

আবাদের কথা ক্রমশঃ বর্ণনা করিব তাহার কিরূপ মৃত্তিকা ভাগ করা হইয়াছে তাহা বলিতেছি।

সাধারণতঃ মৃত্তিকাকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা—বেলে, এঁটেল ও দোআঁশ। বালুকা ও কর্দ্দম কেবল ফসলের খাদ্য সমূহের আধার ও ভিত্তিস্থল মাত্র। কর্দ্দম শিকড়গুলিকে মৃত্তিকামধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিতে সহায়তা করে। বালুকামধ্যে গাছ জন্মিলে গাছ সহজে উৎপাটিত হইতে পারে। কর্দ্দমের ধারকতাশক্তি অধিক এবং বালুকার শোষকতাশক্তি অধিক। এই সমস্ত কারণে বালুকার সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত থাকা আবশ্যক। কেবল বেলে মাটিতে অথবা কেবল আঠাল বা কর্দ্দমময় জমিতে সমস্ত গাছ ভালরূপে জন্মিতে পারে না, এইজন্য দোআঁশ জমির আবশ্যক।

যে জমিতে শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ কর্দ্দম মাটি বা এ্যালুমিনা, ৫ ভাগ চূণ, ৫ ভাগ উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও অবশিষ্টাংশ বালুকা থাকে তাহাকে দোআঁশ মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। যে মাটিতে ৭০।৮০ ভাগ বালি থাকে তাহাকে বেলে এবং যে মাটিতে নামমাত্র বালি থাকে তাহাকে এঁটেল বলা হয়। সমস্ত ফসল কেবল বেলে অথবা শুদ্ধ এঁটেল মৃত্তিকায় জন্মিতে পারে না। কতকগুলি উদ্ভিদ্ বেলে জমিতে ভালরূপ জন্মে, আবার কতকগুলি বেলে জমিতে না জন্মিয়া এঁটেল জমিতে ভাল জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ উদ্ভিদ্ই দোআঁশ জমিতে ভালরূপ জন্মে।

বেলে মাটি :—যে মৃত্তিকায় বালু শতকরা ৯০ ভাগ

ভাগ তাহাকে বেলে মাটি কহে। ইহা কর্কশ, সছিদ্র ও জল-ধারণে অক্ষম। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে এঁটেল মাটি ও সার সংযুক্ত করিলে মসৃণ এবং জলধারণে সক্ষম হয়। বর্ষাকালে এইরূপ মৃত্তিকাতে কয়েক প্রকার ফসল জন্মান চলে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে জল প্রয়োজন হয়, নতুবা ফসল জন্মে না।

বেলে দোআঁশ :—যে মাটিতে শতকরা প্রায় ৮০-৯০ ভাগ বালি থাকে তাহাকে বেলে দোআঁশ কহে। উক্ত প্রকার মৃত্তিকাও অনেকাংশে উপরোক্ত মৃত্তিকার গুণসম্পন্ন কিন্তু অল্প পরিশ্রমে উহাকে কার্য্যোপযোগী করা যায়।

দোআঁশ :—যে মৃত্তিকার উপাদানে ৭০-৮০% ভাগ বালি থাকে তাহাকে দোআঁশ মৃত্তিকা কহে। এইরূপ মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ যথেষ্ট থাকে। সেইজন্য ইহাকে অসার মাটি বলাও চলে।

এঁটেল বা চিক্কণ মাটি :—যে মৃত্তিকায় বালুর ভাগ অতি অল্প থাকে বা আদৌ থাকে না তাহাকে এঁটেল ও স্থান বিশেষে চিক্কণ মাটি কহে। এই মৃত্তিকার বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—শ্বেতাভ, ধূসর, কৃষ্ণাভ প্রভৃতি। এইরূপ মৃত্তিকা স্থান বিশেষে অত্যন্ত কঠিন হয়। এমন কি কোন পাতলা অস্ত্র দ্বারা খনন করা কঠিন হয়। সাধারণতঃ এঁটেল মাটির কণাসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে যে, তাহার অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য বর্ষাধিক্য হইলে ইহা জলপূর্ণ হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদ্‌গণের বৃদ্ধির

পক্ষে অনুকূল হয় না। কিন্তু এ প্রকার মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সার সকল মিশ্রিত করিয়া দিলে চিক্কণ সছিদ্র এবং হালকা হইয়া উঠে। তখন বায়ু, আলোক ও উত্তাপ ইহার অভ্যন্তরে সহজে প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে। সাধারণতঃ ৫০% ভাগের উপর এঁটেল মাটির অংশ থাকিলে তাহাকেই কর্দ্দম বা এঁটেল মাটি বলা হয়।

দুধে এঁটেল :—যে মৃত্তিকাতে ৩০-৫০% ভাগ এঁটেল মাটি থাকে তাহাকে দুধে এঁটেল মাটি কহে।

চুণ মাঝারি :—যে মৃত্তিকায় ৫-২০% ভাগ চূণ থাকে তাহাকে চুণ মাঝারি মাটি কহে। সাধারণতঃ এইরূপ মৃত্তিকা অনুর্ব্বর। তাহা হইলেও বর্ষ বিশেষে আশু ধান্য ও রবিশস্য ভাল জন্মায়।

কষা :—যে মাটিতে ২০% ভাগেরও অধিক চূণ থাকে তাহাকে কষা মাটি কহে।

উপরিউক্ত প্রকার মাটিগুলির মধ্যে আবার সূক্ষ্ম বিভাগ করা চলে। কারণ উক্ত মৃত্তিকার সহিত নানাবিধ জৈবিক ও আনুষঙ্গিক চূণ, লবণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকায় মৃত্তিকার গুণেরও কিছু তারতম্য হয়। তাহা হইলেও সচরাচর আমরা যে সমস্ত মৃত্তিকা দেখি তাহা উপরোক্ত কোন-না-কোন পদার্থের নানাভাগে সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোদ মাটি :—৮% উপর জৈবিক বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে বোদ মাটি কহে।

বিভিন্ন মৃত্তিকার উপযোগী ফসল

মৃত্তিকাভেদে বিশেষ বিশেষ ফসল ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। বালুকাময় ভূমিতে—ফুটী, তরমুজ, পটোল, শাঁকআলু, তিল, চিনাবাদাম, সরিষা, সরগুঁজা, কুসুম, ধঞ্চে, শণ, মেস্তাপাট, নীল, যব, ক্ষাপর, ভাতুইধান, মুগ, কুলত্থ কলাই প্রভৃতি জন্মাইতে পারা যায়। কিন্তু বর্ষা ভাল না হইলে এই মাটি সহজেই শুষ্ক হইয়া পড়ে।

কর্দ্দমময় মৃত্তিকায় বা এঁটেল মাটিতে—পাট, আক, গম, তুঁত, মুগ, মটর, ছোলা, সীম, ঢেঁড়শ, লাউ, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, উচ্ছে, কাঁকরোল, শশা, বরবটী, অড়হর, তিসি, খেঁসারী, আমন ধান, যই, লঙ্কা প্রভৃতি ফসল জন্মাইতে পারা যায়। সার মিশ্রিত করিলে এই প্রকার জমির প্রভূত উন্নতি হয়।

দোঁয়াশ মাটিতে—আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মূলা, পেঁয়াজ, আর্টিচোক, বেগুন, ওল, সিমুল আলু, মানকচু, রাঙ্গাআলু, শকরকন্দ আলু, চুবড়ি আলু, কুমড়া, আদা, আমআদা, হলুদ, মেস্তা, কার্পাস, জুয়ার, মটর, মুগ, মুসুরী, ছোলা, যই, তুঁত, ভূট্টা, যব, গম, তামাক, পান, এরারুট প্রভৃতি যাবতীয় সজ্জী ও ফসল জন্মাইতে পারা যায়।

প্রস্তরময় মৃত্তিকায়—ভুট্টা, যই, জুয়ার, শিমুল আলু, তুঁত, লঙ্কা, টেঁপারী, তামাক, রাঙ্গাআলু, শাঁকআলু, কাঁকড়ি,

কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, বরবটী, অড়হর, কুলথ কলাই, সীম, সরগুঁজা, মেস্তাপাট, কার্পাস, ঢেঁড়শ, ফাপর, হরীতকী, চা, কাফি, বাঁশ, বাজরা, গোঁদলী, হিজলী বাদাম ইত্যাদি জন্মাইতে পারা যায়।

যে মৃত্তিকায় চূর্ণের ভাগ অধিক তাহাতে—ধান, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, ছোলা, অড়হর, খেঁসারী, মুসুরী, যই, লুসার্ণ, বাজরা প্রভৃতি জন্মাইতে পারা যায়।

বোদ মাটিতে অথবা উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকায়—লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, বেগুন, ঢেঁড়শ, সীম ও শাক প্রভৃতি জন্মান চলে।

জমির উৎপাদিকাশক্তি ও সারের প্রয়োজনীয়তা

অনেক দিন হইতেই সুজলা সুফলা বলিয়া ভারতের একটি খ্যাতি আছে। ইহা অনেকাংশে সত্য হইলেও বর্ত্তমানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। এদেশে কৃষকেরা জমির ফসল লইতেই ব্যস্ত, তাহারা আর কোন ধার ধারে না। জমি হইতে ফসল উঠাইয়া লইবার পর জমির সহিত তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। ক্রমাগতই ফসল উৎপাদন করিতে থাকিলে জমি হইতে উদ্ভিদের খাদ্যাংশ কমিয়া যায়। প্রাণী-

জীবনে যেমন জল, বায়ু ও আহারের প্রয়োজন এবং উহা ছাড়া কোন জীব বাঁচিতে পারে না, উদ্ভিদ্-জীবনেও ঠিক সেইরূপ ত্রিবিধ মূল খাদ্য, যথা—নাইট্রোজেন বা সোরাজান, ফস্ফরিক এ্যাসিড্ বা প্রস্ফুরিকাম্ল ও পটাস বা ক্ষার প্রয়োজন। বিনা সারে মাত্র জল ও বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদ্‌গণ কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু সার ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না এবং সেই গাছে ভাল ফুল ও ফল ধরে না। বিনা সারে আবাদ করিতে থাকিলে দেখা যায় সর্ব্বপ্রথম ফলন অপেক্ষা পরবর্ত্তী ফসলের ফলন হ্রাস হইতে থাকে কিন্তু সাধারণ কৃষক এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতে পারে না। প্রতি বৎসর জমি হইতে ফসল উঠাইয়া লইবার পরই জমিতে সার প্রয়োগ প্রয়োজন, নতুবা জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া যায়। এই উৎপাদিকাশক্তিকেই জমির উর্ব্বরতা কহে। জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে হইলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ আবশ্যক।

সমস্ত ফসল জমি হইতে সমপরিমাণ সারবান পদার্থ গ্রহণ করে না। এইজন্য কোন কোন ফসল উৎপন্নের ফলে জমির সামান্য ক্ষতি হয় এবং কোন কোন ফসল উৎপাদনে জমির অধিক ক্ষতি হয়। আবার শুঁটিজাতীয় ফসল জন্মাইলে জমির ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারই হয়। কোন ফসল জন্মাইবার পর জমির ক্ষতিপূরণার্থে অধিক সার আবশ্যক হয়, কোন ফসলে বা অপেক্ষাকৃত কম সার লাগে এবং কোন ফসল

জন্মাইবার জন্য সার প্রয়োগদ্বারা জমির ক্ষতিপূরণের আদৌ আবশ্যক হয় না।

কোন্ ফসল উৎপন্ন করিলে জমি হইতে কত ভাগ নাইট্রোজেন, কত ভাগ ফস্ফরাস ও কত ভাগ পটাস বাহির হইয়া যায় এবং কোন্ সারে কি কি পদার্থ কিরূপ পরিমাণে বিদ্যমান আছে ইহা জানা থাকিলে জমিতে সার প্রয়োগের সুবিধা হয়।

জমির উর্ব্বরতা পরীক্ষা

মৃত্তিকার উর্ব্বরতা স্থির করিতে হইলে জমিতে আলু, ইক্ষু, ভুট্টা, গম প্রভৃতির বীজ বপন করা উচিত। যে-সমস্ত জমিতে ইহারা ভালরূপ জন্মে তাহা উর্ব্বর মৃত্তিকা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, কারণ এই সমস্ত ফসল সারবান্ মৃত্তিকা ভিন্ন ভাল জন্মে না। যে-সমস্ত পতিত জমি গাছ, জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ, সেইস্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বর। কালকাসুন্দা, বাবলা, চূণা কলাই, জয়ন্তি, ধইঞ্চা, শণ, সীম, বরবটী, মটর প্রভৃতি শুঁটি-জাতীয় উদ্ভিদ্ যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সেই স্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বর। এই সকল শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদ্ অনুর্ব্বর স্থানে জন্মাইলেও সেইস্থানের মৃত্তিকা সারবান হইয়া থাকে, কারণ স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা এই সমস্ত উদ্ভিদ্ ঊষর ভূমিকে উর্ব্বর করিতে সক্ষম হয়। যেস্থলের মৃত্তিকা কীটপতঙ্গাদিতে পূর্ণ ও যে-সমস্ত স্থান শম্বুক ও মৃত জীবজন্তুর অস্থিকঙ্কালাদিতে পূর্ণ

সেই সমস্ত স্থানও স্বভাবত উর্ব্বর হইয়া থাকে। যে মাটিতে অধিক পরিমাণে কেঁচো বাস করে সেই স্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বর বলিয়া গণ্য। শুষ্ক মৃত্তিকা রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা যদি উহাতে শতকরা ৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ৫ ভাগ ফস্ফরস, ১ ভাগ পটাস ও সামান্য চূণ মিশ্রিত থাকে দেখা যায় তাহা হইলে উহা উর্ব্বর মৃত্তিকা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বালুকা ও কর্দ্দমের সমবায়ে মৃত্তিকা গঠিত হয়। মৃত্তিকার উপরিভাগ যাহা কর্ষণ দ্বারা আলোড়িত করা হয় তাহা নিম্নস্তর হইতে কিছু বিভিন্ন হইয়া থাকে। ফসল জন্মাইবার জন্য উপরের স্তরটিতে জৈবিক পদার্থ থাকে। যে মাটিতে যত অধিক জৈবিক পদার্থ থাকে সেই মৃত্তিকা তত অধিক উর্ব্বর। গাছের পত্রাদি ও জীবজন্তুর শরীর পচিয়া গলিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে পরিণত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া মাটিকে সারবান করিয়া তোলে। অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করিতে হইলে পাট, শণ, ধইঞ্চা, নীল, অড়হর, সীম, বরবটী প্রভৃতি কলাইজাতীয় উদ্ভিদ্ জমিতে ২।৩ বৎসর অন্তর মধ্যে মধ্যে জন্মান, জমিকে ২।৩ বৎসর পতিত ফেলিয়া রাখা, ২।১ বৎসর অন্তর পুষ্করিণী হইতে পাঁকমাটি তুলিয়া জমিতে প্রয়োগ করা, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার ব্যবহার করা, একই জমিতে ক্রমান্বয়ে একই ফসল না লাগাইয়া জমিকে ভাগ করিয়া প্রতি খণ্ডে প্রতি বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করা, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ফসল লাগাইলে জমির উর্ব্বরতাশক্তি নষ্ট হয় না।

সার প্রয়োগপ্রণালী

মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভিদের খাদ্যাভাব হইলে তাহা নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করে। মানুষ-প্রদত্ত এই সকল উদ্ভিদ্-খাদ্যকে আমরা সার বলিয়া থাকি।

জমিতে সার দিবার উদ্দেশ্য উদ্ভিদের খাদ্য বা আহারের অভাব পূরণ করা। সারের গুণাগুণভেদে উহা বিভিন্ন ফসলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সবুজ সার দ্বারা জমিতে জৈবিক পদার্থের অভাব পূরণ করিতে পারা যায়। সবুজ সারের অর্থ কোন বিশেষ জাতীয় গাছকে সবুজ অবস্থায় চষিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া। যে-সমস্ত উদ্ভিদ্ শুঁটিজাতীয় তাহাদের মাটি হইতে শিকড় সমেত উঠাইলে শিকড়ে স্ফোটকের ন্যায় অনেকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একপ্রকার পিচ্ছিল রসে পূর্ণ। পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ পিচ্ছিল রস বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণুই বায়ু হইতে আবশ্যকীয় সাধারণ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। ধইঞ্চা, বরবটী প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদ্ সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। লবণ অনেক ফসলে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ফসলে লবণ ব্যবহারে কুফল দর্শে।

গোধুম, ইক্ষু, ভুট্টা, বীট, পালম শাক, বাঁধাকপি এবং নারিকেল, লেবু প্রভৃতি গাছে অল্প পরিমাণ লবণ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

* সোরাও একটি বিশেষ সাররূপে গণ্য। নিতান্ত চারা গাছের গোড়ায় সোরা ব্যবহার করিলে উহার তেজ চারা গাছ সহ্য করিতে পারে না, কখনও কখনও গাছ জ্বলিয়া যায়। জমিতে ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর সোরা ব্যবহার না করিয়া ২।৩ বৎসর অন্তর উহা প্রয়োগ করা ভাল। প্রতি বৎসর উহা ব্যবহার করিতে হইলে হাড়ের গুঁড়ার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। সোরা সহজে গলিয়া যায় ও মৃত্তিকা মধ্যস্থ সারবান্ পদার্থও সহজে গলাইয়া লয়। বর্ষার সময় জমিতে সোরা ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ বর্ষার জলে ইহা জমি হইতে ধৌত হইয়া যায়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে সোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চূণ একটি বিশিষ্ট সারের মধ্যে গণ্য। পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই বিঘাপ্রতি ৫/০ মণ চূণ মিশ্রিত করা আবশ্যক। সর্ব্বদাই ঝরা চূণ (slaked lime) ব্যবহার করা উচিত। প্রতি বৎসর চাষের পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ৮।১০ সের চূণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জন্তুদিগের মলমূত্রাদি ও অস্থি-মাংস এদেশে অনেক স্থলে নষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদের পক্ষে ইহা সমস্তই সাররূপে ব্যবহার

করিতে পারা যায়। মূত্র অতি তেজস্কর সার। কোন গাছের গোড়ায় টাট্‌কা খাঁটি মূত্র প্রয়োগ করিতে নাই। অন্ততঃ ৮।১০ গুণ জল মিশাইয়া উহা ব্যবহার করা উচিত। শাকজাতীয় এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে মূত্রসার বিশেষ উপকারী। ধান, পাট, যব, গম, ভুট্টা, যই, আক, পালমশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতি ফসলে মূত্রাদি সার ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। মূত্র না পচাইয়া টাট্‌কা অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গোময় সার জমিতে টাট্‌কা ব্যবহার করা উচিত নয়। উহা পচাইয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। বৃষ্টির জলে গোবরের অনেক সারাংশ ধৌত হইয়া চলিয়া যায় এবং রৌদ্রের উত্তাপে উহা শুকাইয়া নষ্ট হয়, এইজন্য গোবরগাদার উপর যাহাতে বৃষ্টির জল ও রৌদ্রের উত্তাপ না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গোবরের সহিত ছাই এবং গোয়ালের খড়কুটাদি আবর্জ্জনা মিশাইয়া উহা পচিতে দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ একটি গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া গোবর পচাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। ৫।৬ মাসের মধ্যে গোবর পচিয়া ব্যবহারের উপযোগী হয়। ৪।৫ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে গোবরের সারবান্ পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। উহা ব্যবহার করিতে হইলে এক বৎসরের পুরাতন পচা সার চৈত্র বৈশাখ মাসে জমিতে ব্যবহার করা প্রশস্ত।

গোময় অপেক্ষা ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া এবং তাহা অপেক্ষা

মোরগ, পারাবত এবং অন্যান্য পক্ষীর বিষ্ঠা ও পলুপোকার নাদি আরও উৎকৃষ্ট সার। এই সকল বিষ্ঠা নষ্ট না করিয়া যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া জমিতে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে জমি অধিক সারবান্ হয় এবং ঐ সকল জমিতে সুন্দর ফসল জন্মে।

মলমূত্র অপেক্ষা অস্থি, মাংস ও রক্ত আরও উৎকৃষ্ট সার। মৃত জীবজন্তুর দেহ ভাগাড়ে জমির উপরে ফেলিয়া রাখাতে উহা পচিয়া বায়ু দূষিত হইয়া নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে কিন্তু জমিতে এই সমস্ত পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে উভয়বিধ কার্য্যই সাধিত হয়। মাংস অল্পদিনের মধ্যে পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় কিন্তু অস্থি সাররূপে উদ্ভিদের ব্যবহারে আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সাধারণতঃ অস্থি-চূর্ণ জমিতে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অস্থিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আশু ফললাভ অতি সামান্যই হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি জমিতে ১॥ মণ অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিলে ৬।৭ বৎসরের জন্য জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। অস্থিচূর্ণ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে প্রসিদ্ধ বীজ এবং সার ব্যবসায়ীদের নিকট পাওয়া যায়। অনেকে ফলের বাগানে ফলগাছ রোপণ করিবার সময় কয়েক খণ্ড অস্থিচূর্ণ গর্ত্তের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া পরে গাছ লাগাইয়া থাকেন। ইহাতে গাছের ফল অপেক্ষাকৃত বড় এবং মিষ্ট আস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। সকল জমিতে এবং সমস্ত ফসলে অস্থিচূর্ণসার সমান আবশ্যক করে না। কোন কোন

জমিতে ইহা কিছু অধিক পরিমাণ এবং কোন কোন ফসলে অল্প পরিমাণ আবশ্যক হয়। ধান্য, গম প্রভৃতি কৃষিশস্যে ইহা বিঘাপ্রতি ১ মণ হইতে ১।। মণ এবং আলু, ইক্ষু, বীট প্রভৃতি ফসলে বিঘাপ্রতি ১।। মণ হইতে ২ মণ আবশ্যক হয়।

তৈলপ্রদ বীজ সমুদয় ঘানি অথবা কলে পেষণ করিয়া লইলে যে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা উদ্ভিদের সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কার্পাসের বীজের খোলা বাদ দিয়া তৈল প্রস্তুত করিবার পর যে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহাও সাররূপে ব্যবহার করা চলে। গবাদি জন্তুর পক্ষে ইহাও অতি তেজস্কর খাদ্য। রেড়ির খোল, সর্ষপ খোল, চা বীজের খোল, নিমের খোল, মহুয়ার খোল, পোস্তদানার খোল, কার্পাসের খোল, কুসুমের খোল, তিসির খোল, তিলের খোল, চিনা-বাদামের খোল, নারিকেলের খোল, সরগুঁজার খোল প্রভৃতি সমস্তই উৎকৃষ্ট সার। অনেক বীজ হইতে তৈল বাহির হয় না, কিন্তু তাহাদের বীজ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া গুঁড়াইয়া বা পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। কালকাসুন্দার বীজ, তেঁতুলের বীজ, লিচুর বীজ, বকুল বীজ, কুসুম ফুলের বীজ প্রভৃতি পচাইয়া বা গুঁড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। গাছের লতা, পাতা, ফুল, ফল, বীজ, ডালপালা সমুদয়ই পচাইয়া সাররূপে জমিতে ব্যবহার করা চলে। বড় বড় গাছের ডালপালা পোড়া ভস্ম অপেক্ষা পাতা পচা শ্রেষ্ঠ সার। পাতা অপেক্ষা ফুল এবং ফুল অপেক্ষা ফল ও বীজ অধিক তেজস্কর

সার। সর্ষপ, তিসি, কার্পাস, কুসুম, নারিকেল ও সরগুঁজার খোল গবাদি জন্তুদের আহারের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায় এবং উহাদের বিষ্ঠা সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা চলে। এই সমস্ত তেজস্কর দ্রব্য আহার করিয়া জন্তুগণ বলিষ্ঠ হয় ও অধিক কার্য্যক্ষম হয় এবং উহাদের নাদি সাররূপে ব্যবহারেও জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। জন্তুগণ যত প্রকার আহার্য্য সামগ্রী গ্রহণ করে এবং যত প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে খইল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সার। বিঘাপ্রতি ১॥০-২ মণ হইতে জমির অবস্থা ও ফসল ভেদে ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত খইল সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। রেড়ি ও সর্ষপ খইলের গন্ধ অতি তীব্র,এইজন্য উক্ত খইল ব্যবহারে ফসলে পোকা লাগিতে পায় না। মহুয়া ও নিমের খইল তিক্ত, এইজন্য জমিতে ইহা ব্যবহারেও ফসলে পোকার উপদ্রব নিবারণ হইয়া থাকে।

সমুদয় সারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—নাইট্রোজেন ঘটিত সার, ফস্ফরস সার ও পটাস সার। যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগেরও অধিক নাইট্রোজেন থাকে তাহাকে নাইট্রোজেন ঘটিত সার বলে। সালফেট্ অফ্ এ্যামোনিয়া, নাইট্রেট অফ্ সোডা, সোরা, মৎস্যের সার, রেড়ির খোল, কার্পাস বীজের খোল, পোস্তদানার খোল, কুসুম বীজের খোল, চিনাবাদামের খোল, মাংস এবং শোণিত সার নাইট্রোজেন-প্রধান। ইহা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। সাধারণতঃ এই সারটির অপচয় অধিক ঘটে।

যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগেরও অধিক ফস্ফরিক এ্যাসিড্ থাকে তাহাকে ফস্ফরাস সার কহে। ত্রিচিনপল্লী, আপেটাইট প্রস্তুত ও মৃত জীবজন্তুর অস্থি প্রভৃতি সার ফস্ফরস-প্রধান। ইহা গাছের ফল ও ফুলের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট করায়। রান্নাঘরের ঝুলে শতকরা ২।৩ ভাগ নাইট্রোজেন এবং খোল ও ছাইয়ে ০।৪ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরাস থাকে।

যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক পটাস বা ক্ষার থাকে তাহাকে পটাস সার বলে। ছাই, সোরা ইত্যাদি পটাস-প্রধান সার। পটাস গাছের তন্তুগুলাকে সবল রাখে এবং আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করায়। সোরাতে নাইট্রোজেন ও পটাস উভয়ই শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক আছে। গাছের শুষ্কপত্র পোড়াইয়া যে ক্ষার হয় তাহাতে শতকরা ১২।১৪ ভাগ পটাস থাকে। সকল ছাইয়ে সমান পটাস থাকে না।

কতকগুলি সার আছে, যাহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাস প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ গলিত এবং অগলিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। উহারা সাধারণ সার মধ্যে গণ্য। যেমন পশুপক্ষীদের মলমূত্র, খোল, রক্ত, মাংস, মৎস্য, পাতাপচা সার, পুকুরের পানা, আগাছা, পলিমাটি, পুষ্করিণীর পাঁকমাটি ইত্যাদি।

কোন্ ফসলে কি কি সার কত পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক জানা থাকিলে জমিতে সার প্রয়োগের সুবিধা হয়। সকল সারের গুণ সমান নহে। নাইট্রোজেন পত্রোদ্গমের ও গাছ

বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। ফস্‌ফরাস গাছের ফুল ও ফল বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট করে। পটাস গাছের আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করায় ও তন্তুগুলিকে সবল রাখে।

বাঁধাকপি প্রভৃতি শাক জাতীয় সব্জীতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার অধিক আবশ্যক। মানকচু, ওল প্রভৃতি মূল জাতীয় সব্জীতে পটাস ও ফস্‌ফরাস সার অধিক আবশ্যক। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, গাছগুলি বেশ সতেজ ও ঘন সবুজ পাতায় আবৃত কিন্তু গাছে ফুল ও ফল ধরে না, যদিও ধরে তাহা খুব সামান্য। এইরূপস্থলে গাছে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অধিক এবং ফস্‌ফরাস ও পটাস সারের পরিমাণ কম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের লবণ ছিটাইলে এবং হাড়ের গুঁড়া ১॥০ মণ ও ৫।৬ মণ ছাই প্রয়োগ করিলে নাইট্রোজেনের আধিক্যবশতঃ যে দোষ ঘটে তাহা কাটিয়া যায়। যে জমিতে উদ্ভিদের আবশ্যকীয় খাদ্য অগলিত অবস্থায় থাকে তাহা শীঘ্র উদ্ভিদের ব্যবহারে আনিতে হইলে বিঘাপ্রতি প্রায় ১ মণ সোরা ব্যবহার করা উচিত।

সালফেট অফ্ এ্যামোনিয়াতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে; নাইট্রেট অফ্ সোডায় ১৪।১৫ ভাগ; সোরাতে ১৪।১৫ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩৫।৩৬ ভাগ পটাস; মৎস্যে ৬।৭ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৬ ভাগ ফস্‌ফরাস ও ১ ভাগ পটাস; রেড়ির খোলে ৭।৮ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৩।৪ ভাগ ফস্‌ফরাস ও ২।৩ ভাগ পটাস; কার্পাস খোলে ৬।৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩।৪

ভাগ ফস্ফরাস ; সরিষার খোলে ৫।৬ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২।৩ ভাগ ফস্ফরাস ; চিনাবাদামের খোলে ৭।৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ১ ভাগ ফস্ফরাস ও ১ ভাগ পটাস ; তিলের খোলে ৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ২ ভাগ ফস্ফরাস ও ১ ভাগ পটাস ; কুসুম বীজের খোলে ৫।৬ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২ ভাগ ফস্ফরাস ; পোস্তদানার খোলে ৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩ ভাগ ফস্ফরাস ; অস্থিচূর্ণে ২১ ভাগ ফস্ফরাস এবং ২৮ ভাগ চূণ, ৩।৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও সামান্য পটাস থাকে। সুপারফস্ফেটে ২৩ ভাগ ফস্ফরাস, ২৮ ভাগ চূণ, ২।৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও যৎসামান্য পটাস থাকে।

এপেটাইট প্রস্তরে ৩০।৪০ ভাগ ফস্ফরাস থাকে।

চুণ সার দ্বারা শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। লবণ সার দ্বারা এই জাতীয় উদ্ভিদের অশেষ উপকার হইয়া থাকে। যে জমিতে চুণের ভাগ অধিক তাহাতে কিছু লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কার্পাস প্রভৃতি গাছের বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চুণের ভাগ অধিক এরূপ জমিতে কার্পাস জন্মাইতে হইলে বিঘাপ্রতি ২০।২২ সের লবণ ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে কার্পাস অধিক ফলে, ফল বড় হয় এবং আঁইশ দীর্ঘ ও লম্বা হয়।

কৃষি পর্য্যায়

জল ও সারের প্রাচুর্য্য বা অল্পতানুসারে কৃষিকে বিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেস্থলে কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেতে আবশ্যক মত প্রচুর সার ও জল-সেচন দ্বারা সাধারণ ক্ষেত্র অপেক্ষা বহুগুণ শস্য উৎপন্ন করা হয় তাহাকে "আত্যন্তিক কৃষি" (intensive culture) বলে। শুষ্ক কৃষি ও বিস্তীর্ণ কৃষি বলিয়া আরও দুইটি পর্য্যায় আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা বর্ণনা করিব। ইহা ছাড়া সাধারণ কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন একটি বিশেষ কৃষি পর্য্যায় অবলম্বন করা আবশ্যক। মৃত্তিকাভেদে ও জমির অবস্থানভেদে স্থানীয় শস্য সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি পর্য্যায় স্থির করা উচিত। কি ফসলে আদৌ সার প্রয়োগ না করিলে চলে, কিরূপভাবে কার্য্য করিলে মজুর খরচ কম লাগে, কিরূপে বীজ না কিনিয়া জমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ রক্ষা করা যায় এবং সেই বীজ বপনে সুফল লাভ করা যায় এই সমস্ত বিষয়ে কৃষকদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতেই কলাই জাতীয় ফসল লাগাইলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না ও জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে না। কৃষি পর্য্যায়ের উদ্দেশ্য একই জমিতে উপর্য্যুপরি একই জাতীয় ফসল না লাগাইয়া বিভিন্ন জাতীয় ফসল লাগান। একটি জমিকে

৫।৬ খণ্ডে ভাগ করিয়া লইয়া প্রতি খণ্ডে প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ফসল লাগাইবার নাম পর্য্যায়ক্রমে চাষ করা। এক বৎসর অন্তর যদি একই খণ্ডে একবার করিয়া ধান, পাট, অড়হর, মুগ বা অন্য কোন ফসল লাগান হয়, তাহা হইলে উহাকে দুই বৎসরের পর্য্যায় কহে। দুই বৎসর অন্তর যদি একই জমিতে উক্ত ফসল লাগান হয় তাহা হইলে উহাকে তিন বৎসরের পর্য্যায় করে। তিন বৎসর অন্তর এইরূপে ফসল জন্মাইলে তাহাকে চারি বৎসরের পর্য্যায় কহে। এইরূপে পাঁচ, ছয় বা ততোধিক বৎসর পর্য্যায়েও চাষ করা যাইতে পারে। একই নির্দ্দিষ্ট জমিতে প্রতি বৎসর একই রকম ফসল জন্মাইলে জমি ঐ ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং জমিতে কীটপতঙ্গের উপদ্রব হয়, অর্থাৎ ফসলগুলির উপযোগী কয়েকটি বিশেষ উপাদান মৃত্তিকা হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাটি ক্রমশঃ সেই ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া ফসলগুলির বিশেষ বিশেষ শত্রু, কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিজ্জ রোগ ইত্যাদি ক্রমশঃ ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়ে, এইজন্য ইহাদের জন্মান দুষ্কর হইয়া উঠে। তিন চারি বৎসর অন্তর এক এক খণ্ড জমিতে চাষ না দিয়া উহা পতিত ফেলিয়া রাখা উচিত। কৃষি পর্য্যায়ের আর একটি উদ্দেশ্য মধ্যে মধ্যে পাট, শণ, ধইঞ্চা, বরবটী, অড়হর প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় কলাই বা ফসল জন্মাইয়া জমির উর্ব্বরতা ও তেজ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া।

চাষ

আবাদের কাল জল-হাওয়া ও উত্তাপের উপর সাধারণতঃ নির্ভর করে। পূর্ব্ববঙ্গে ফাল্গুন চৈত্র মাসে অল্প বৃষ্টি হয় বলিয়া ঐ সময়ে পাট, তিল, আউশ ধান্য, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মান হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে-সমস্ত ফসল লাগান হয়, যশোহর, নদীয়া, খুলনা, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে এবং উড়িষ্যা বিভাগে তাহা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে লাগান হইয়া থাকে। ছোটনাগপুর, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রবিশস্য লাগান হইয়া থাকে কিন্তু হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস এবং পূর্ব্ববঙ্গে উহা অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে লাগান হইয়া থাকে।

বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সমস্ত বৎসরে জমিতে যে-সমস্ত ফসলের চাষ দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

বৈশাখ মাসের কার্য্য :—চালকুমড়া, করলা, কাঁকরোল, বেগুন, কাঁকড়ি, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়শ, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, শশা, কুমড়া, আদা, হলুদ, ওল, মানকচু, জেরুজিলাম আর্টিচোক প্রভৃতি সব্জীর বীজ ও গেঁড় রোপণ। আউস ধান্য, গভীর জলের আমন ধান্য, ভুট্টা, পাট, চিনাবাদাম, অড়হর, ধইঞ্চা,

জুয়ার, রিয়ানা ঘাস, পান প্রভৃতি লাগান ও আকের ক্ষেতে জল-সেচন। ধানের জমিতে সার প্রয়োগ করা ও জমি প্রস্তুত করা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্য :—আউস ও আমন ধান্য রোপণ ও বপন। ভুট্টা, অড়হর, পাট, ধইঞ্চা, বরবটী, সীম, রেড়ি, জুয়ার ও রিয়ানা ঘাসের বীজ বপন। লাউ, কুমড়া, কাঁকুড় প্রভৃতি ফসল উত্তোলন। লাউ, কুমড়া ও শশার বীজ বপন। রোপা আমন ধান্যের জন্য জমি প্রস্তুত। লঙ্কা ও তূলার বীজ বপন। ফল-বৃক্ষাদি রোপণ।

আষাঢ় মাসের কার্য্য :—আমন ধান্যের বীজ বপন। লঙ্কা, তূলা ও বেগুনের চারা নাড়িয়া বসান। মেস্তা, সীম, ঢেঁড়শ, শাক প্রভৃতির বীজ বপন। নাবী জাতীয় ঝিঙ্গা, শশা, লাউ, কুমড়া এবং চুবড়ি আলু, লালআলু, শকরকন্দ আলু, কচু, আদা, হলুদ, এরারুট প্রভৃতি ফসলের বীজ বপন। সাদাতিল, কৃষ্ণমুগ, পিঁপুল, ভাহুই কলাই ও গিনি ঘাসের বীজ লাগান।

শ্রাবণ মাসের কার্য্য :—আমন ধান্য রোপণ, কার্পাস গাছের গোড়া নিড়াইয়া দেওয়া, বেগুন গাছের চারা লাগান, আক, আদা, হলুদ প্রভৃতি গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া। পাটনাই ফুলকপি, তামাক, কৃষ্ণতিল, টোমেটো, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা প্রভৃতির বীজ বপন।

ভাদ্র মাসের কার্য্য :—ঝিঙ্গা, লাউ, কুমড়া, বেগুন, সীম,

ওল প্রভৃতি উত্তোলন। আউস ধান্য, ধইঞ্চা ও পাট কাটা এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, সালাদ, কৃষ্ণতিল, সরগুঁজা, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতির বীজ বপন।

আশ্বিন মাসের কার্য্য :—শালগম, বীট, ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি, টোমেটো, পেঁয়াজ,পালম শাক,টকপালম, কনকানটে, মূলা, লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, মটর, সরিষা ও সরগুঁজার বীজ বপন। আলু, পটল প্রভৃতির বীজ ও মূলা বপন। ভুট্টা, আউস ধান্য, কলাই প্রভৃতি শস্য কর্ত্তন এবং রবিশস্য বপনের জন্য জমি প্রস্তুত।

কার্ত্তিক মাসের কার্য্য :—টোমেটো, মূলা, পেঁয়াজ, বিলাতী মটর, ফরাসী সীম, আলু, পটল, লালআলু, শকরকন্দ আলু ও বিদেশী সব্জীর বীজ বপন ; ফলবৃক্ষ রোপণ ; মুগ, মটর, ছোলা, মুসুরী, খেঁসারী, তিল, মসিনা, মৌরী, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন ; কার্পাস তূলা চয়ন ও বোরো ধান্যের বীজ বপন।

অগ্রহায়ণ মাসের কার্য্য :—যব, গম, যই, মুগ, মটর প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন। তরমুজ, খরমুজা, কাঁকুড়, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, করলা, শশা, পেঁয়াজ প্রভৃতি দেশী সব্জীর বীজ বপন। আকের পাতা বাঁধিয়া দেওয়া, আকের জমিতে জল-সেচন ও আলুর ক্ষেতে জল দেওয়া। কচু, লালআলু, আলু, লঙ্কা, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, লেটুস, টোমেটো, মটর, বীট, গাজর, মূলা প্রভৃতি সব্জী উঠান ও কার্পাস চয়ন করা।

পৌষ মাসের কার্য্য :—নাবী কপি ও আলুর জমিতে জল-সেচন। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ওল, চুবড়ি আলু, আদা, হলুদ, মূলা প্রভৃতি উত্তোলন, ওলের মুখী লাগান, আক কাটা ও আমন ধান্য কাটা আরম্ভ। চৈতে শশা, তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে ঝিঙ্গা, করলা, কাঁকুড় ও লঙ্কার বীজ বপন ও বিদেশী সব্জী উত্তোলন।

মাঘ মাসের কার্য্য :—আক কাটা, শিমুল আলু ও পটল উঠান আরম্ভ, ওলের মুখী লাগান, আলু, কপি, তামাক প্রভৃতি সব্জীর ক্ষেতে জল-সেচন, আকের কলম বসান, মটর, কলাই, সরিষা, চাঁপানটে, দেশী পেঁয়াজ, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, ফুটী, তরমুজ, কুলি বেগুন প্রভৃতির বীজ বপন ও বিদেশী সব্জীর ফসল উত্তোলন।

ফাল্গুন মাসের কার্য্য :—আক কাটা, আকের কলম লাগান, শশা, করলা, উচ্ছা, ঝিঙ্গা, লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির বীজ বপন। কুলি বেগুনের চারা রোপণ। মসিনা, মুগ ও তিল গাছ উঠান। কার্পাস ও পটল উঠান। আউস ধান্য, ভুট্টা, পাট প্রভৃতির জন্য জমি প্রস্তুত।

চৈত্র মাসের কার্য্য :—কুমড়া, লাউ, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, ফুটী, করলা, ঢেঁড়শ, বরবটী, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল প্রভৃতির বীজ বপন, কার্পাস চয়ন, আলু উত্তোলন, আক লাগান, কার্পাসের বীজ বপন। যব, গম, ছোলা, মুসুরী, খেঁসারী, মুগ, যই প্রভৃতি রবিশস্য কাটা আরম্ভ ও মাড়াই।

কৃষিযন্ত্র

ভূমি কর্ষণ, কর্ষিত ভূমিকে সমতল করণ, শস্যক্ষেত্র হইতে তৃণাদি ধ্বংস করণ, শস্য কর্ত্তন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের জন্য কোন-না-কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। সভ্যতা ও কৃষিকার্য্যের অবস্থাভেদে নানাদেশে নানাপ্রকার কৃষিযন্ত্র প্রচলিত আছে। সহস্র সহস্র কৃষিযন্ত্রের মধ্যে কোন্‌গুলি এদেশের কৃষকগণের ব্যবহারোপযোগী ইহা স্থির করা অনেক পরীক্ষা ও ব্যয় সাপেক্ষ। আমেরিকা ও য়ুরোপের চিন্তাশীল শিল্পীরা নানাপ্রকারের শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র সকলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে একজন বা অল্পসংখ্যক লোক বহুসংখ্যক লোকের কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। ভারতে কৃষিযন্ত্র সকল অতি প্রাচীন কালে যে প্রকারের ছিল, অদ্যাবধিও প্রায় তাহাই আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রমিকগণ আর অল্প বেতনে কার্য্য করিতে সম্মত হয় না কিন্তু অধিক বেতনে লোক নিযুক্ত করিয়াও মালিকের পড়্‌তা পোষায় না। সেইজন্য দেশে উপার্জ্জনের সুবিধা না পাইলে শ্রমিকগণ বিদেশে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় অল্প লোক দ্বারা এবং অল্প শ্রমে যাহাতে অধিক কার্য্য পাওয়া যায় এইরূপ কৃষিযন্ত্রগুলির

মধ্যে যেগুলি ক্ষুদ্র, স্বল্প ব্যয়ে লভ্য ও এদেশে ব্যবহারের উপযোগী সেইরূপ দুই-একটি প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

লাঙ্গল কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকীয় যন্ত্র। লাঙ্গল ব্যতীত অধিক জমি গভীর ভাবে চাষ করা অসম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালার লাঙ্গলের যে অংশ মৃত্তিকার ঠিক উপরে থাকে সেই অংশ একখণ্ড মোটা ও ভারী কাষ্ঠের (মুড়া) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। ইহার এক অংশে মুঠিযুক্ত নিজান ও অন্য অংশে প্রায় ১ হাত লম্বা একখণ্ড লৌহফলক নিযুক্ত করা হয় ও শেষ প্রান্তে প্রায় ২ ইঞ্চি ফলা বাহির হইয়া থাকে। এইরূপ লাঙ্গল দ্বারা গভীর ভাবে জমি কর্ষণ করা যায় না। লৌহসংযুক্ত কাষ্ঠাগ্রভাগ ক্রমশঃ চওড়া বলিয়া ৪-৪৷৹ ইঞ্চি চওড়া খাত প্রস্তুত হয় ও ২৷৷-৩ ইঞ্চি গভীর হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় লাঙ্গলে যে-সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন ইহাতে তাহা নাই। বিলাতী লাঙ্গলের লৌহফলক অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকা অতি সহজে কাটিয়া যায়। সেইজন্য লাঙ্গল টানিতে পশুগণের বিশেষ শক্তি লাগে না ও কষ্ট কম হয়। সে সমস্ত লাঙ্গলে মোলবোর্ড সংযুক্ত থাকায় কর্ষিত মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে উল্টাইয়া পড়ে যে, জঙ্গলাদি মাটি-চাপা পড়িয়া যায় ও পচিয়া জমিতে সারের কার্য্য করে ও ২।১ বার চাষেই তৃণাদি পরিষ্কার হইয়া যায়। আজকাল সবকাম, মেষ্টন প্রভৃতি লাঙ্গল বঙ্গদেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে দেশী

লাঙ্গলের অপেক্ষা কার্য্য ভাল পাওয়া যায়, মূল্য ৫৲-৬৲ মাত্র। কোদালী দ্বারা জমি কোপান চলিলেও অধিক ও বিস্তীর্ণ জমি কর্ষণ করিতে ইহার উপর নির্ভর করিলে চলে না, ফলতঃ অকারণ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়াধিক্য ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন প্রকারের লাঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের লাঙ্গল বলদে টানে। অন্য দেশ অপেক্ষা এদেশের লাঙ্গল হাল্‌কা এবং মূল্যও অল্প। বিলাতে লাঙ্গল ঘোড়ায় টানে। সেখানকার লাঙ্গল ভারী এবং এ দেশের তুলনায় মূল্যও অধিক। ভারী লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা গভীর-ভাবে কর্ষণ করা যায় এবং নীচের মাটি উপরে, উপরের মাটি নীচে এইরূপভাবে ওলট্‌-পালট্‌ হওয়ায় মাটি আলগা হয় এবং ভিতরে আলোক ও বাতাস ঢুকিয়া মৃত্তিকাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলে। আমেরিকাতে কলের লাঙ্গলে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বলদ বা ঘোড়া কিছুই আবশ্যক হয় না। সমস্ত প্রকার লাঙ্গল অপেক্ষা কলের লাঙ্গলে চাষ করিতে খুব কম সময় লাগিয়া থাকে। বিলাতের অনুকরণে প্রস্তুত পঞ্জাব, মনস্থন ও মেষ্টন লাঙ্গল আজকাল এদেশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশের জমি বহু বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত থাকায় ও বর্ষায় জমি অত্যধিক নরম হইয়া যাওয়ায় এদেশে কলের লাঙ্গল ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রের দ্বারা চাষ লাভজনক হইতে পারে না। তবে এক বন্দে (plot) ২০০।২৫০ বিঘা বা ততোধিক জমি থাকিলে সেই

স্থানে কলের লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করিলে অনেক স্থলে অল্প সময়ে ও কম খরচে কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

কেবল লাঙ্গল দিয়া চাষ করিলেই জমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় না। জমির ঢিলগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া মাটি সমতল করিতে এদেশে মই ব্যবহৃত হয়। বিলাতে এই সমস্ত কার্য্য হ্যারোর সাহায্যে হইয়া থাকে। ফসলভেদে চেইন, চাকতি ও কাঁটা প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হ্যারো তথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে বা চাপ মৃত্তিকাকে আলগা করিয়া দিতে আমাদের দেশে হাতবিঁধে বা আঁচড়া ব্যবহৃত হয়। বিলাতে হো, রেক, কালটিভেটার প্রভৃতি যন্ত্র এই সমস্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছের গোড়া নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে এবং কোন গাছ শিকড় সমেত তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে আমাদের দেশে নিড়েনী ও খন্তা প্রভৃতি ছোট ছোট আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জলের কথা

কৃষিকার্য্যে সফলকাম হইতে হইলে সু-বৃষ্টি ও সু-চাষের একান্ত আবশ্যক। নিয়মিত সময়ে বৃষ্টি হইলে সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে ফসলের

সমধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। সেইজন্য জলও সার বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। জলের উপরেই যখন কৃষিকার্য্যের অনেক-কিছু নির্ভর করে এবং সু-বৃষ্টির অভাবে যখন ফসলের অধিক অনিষ্ট হয় তখন বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। এইজন্য কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সু-বৃষ্টির অভাবে সেচন-প্রণালী বা প্রথা দ্বারা চাষ-আবাদের প্রচলন আছে। প্রত্যেক কৃষকেরই জল-সেচনের কিছু-না-কিছু সরঞ্জাম বা যন্ত্রাদি থাকা প্রয়োজন। জলের বিষয় বলিতে গেলে কোথা হইতে প্রয়োজন মত জল প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ নদ, নদ, পুষ্করিণী, খাল, বিল, কূপ প্রভৃতি স্থান হইতে জল গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যেস্থানে জলের একান্ত অভাব সেস্থানে খাল কাটিয়া কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া জল আনয়নের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে তড়াগ, পুষ্করিণী অথবা খাল হইতে সিউনী অথবা ডোঙ্গাকল বা দোনের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী জমিতে জল-সেচন করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে পাম্প মেসিন দ্বারা কূপ ও ইন্দারা হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেকে নলকূপ দ্বারা জমিতে জল-সেচন কার্য্য সম্পন্ন করেন। নলকূপের জলে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উহা ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

অনেক নদীর জল সময়ে সময়ে অত্যধিক লবণাক্ত হইয়া

থাকে। ঐরূপ নদীর জল কখনও জমিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। কতকগুলি ফসল সামান্য লোনা জলে ভালরূপ জন্মে কিন্তু অধিকাংশ ফসলের পক্ষে উহা অনিষ্টকারক। জল না দিলে যেমন জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় না, অধিক জল প্রয়োগের ফলেও সেইরূপ ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য জমিতে পরিমাণ মত জল-সেচন আবশ্যক। এ সময় আর একটি কথা সকলেরই বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, যেমন জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, জমি হইতে জল নিষ্ক্রামণের জন্য ড্রেণ থাকা বা নালা কাটিয়া দেওয়াও সেইরূপ বিশেষ আবশ্যক।

জমি অধিক বড় হইলে একটি বড় নালা কাটিয়া ক্ষেতের চারিদিকে ছোট ছোট নালা কাটিয়া তাহাদের সমস্তগুলির মুখ বড় নালার সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ-ভাবে প্রস্তুত করিলে জল বড় নালা বাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দিয়া সমস্ত জমিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিক বর্ষণেও জমিতে জল না দাঁড়াইয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া আসে। যে-সমস্ত ফসলের জমিতে সেঁচ দিবার আবশ্যক হয়, সেই সকল ফসলের জমিতে লাইন দিয়া চারা রোপণ করা আবশ্যক এবং প্রতি লাইনের দুইপাশে নালা কাটিয়া সেগুলি বড় নালার সহিত এইরূপভাবে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে একটিতে জল-সেচন করিলে সব নালাতে জল যায়।

ভূমি কর্ষণ

জমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে কোনপ্রকার শস্য ভালরূপ জন্মে না। এইজন্য যে চাষের যে জমি তাহা নির্ব্বাচিত হইবার পরই কর্ষণ আরম্ভ করা আবশ্যক। কর্ষণ-কার্য্য সকল সময়েই চলিতে পারে। আশ্বিনের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের প্রথম পর্য্যন্ত কর্ষণই প্রশস্ত। বর্ষায় ভূমি জলসিক্ত থাকে এইজন্য তখন জমি-কর্ষণে কোন ফল হয় না। বর্ষার শেষে বৃষ্টি থামিবার ১০।১২ দিন পরে এবং গ্রীষ্মকালে একবার বর্ষণের পর জমি কর্ষণ করা আবশ্যক। জমি আর্দ্র অবস্থায় কর্ষণ করিলে কর্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর্দ্র অবস্থায় কর্ষণে মাটি চাপ বাঁধিয়া যায়। জমি একবার কর্ষণ করিবার ১৫।২০ দিন পরে পুনরায় কর্ষণ করা আবশ্যক। একবার কর্ষণে জমি ভালরূপ প্রস্তুত হয় না, এইজন্য দুই, তিন বা ততোধিকবার জমি কর্ষণ করা আবশ্যক। জমি একবার কর্ষণের পর ১৫।২০ দিন বিশ্রাম দিয়া পুনরায় কর্ষণ করিলে নিম্নস্থ রস যৌগিক বা ভৌতিক আকর্ষণী-বলে উপরিস্থিত কর্ষিত মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া মাটিকে সরস রাখে।

কয়েকটি বিশেষ সব্জী বা ফসল ছাড়া জমি অধিক গভীর ভাবে কর্ষণের আবশ্যক করে না। গ্রীষ্মকালে অধিক গভীর ভাবে কর্ষণ করিলে সূর্য্যের তাপে কর্ষিত মৃত্তিকার রস শীঘ্র শুকাইয়া গিয়া ফসলের ক্ষতি করে। বর্ষাকালে নাতিসিক্ত

জমি গভীর কর্ষণ দ্বারা কিছুদিন ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে ফসল জন্মাইতে পারা যায়। জমি অধিক কর্ষণের একটি বিশেষ অপকারিতা এই যে, মাটির নিম্নে অদ্রবণীয় অবস্থায় উদ্ভিদের যে-সমস্ত আহারীয় দ্রব্য থাকে গভীর কর্ষণে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া নিম্নের মৃত্তিকা উপরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং রৌদ্র, শিশির, জল, বাতাস ও উত্তাপের ক্রিয়াবশে উহা শীঘ্র দ্রবণীয় হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারে আসে। এইরূপে অল্পাদনের মধ্যেই মৃত্তিকামধ্যস্থ উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। গভীর কর্ষণের দ্বারা নিম্নস্থ মৃত্তিকা জমির উপরের মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া উদ্ভিদের বর্দ্ধনোপযোগী হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে জলাভাববশতঃ স্বল্প ও ক্ষুদ্রমূল জাতীয় শস্য মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল নিবদ্ধ করিতে না পারায় রসাভাবে শুষ্ক হইতে পারে। মৃত্তিকা কর্ষণ করিবার পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিবার সময় বাহিরের দিকে একটু ঢালু রাখা আবশ্যক। জমি কর্ষণ করিবার পর মই দিয়া মাটি সমতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাটি বিপর্য্যয় বা ওলট্-পালট্ করিয়া দেওয়া, উত্তমরূপে চূর্ণ করা ও উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত করা কর্ষণের উদ্দেশ্য।

বীজ নির্ব্বাচন ও সুবীজ পাইবার উপায়

কৃষিকার্য্যে অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা থাকিলেও এবং সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি না হইলেও একমাত্র বীজের দোষে আশানুযায়ী ফললাভ হয় না,—বীজ ভাল হইলে ফসল ভাল হয়। নির্জীব বা রুগ্ন গাছের বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং হইলেও অঙ্কুরিত চারা শীর্ণ হয় এবং শীর্ণ গাছের ফসল সুপুষ্ট, বড় ও সুস্বাদু হয় না। এইজন্য সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট জাতীয় পরিপুষ্ট ও সতেজ বীজ বিশ্বস্ত স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া জমিতে বপন করা আবশ্যক।

ভাল বীজ জন্মাইতে গেলে এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে ভাল ভাল সতেজ গাছের উৎকৃষ্ট বীজ গ্রহণ করা, ঘনভাবে গাছ না পুঁতিয়া কিছু অন্তর অন্তর গাছ লাগান, ভাল জমিতে উপযুক্ত সার ব্যবহার করা, জল-বসা জমিতে কোন ফসল না লাগান, পর্য্যায়ক্রমে চাষ করা, বীজ বপনের পূর্ব্বে অনেকবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি কর্ষণ করা, জমিতে আগাছা জন্মিতে না দেওয়া, আবশ্যক মত উপযুক্ত পরিমাণে জমিতে জল-সেচন করা, বীজ সম্পূর্ণ পক্ক হইলে ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া আনা, কীটগ্রস্ত গাছের বীজ ব্যবহার না করা এবং কীটাদি হইতে উহা

সযত্নে রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ প্রথায় কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি কার্য্য করিতে পারিলে ফসলের প্রকৃতিই ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

কলম ও মূল হইতে গাছ জন্মাইলে গাছ ও ফল ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া থাকে কিন্তু বীজ হইতে গাছ জন্মাইলে ফল অপেক্ষাকৃত ভালও হইতে পারে মন্দও হইতে পারে। বীজের গাছ অপেক্ষাকৃত রোগশূন্য হয়। ফসলের উন্নতি সাধনের অন্যতম উপায় জাতিশঙ্কর স্থাপন করা। ভাল বীজ উৎপাদন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ নিয়মে চাষ, নির্ব্বাচন ও জাতি-শঙ্কর স্থাপন করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

বেড়া প্রস্তুত

কৃষিজাত গাছ পালা, শাক সব্জী, ফুল ফল গরু ও ছাগল প্রভৃতি জন্তুর হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে বেড়া দিবার একান্ত আবশ্যক। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বা চাষী ইষ্টক-প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা উক্ত কার্য্য সমাধা করেন। কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ ঘন ঘন বপন করিলেও এক বৎসরের মধ্যে গরু ও ছাগলের পক্ষে দুর্ভেদ্য সুন্দর বেড়া প্রস্তুত হইতে পারে। কাঁটাতার দিয়াও আজকাল অনেকে বেড়া দিয়া থাকেন। সীমানার চতুঃপার্শ্বে ঘনভাবে পাতি ও কাগজী লেবুর চারা বা কলম লাগাইতে পারিলে উহা দ্বারা উভয়বিধ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে।

বীজ বপন ও অঙ্কুরোৎপাদন

ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে বীজ বপন করা হইয়া থাকে। গম, তিসি, সরিষা, মুগ, খেঁসারী, অড়হর, পাট, ধইঞ্চা প্রভৃতির বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। ধান, তামাক, লঙ্কা, বেগুন, কপি প্রভৃতি কতকগুলি ফসলের বীজ হাপোরে পাতো দিয়া চারা বাহির করিয়া চারাগুলি একটু বড় হইলে ক্ষেতে নাড়াইয়া স্থায়ীভাবে রোপণ করা হয়। আলু, আক, হলুদ, এরারুট প্রভৃতির বীজ বা মূল জমিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে সারি দিয়া স্থায়ীভাবে বপন করিতে হয়।

বীজ বপন করিবার অথবা জমিতে চারা রোপণ করিবার ২।৪ দিন পূর্ব্বে ক্ষেতের মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। তাড়াতাড়ি জমি চাষ করিলে মাটি ভালরূপ কর্ষিত হয় না এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনাহেতু চারা বা বীজাদি বপন করিতে অধিক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে ফসল উঠিয়া গেলেই কর্ষণাদি শেষ করিয়া রাখিলে ঠিক সময়ে বীজ বপন অথবা রোপণ করা যাইতে পারে। অনর্থক সময় নষ্ট করিলে নানাদিক দিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। জমি হইতে কোন একটি ফসল উত্তোলন করিবার পর মাটি কর্ষণ করিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে আলোক, বায়ু, রৌদ্র ও শিশির প্রভাবে মৃত্তিকামধ্যস্থ

অদ্রবণীয় আহারীয় পদার্থ সহজেই উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে।

বীজ বপন করিবার পর মই বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্যের সাহায্যে মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে রস ও উত্তাপের সমভাব একান্ত আবশ্যক। আলোক ও সূর্য্যের উত্তাপ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে বিশেষ হানিকর। মাটি আলগা থাকিলে দিবাভাগে উত্তাপ ও রাত্রে শৈত্যের আধিক্যবশতঃ সত্বর অঙ্কুরোৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে। বীজ বপনের পর মাটি অল্প চাপিয়া দিলে বীজ ও আলোক বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে না পারিয়া রস ও উত্তাপের সমভাববশতঃ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্-জীবন ও তাহার কার্য্য

জীব-জন্তুর জীবনের সহিত উদ্ভিদের জীবন ও তাহার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। জীব-জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের জীবন-ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য জল, বাতাস ও খাদ্য এই তিনটি জিনিসের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের কোন একটির অভাব ঘটিলে মানুষ বা উদ্ভিদ্ কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জীব-শরীরে যেমন জলীয় ভাগের আধিক্য থাকে, গাছপালার মধ্যেও তদ্রূপ থাকিতে দেখা যায়। জীব-জন্তুর দেহ বা গাছপালা পোড়াইলে

ইহা বেশ বুঝা যায়। জীব-জন্তুর স্থায় উদ্ভিদ্‌গণও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন একটি গাছকে সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ করিয়া দুই-এক দিন রাখিলেই দেখা যাইবে যে গাছটি মারা গিয়াছে। আহার ব্যতিরেকেও গাছ বাঁচিতে পারে না। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদের জীবন-ধারণের পক্ষে জল, বাতাস ও খাদ্য বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পোষণের জন্য যাহাতে এই সমস্ত জিনিষের অভাব না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

জীব-জন্তুর স্থায় উদ্ভিদ্‌গণও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। বীজাবস্থায় গাছ বীজকোষের মধ্যে অবস্থান করে ও শ্বেতসার নামক খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মাটিতে বীজ পুঁতিলে ঐ ক্ষুদ্র গাছটি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে। তখন বীজের মধ্যে উদ্ভিদের আহারের জন্য যে অল্প খাদ্যের সংস্থান থাকে তাহাতে আর সঙ্কুলান হয় না। এইজন্য প্রথমেই শিকড় বাহির হইয়া খাদ্য-অন্বেষণে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে। পরে পাতা এবং অন্যান্য অংশ বাহির হয়। শিকড় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাছও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গাছ যেমন ডালপালা ছাড়িয়া পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়, মূল শিকড় হইতেও সেইরূপ অন্যান্য শিকড় বাহির হইয়া মাটির অধিক নিম্নে না গিয়া পার্শ্বদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিকড়ের কার্য্য মাটি হইতে রস টানিয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়া গাছের পাতায় ও অন্যান্য অংশে চালান করিয়া দেওয়া, গাছকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখা ও শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা।

শিকড়ের ডগায় যে সূক্ষ্ম শিকড়গুলি থাকে উহারাই মাটি হইতে রস গ্রহণ করে। মোটা শিকড়গুলি গাছকে সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। গাছ তুলিবার সময় এই সমস্ত শিকড় ছিঁড়িয়া যায়—এইজন্য সাবধান হওয়া দরকার। এই সমস্ত শিকড় গাছের গোড়ার নিকটে থাকে না, বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া থাকে; এইজন্য গাছে জল দিতে হইলে ঠিক গোড়ায় জল না দিয়া দূরের মাটি ভিজাইয়া দেওয়া দরকার। শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য ভালরূপ চলিবার জন্য মাটি আলগা থাকা দরকার। কাণ্ড শিকড় হইতে রস বহন করিয়া পাতায় চালান দেয়। এতদ্ব্যতীত কাণ্ড মেরুদণ্ডের কার্য্যও করে। পাতার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাণ্ড শিকড় হইতে রস বহন করিয়া পাতায় পৌঁছিয়া দিলে পাতা সেই রস উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া গাছের বিভিন্ন অংশে পাঠাইয়া দেয়। পাতা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, আলো বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, শিকড় হইতে গৃহীত অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। ফুল দ্বারা উদ্ভিদের জননকার্য্য ঘটিয়া থাকে। ফুল হইতেই ফল হয় এবং ফলে বীজ জন্মে। বীজ না জন্মিলে উদ্ভিদের জন্ম বা বংশ-বিস্তার-লাভ ঘটে না।

ফসলের রোগ

এ জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই শত্রু-মিত্র আছে। ফসলেরও শত্রু আছে। ফসলের রোগই উহার শত্রু। এতদ্ব্যতীত শূকর, সাজারু, শৃগাল প্রভৃতি পশু, নানাবিধ কীটপতঙ্গ ও পক্ষাদির দ্বারাও ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগ হইলে তাহার প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে ফসলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। কি ভাবে বা কি প্রকারে রোগের বৃদ্ধি বা প্রসারলাভ ঘটে তাহা জানা থাকিলে রোগ দমন করা সহজসাধ্য হয়।

সমুদয় ফসল সাধারণতঃ দুই প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। একপ্রকার রোগের জীবাণু বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহাকে ছাতাধরা (fungus disease) বলে; ইহা ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে। দ্বিতীয় প্রকার রোগটি কীটাণুদ্বারা ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। এই কীটাণু-জীবনে সাধারণতঃ চারিটি পর্য্যায় আছে। ইহাদের প্রথম অবস্থা ডিম্ব, দ্বিতীয় অবস্থা কীড়া, তৃতীয় পুত্তলি, চতুর্থ পতঙ্গ বা প্রজাপতি।

জমির চতুঃপার্শ্ব পরিষ্কার রাখিতে পারিলে, জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যের আলোক ও বাতাস খেলিতে পাইলে এবং প্রতি বৎসর জমিতে একই সব্জীর বা ফসলের চাষ না করিয়া

বিভিন্ন ফসলের চাষ করিলে ফসলে পোকা কম লাগে। উত্তমরূপে জমি কর্ষণের দ্বারাও মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অনেক পোকা নষ্ট হয়। গাছপালা সময়ে সময়ে ধসাধরা রোগে আক্রান্ত হয়। ধসাধরা রোগের উৎপত্তির কারণ রোগগ্রস্ত গাছের বীজ বপন করা, অথবা বীজের মধ্যে রোগের বীজাণু নিহিত থাকা। কোন বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা তুঁতের জলে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ছাইয়ের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া শুষ্ক করিয়া জমিতে বপন করিতে পারা যায়। তুঁতের জলে বীজ অধিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে উহার অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি নষ্ট হয়। গাছের উপরিভাগে কোন পোকা লাগিয়া ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে কেরোসিন জল, তামাক ও সাবান মিশ্রিত জল, হিংএর জল, তুঁতের জল, হলুদ জল প্রভৃতি ছিটাইয়া দিলে পোকা মরিয়া যায় অথবা পলাইয়া যায়। কোরা পোকা, চোরা পোকা প্রভৃতি কতকগুলি পোকা মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া ফসলের ক্ষতি করে। কোরা পোকা মাটির মধ্যে থাকিয়া গাছের শিকড় কাটিয়া নষ্ট করে। চোরা পোকা মাটির মধ্যে থাকে ও রাত্রিকালে মৃত্তিকা মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছের পাতা ও কচি কচি গাছ খাইয়া নষ্ট করে। এই সমস্ত কীট বিনষ্ট করিতে হইলে রেড়ির তৈলের আরক অথবা কেরোসিন জল পিচকারী দ্বারা গাছের গোড়ায় ব্যবহার করা উচিত। রেড়ির তৈল ও সোডা একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে করিয়া আগুনে ফুটাইতে হইবে। উহা ফুটিতে থাকিলে একটি

কাঠি দ্বারা উহা অনবরত নাড়িতে হইবে। এইরূপে জলের সহিত উক্ত দ্রব্য মিশাইয়া যাইলে পিচকারীর সাহায্যে রাত্রে গাছে ছিটাইতে হয়। মহুয়ার খোল জ্বালাইয়া ক্ষেত্রে ধূম দিতে পারিলেও পোকার উপদ্রব কমে। জমিতে জল বাধিলে অনেক সব্জী ধসাধরা রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। বেগুন ও লঙ্কা গাছ সাধারণতঃ তুলসীমারা ও ধসাধরা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে জমিতে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পায় এবং ক্ষেত্রে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্রকিরণ পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ হরিদ্রা ও নীল রঙের ছোট ছোট পোকা ঝিঙ্গা, শশা, লাউ, কুমড়া, ফুটী, তরমুজ প্রভৃতি গাছ খাইয়া নষ্ট করে। কেরোসিন জল, ছাইয়ের গুঁড়া অথবা তুঁতের জল প্রয়োগে ইহারা নষ্ট হইয়া থাকে। কাঁটালে পোকা, জাব পোকা, শুঁয়া পোকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পোকা শাকশব্জী ও ফসলের বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। ছাতরা, কাঁটালে পোকা, চোরা পোকা প্রভৃতি আলু-গাছের শত্রু। মাঠ ফড়িং, চোরা পোকা, উইচিংড়া, সাদা প্রজাপতি, সুরুই পোকা প্রভৃতি কপিগাছ নষ্ট করে। এইরূপে নানাজাতীয় পোকা ফসলের অল্প-বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। মাজরা পোকা, গন্ধি, ভোমাপোকা, ফড়িং, কোরাপোকা, লেদাপোকা, মরিচপোকা প্রভৃতি ধান্যের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ধান্যক্ষেত্রে বা অন্য কোন ফসলের জমিতে পঙ্গপাল আসিয়া পড়ে। ইহারা যে জমিতে আসিয়া

বসে সে জমির শস্য নির্ম্মূল করিয়া যায়। পঙ্গপাল আসিতেছে জানিতে পারিলে ভাঙ্গা টিন বা কেনেস্তারা, শাঁক, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর, ঢাক প্রভৃতি বাজাইতে পারিলে অথবা অনেক লোক একত্রিত হইয়া একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার বা হল্লা করিলে সেইস্থানে পঙ্গপাল আসিয়া বসিতে পারে না এবং বসিলেও পলাইয়া যায়। যব ও গমের অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গা ফড়িং বা মাঠ ফড়িং অঙ্কুর ও চারা গাছগুলি খাইয়া ফেলে। ইহারা নানাপ্রকার সব্জী এবং আক, তামাক, কার্পাস প্রভৃতি গাছও এইরূপে খাইয়া নির্ম্মূল করে। রবিফসলেরই ইহারা অধিক ক্ষতি করে। মাজরা পোকা, জাব পোকা প্রভৃতি যব ও গমের বিস্তর ক্ষতি করে। ইহাদিগকে মারিতে হইলে কেরোসিন জল, ফিনাইল বা ক্রুড-অয়েল-ইমালসন জল পিচকারী অথবা ঝারি দ্বারা ক্ষেত্রে ছিটান উচিত।

নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু দ্বারা গাছের ধসাধরা রোগ জন্মিয়া থাকে। জমি ভাল করিয়া চাষ না করা, জমিতে জল বসা, গাছে ভালরূপ রৌদ্র, আলোক ও বাতাস না লাগা, ঘনভাবে গাছ জন্মান, ছায়া জমিতে গাছ লাগান প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ।

আক, ধান, জুয়ার প্রভৃতি গাছের শীষ বাহির হইয়া কোন কোন সময় উহাতে ভূষার ন্যায় এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থ জন্মিয়া থাকে। উক্ত গাছে কখনও শস্য জন্মে না। ইহাকে গাছের

ভূষা রোগ বলে। ফসল পর্য্যায়ক্রমে চাষ করিলে এবং তুঁতের জলে বীজ অল্পক্ষণ ভিজাইয়া লইয়া গুঁড়া ছাই মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া চূণ ও গুঁড়া খইল মিশাইয়া বপন করিলে ধসা ও ভূষা রোগের বীজাণু মরিয়া যায়।

তুঁতের জলে বীজ অথবা চারা গাছ বা কলম ডুবাইয়া লইয়া চূণ, গুঁড়া খইল ও শেঁকো বিষ একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ বীজে মাখাইয়া লইলে অথবা গাছে ছড়াইয়া দিলে পোকা-ধরা নিবারণ হয়।

সাপের মাসীপিসী, জলফড়িং, ধামসা পোকা, পদ্মপোকা প্রভৃতি পোকার শত্রু এবং কৃষকের বন্ধু। ইহারা জমি হইতে ফসলের অনিষ্টকারক পোকা ধরিয়া খায়, এইজন্য জমি হইতে ইহাদিগকে তাড়াইতে নাই। যাহাতে ইহারা নির্ব্বিঘ্নে এবং অধিক পরিমাণে ক্ষেতে থাকিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ছাইয়ের গুঁড়া বা ঘুঁটের ছাই উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালনিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে অল্প কেরোসিন তৈল মিশাইতে হইবে। সকালে গাছের পাতায় ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

গন্ধকের গুঁড়া :—গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সিকি পরিমাণ গুঁড়া চূণের সহিত মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া অপরাহ্নকালে গাছের পাতায় প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের পাতা ভিজা থাকিলে উহা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়; নতুবা উক্ত চূর্ণ পাতায় না লাগিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

কেরোসিনের আরক :—কেরোসিন তৈল নরম-দেহ-বিশিষ্ট পোকার উত্তম গায়ের বিষ। কেরোসিন তৈল গায়ের যে স্থানে প্রয়োগ করা যায় সেই স্থান জ্বলিয়া যায়, জলের সহিতও ইহা মিশে না ; এইজন্য নিম্নলিখিতভাবে উহার আরক প্রস্তুত করিয়া গাছে প্রয়োগ করিতে হয়। আধপোয়া বার সোপ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দেড় সের আন্দাজ জলে ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে। সাবান জলের সহিত গলিয়া বেশ মিশিয়া গেলে নামাইয়া কেরোসিন তৈল অল্প অল্প করিয়া ঐ জলে ঢালিতে হইবে এবং খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। আড়াই সের তৈল সমস্তটা এইভাবে মিশ্রিত করা হইলে উহা দশ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী বা স্প্রেয়ার দ্বারা ছিটাইতে পারা যায়।

তামাকের জল :—নরম-দেহ-বিশিষ্ট ও পাতা-খাওয়া পোকার পক্ষে তামাকের জল বেশ ফলপ্রদ। ১ সের তামাক পাতা দশ সের জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। সিদ্ধ করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টায় উহা হইতে পারে। পরে এক পোয়া আন্দাজ বার সোপ বা সাবান টুক্‌রা করিয়া ১ সের জলে দিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে। সাবান জলের সহিত বেশ গুলিয়া গেলে উহা নামাইয়া তামাকের জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এইভাবে প্রস্তুত তামাকের জল পাঁচ ছয় গুণ জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী বা স্প্রেয়ার দ্বারা গাছে ছিটাইয়া দিতে হয়।

বোর্ডো মিকশ্চার :—ইহা ভূষাধরা বা ধসাধরা রোগের

ঔষধ। একটি বড় মাটির গামলায় আধ মণ জলে ছয় ছটাক দুই তোলা তুঁতে ভিজাইয়া ভাল করিয়া গুলিয়া লইতে হইবে। অপর একটি পাত্রে ছয় ছটাক দুই তোলা আন্দাজ পাথুরে চূণ আধ মণ জলে ভাল করিয়া গুলিয়া লইয়া বা ফোটাইয়া লইতে হইবে। পরে তুঁতের ও চূণের জল একত্র মিশাইয়া লইতে হইবে। ঔষধ ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইলে মিশ্রিত জলে একটি ছুরির ফলা ডুবাইয়া ধরিতে হয়। যদি দেখা যায় যে, ছুরির ফলাতে তামাটে রং ধরিতেছে তাহা হইলে উহাতে আরও চূণের জল মিশাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ছুরির ফলাতে আর তামাটে রং ধরিতেছে না, তখন ঔষধ ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বর্ষাকালে বোর্ডো মিকশ্চার ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে এইজন্য উহা প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া যায় না। এক মণ বোর্ডো মিকশ্চারের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ মিশাইয়া লইলে সহজে ধুইয়া যাইতে পারে না। দেড় সের জল কোন মাটির পাত্রে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে। পরে উহাতে আড়াই ছটাক আন্দাজ কাপড়-কাচা সোডা ফেলিয়া দিতে হইবে। উহা গুলিয়া গেলে তিন ছটাক আন্দাজ রজন গুঁড়া করিয়া লইয়া অল্প অল্প করিয়া উহাতে দিতে হইবে ও উহা অনবরত নাড়িতে হইবে। উক্ত জলের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ফুটিবার পর উহা উনান হইতে নামাইতে হইবে। এক মণ বোর্ডো মিকশ্চারের সহিত এই ঔষধ মিশাইয়া লইতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে-সমস্ত শাক-সব্জীর

পাতা খাওয়া হয় সেই পাতায় এই মিশ্রণ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

ক্রুড অয়েল ইমালসন :—এই ঔষধ দেড় পোয়া, এক টিন বা কুড়ি সের জলে গুলিয়া লইয়া গাছে ছিটাইতে হয়। ঔষধ খুব তেজী বা কড়া করিতে হইলে অর্দ্ধ সের পরিমাণ এক টিন জলে গুলিয়া লইতে হইবে। নরম-দেহ-বিশিষ্ট পোকার গায়ে এই ঔষধ লাগিলে উহারা মরিয়া যায়।

লেড্ আর্সিনিয়েট্ :—ইহা দুই প্রকারের পাওয়া যায়। একপ্রকার আর্সেনিক পেষ্ট, অন্য প্রকার আর্সেনিয়েট্ ডাষ্ট বা পাউডার। আর্সেনিয়েট্ পেষ্ট অর্দ্ধ ছটাক বা পাউডার সিকি ছটাক, পাথুরে চূণ এক ছটাক এবং গুড় দুই ছটাক, কুড়ি সের জলে বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া গাছে ছিটাইতে হয়। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত ঔষধ। যে-সমস্ত শাকসব্জীর পাতা আহার করা হয় তাহাতে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তন্তুবর্গ (Fibre Crops)

সাধারণতঃ নানাবিধ গাছ-গাছড়া হইতে আমরা আমাদের দৈনিক ব্যবহারের উপযোগী উপাদান স্বরূপ তন্তু বা সূত্র পাইয়া থাকি। এই সমস্ত তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে তূলা, পাট, হেম্প, কাতা, ফ্লাক্স প্রভৃতি আমাদের দৈনিন্দন জীবনযাত্রা-পথের সহায়ক। সেইজন্য সাধারণ ভাবে তন্তুর কথা বলিলে আমরা কি উপায়ে কি ভাবে ব্যবহারোপযোগী তন্তু সংগ্রহ করি তাহা জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ গাছের ছাল, পাতা ও ফুল হইতে আমরা তন্তু সংগ্রহ করি। ইহার অধিকাংশ তন্তুই আমরা সংগ্রহ করি গাছবিশেষের ছাল হইতে, যথা—পাট, মেস্তা, ঢেঁড়শ, মসিনা প্রভৃতি। পাতা হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ—আনারস ও এ্যালো, আর ফুল হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ—কার্পাস, শিমুল প্রভৃতি।

কার্পাস

অতি পুরাকালে যখন অন্যান্য দেশে সভ্যতার লেশমাত্র প্রবেশ করে নাই তাহারও বহুপূর্ব্বে ভারতে কার্পাস শিল্পের

প্রচলন ছিল। তবে ভারতবর্ষই যে ইহার আদি জন্মস্থান তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু ইহার চাষ ও বস্ত্রশিল্পের প্রচলন যে ভারতবর্ষ হইতেই আবিষ্কৃত হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা কার্পাস সূত্রের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেন একথা মনু উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মনুর বহুপূর্ব্বে এদেশে কার্পাস চাষের প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে গৃহিণী কার্পাস হইতে সূত্র কর্ত্তন ও বস্ত্র বয়ন করা স্ব স্ব ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধুনা সকল দেশই ইহার চাষ ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়াছে। আমেরিকা, জাপান, মিশর, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আমদানি হইতেছে কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতি ছিল না। ভারতে রেশমি, পশমী ও মশলিনের অভাব ছিল না। ভারতের হাতে-কাটা সুতার মত সূক্ষ্ম সুতা অধুনা বৈজ্ঞানিক যুগেও প্রস্তুত হয় কিনা সন্দেহ।

পূর্ব্বে এদেশে পাট প্রভৃতির চাষে সেরূপ আদর ছিল না। সমগ্র ভারতব্যাপী নানাস্থানে বহু কার্পাস তূলা উৎপন্ন হইত। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ তাঁত চালিত হইয়া দেশ-বিদেশে ভারতীয় কার্পাস শিল্পের সম্ভার রপ্তানি হইত। এক ভারত জাত কার্পাসবস্ত্রাদি দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়া সকলকার অভাব পূরণ করিত। বর্ত্তমানে ভারতে আর সে সমস্ত কিছুই নাই।

যে ভারতবাসী পূর্ব্বে সকল জাতির অভাব পূরণ করিত, সেই ভারতবাসী আজ নিজের অভাববশতঃ বিদেশীর দানে কৃতার্থ হইয়েছে।

বিগত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া আমরা কেবল বিদেশী বস্ত্রই আমদানি করিয়া আসিতেছি এবং যতদিন আমরা এ বিষয়ে আবার উন্নতি লাভ করিতে না পারিব ততদিন আমাদের এই ভাবেই চলিতে থাকিবে। এক্ষণে বিদেশী শিল্প বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে কাপাস উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আজ যদি আমরা নিজেদের সংস্থানের উপায় না করিয়া বিদেশী বস্ত্র আমদানি বন্ধ করি ও নিজ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা না করি তাহা হইলে আমাদের নগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার কারণ এখন এদেশে যে পরিমাণ তূলা জন্মায় তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। এখনও ভারতে লক্ষ লক্ষ যন্ত্র বিদ্যুৎবেগে চালিত হয় নাই। বিদেশীর প্রতিযোগীতায় দেশীয় শিল্প নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তূলার চাষও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় কৃষকগণ পাটের চাষে মোটা টাকা লাভ হয় দেখিয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পাটের চাষ অপেক্ষা তূলার চাষে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হইয়া থাকে। এই আন্দোলনের যুগে দেশী শিল্পের অল্প-বিস্তর আদর হইতেছে। এ সময় বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট জাতীয় তূলার চাষ করিতে পারিলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায় এবং বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিবার অবকাশ আছে।

তূলা আমাদের নানা কাজে আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্রের ইহাই একমাত্র উপাদান। কার্পাস তূলা সহজে পরস্পর সংলগ্ন হয় বলিয়া অতি সহজেই ইহা দ্বারা সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিমূল, আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেও তূলা উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাহাদের আঁশ দীর্ঘ না হওয়ায় বালিস, লেপ, গদি প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্পাসের আবশ্যকতা।

দেশী ও বিদেশী ভেদে কার্পাসের বিভিন্ন জাতি আছে। বিদেশী কার্পাসের মধ্যে সি-আইল্যাণ্ড, ইজিপসিয়ান ও কিড্‌নি এই তিন জাতিই এদেশে ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। দেশীর মধ্যে বুড়ি কার্পাস, দেব কার্পাস, গারো কার্পাস, ব্রোচ কার্পাস, বানী কার্পাস, ঢাকা, বাঙ্গি ও ধারওয়ার কার্পাস প্রভৃতি এদেশে ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও অনেক উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস আছে কিন্তু সেগুলি এদেশের জল-হাওয়ায় উপযোগী নহে। আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ উৎকৃষ্ট তূলা উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু উল্লিখিত কয়েকটি ব্যতীত আমাদের দেশে সকল জাতীয় বীজ বপনে সুফল পাওয়া যায় না।

জাতি বিভাগ।

কার্পাস সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—বার্ষিক বা মাঠ কার্পাস, গুল্ম কার্পাস ও গাছ কার্পাস।

বার্ষিক কার্পাস (Annual Cotton):—ঢাকা, ব্রোচ,

সি-আইল্যাণ্ড, ইজিপসিয়ান, ধারওয়ার, কিড্‌নি প্রভৃতি বার্ষিক কার্পাস ; প্রতি বৎসরই ইহাদের চাষ করিতে হয়। ইহার তুলা অতিশয় কোমল, শুভ্র এবং দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট। সমুদয় উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসই প্রায় এই শ্রেণীভুক্ত। এই সমুদয় তুলার সূতা হইতে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাদের সূত্রতন্তু ১॥০ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

গুল্ম কার্পাস (Shrub Cotton) :—গারো, বাঙ্গি, বুড়ি, বানী, ওলনা প্রভৃতি জাতীয় কার্পাস এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা ৩।৪ হইতে ৬।৭ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া ৬।৭ বৎসর হইতে ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ইহাদের সূত্রতন্তু ১ ইঞ্চি ১॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর গাছ তিন-চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ফল দিয়া থাকে, পরে ক্রমশঃ উহার ফলন কম হইয়া থাকে ও ফলের আকার ক্ষুদ্র হইয়া আসে। বার্ষিক কার্পাসের ন্যায় চাষ করিতে পারিলে ইহাদের তূলা উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করে।

গাছ কার্পাস (Tree Cotton) :—অষ্ট্রেলিয়ায় কারাভনিকা উল এবং সিল্ক (Caravonica Wool and Silk) নামক দুই জাতীয় গাছ কার্পাস জন্মিয়া থাকে। গাছ কার্পাস ৬।৭ হইতে ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এদেশে ইহার চাষ তাদৃশ সুবিধাজনক নয়।

বুড়ি কার্পাস :—ঢাকা জেলায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা গুল্ম শ্রেণীর কার্পাস। ইহার গাছ সাধারণতঃ ৩।৪

হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। দোআঁশ ও কাঁকুরে মাটিতে উহা ভালরূপ জন্মায়। তূলার বর্ণ শুভ্র, আঁশ দীর্ঘ, সুকোমল ও সূক্ষ্ম। বীজ হইতে তূলা সহজে ছাড়িতে চায় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করিলে বিঘাপ্রতি প্রায় দুই মণ ফলন পাওয়া যায়। একবার চাষ করিলে ক্রমান্বয়ে ৫।৬ বৎসর ইহার ফলন পাওয়া যায় কিন্তু তৃতীয় বৎসর হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা ফলন কম হয় ও ফলের আকার ছোট হইতে থাকে।

দেব কার্পাস :—অনেকে ইহাকে রাম কার্পাস নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার গাছ কিছু অল্পশাখাবিশিষ্ট। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র হইতে আশ্বিন বৎসরে এই দুই সময়ে ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। বাটীর আশে-পাশে ইহা উত্তম জন্মিয়া থাকে।

গারো কার্পাস :—এই জাতীয় কার্পাস আসামের গারো পাহাড়ে এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে ইহার অল্প-বিস্তর চাষ দেখা যায়। ইহা গুল্ম শ্রেণীর কার্পাসের মধ্যে পরিগণিত। ইহার আঁশ মোটা কিন্তু ফলন অধিক। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

ব্রোচ কার্পাস :—ভারত জাত তূলার মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থানীয়। গুজরাটের অন্তর্গত ব্রোচ জেলা ইহার জন্মস্থান। সেইজন্যই ইহা ব্রোচ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার তন্তু সূক্ষ্ম, কোমল,

ও দৃঢ়। এইজন্য ইহা হইতে অতি সহজেই উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এঁটেল মৃত্তিকায় ইহা জন্মাইতে পারা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে গুটি ফাটিয়া থাকে।

খানসা কার্পাস ঃ—আসামের অন্তর্গত কাছাড় জেলায় ইহা জন্মিতে দেখা যায়। ইহা হইতে সূক্ষ্ম ও চিক্কণ সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গারো কার্পাস অপেক্ষা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হইতে পারে।

বানী কার্পাস ঃ—মধ্য-প্রদেশে এই কার্পাস ভালরূপ জন্মে। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম, কোমল, দৃঢ় এবং চিক্কণ সূতা হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

ওলনা কার্পাস ঃ—ইহা গুল্ম শ্রেণীর কার্পাসের অন্তর্গত। ইহার গাছগুলি ঘন শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট ও ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ওলনা কার্পাসের বীজ পরস্পর পৃথক্। ইহার তুলা কোমল ও শুভ্র এবং বীজের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তুলার আঁশ ১॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহার চাষ করা যাইতে পারে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করিতে হয়।

ধারওয়ার ঃ—ইহা প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ দেশীয় হইলেও বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ধারওয়ার নামক স্থানে ইহার বিস্তৃত চাষ হওয়ায় ও তথাকার জলবায়ু বা আবহাওয়া ইহার উপযোগী

হওয়ায় ঐ স্থানের নাম অনুসারে 'ধারওয়ার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস এবং এদেশে বেশ ভাল জন্মে।

বাঙ্গি:—উত্তর-বঙ্গের পার্ব্বত্য প্রদেশ ইহার জন্মস্থান। ইহা গুল্ম শ্রেণীর কার্পাসের মধ্যে পরিগণিত হইলেও গাছগুলি অন্যান্য গুল্ম শ্রেণীর গাছ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহার গাছগুলি ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তূলা প্রদান করে কিন্তু ৩।৪ বৎসরের পর হইতে ফলন অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়। ইহার তূলা সূক্ষ্ম, শুভ্র ও সুকোমল। নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্রই এই জাতীয় কার্পাস জন্মাইতে পারা যায়। দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতেও ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বাটীর আশে-পাশে ইহার বীজ ছড়াইয়া গাছ জন্মাইতে পারা যায়। অল্প সংখ্যক গাছ থাকিলে তাহাতে সম্বৎসরে গৃহস্থের লেপ বালিসের উপযোগী তূলা ফলিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি বীজ সমেত ৯।১০ মণ তূলা জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষে জল-সেচনের বিশেষ আবশ্যক হয় না।

ইজিপসিয়ান:—ইহা মিশর দেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় তূলা। ইহার তন্তু দীর্ঘ, দৃঢ়, সুকোমল, উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণ। নদীতীরবর্ত্তী স্থানে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জন্মে। ইহার চাষে জল-সেচনের আবশ্যক হইলেও যে দেশে অধিক বারিপাত হয় মিশর কার্পাস সে দেশে ভাল জন্মে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করিতে হয়। ইহার গাছ ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত

থাকে কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে প্রথম বৎসরের ন্যায় ফলন হয় না। সেইজন্য প্রতি বৎসর ইহার চাষ করা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ২।২॥০ মণ তূলা জন্মিয়া থাকে। অন্য তূলা অপেক্ষা ইজিপসিয়ান তূলার আঁশ শক্ত।

সি-আইল্যাণ্ডঃ—ইহা মার্কিণ দেশীয় কার্পাস। ইজিপসিয়ান তূলার ন্যায় ইহাও উৎকৃষ্ট জাতীয় তূলা। এখন এদেশে ইহার চাষ হইতেছে। ইহা প্রচুর পরিমাণে ফলে ; সুতরাং এদেশে ইহার চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহার চাষ করিতে হয়। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

ঢাকা কার্পাস :—ইহা বার্ষিক কার্পাস। ঢাকা জেলাই ইহার জন্মস্থান। এই তূলার সূতা হইতেই পূর্ব্বে বিখ্যাত 'ঢাকা মসলিন' প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই জাতীয় কার্পাস জন্মিত। ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাষ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার বীজ ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ লালাভ। নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্রই ইহার চাষ করা যাইতে পারে। দোআঁশ মাটিতে ইহা ভালরূপ জন্মে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করা চলে। বিঘাপ্রতি ১৪।১৫ সের উৎকৃষ্ট তূলা জন্মিয়া থাকে।

জর্জ্জিয়ান, ম্যাকসান, ডানক্যান, ডিক্সন প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতীয় মার্কিণী কার্পাস আছে। প্রতি বৎসরই ইহার চাষ করা আবশ্যক। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহাদের চাষ করা

যুক্তিসঙ্গত। ইহাদের চাষে প্রচুর পরিমাণে জল-সেচনের আবশ্যক। এদেশে যাহাতে এই সমস্ত কার্পাসের চাষ প্রসার লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী উচ্চ ভূভাগে কার্পাস উত্তম জন্মিয়া থাকে। নিম্ন ও জলাভূমি কার্পাসচাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত স্থান। যে ভূমি অনাবৃত এবং যাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক অধিক প্রকাশ হয় এইরূপ উচ্চ ও মাঝামাঝি দোআঁশ জমি কার্পাসচাষের জন্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সম্ভবত আমেরিকা, ইজিপ্ট, ধারওয়ার প্রভৃতি স্থান সমুদ্রকূলবর্ত্তী বলিয়া ঐ সমস্ত স্থানে কার্পাস ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান অধিক না থাকিলেও অনেক উচ্চ দোআঁশযুক্ত নদীর চর আছে, ঐ সমস্ত স্থানে কার্পাসের চাষ করিলে ইহা উত্তম ফলপ্রসু হয়। এঁটেল মাটিতে কার্পাস জন্মিতে পারে কিন্তু ইহা অপেক্ষা তুধে এঁটেল মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হাইদ্রাবাদ, বেরার (বিদর্ভ), মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তরাজ্য, আজমীর, মারবার, রাজপুতানা এবং মধ্যভারতে প্রচুর তূলা জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় এবং কটক, দ্বারভাঙ্গা, মানভূম ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে তূলার চাষ করিলে প্রচুর তূলা জন্মাইতে পারা যায়।

উপযুক্ত ভূমি।

কার্পাসের জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা আবশ্যক। ইহার মূল

সাধারণতঃ এক হাত মাটির নীচে পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। এইজন্য ইহার জমি সেই অনুযায়ী গভীর ভাবে কর্ষণ করা কর্ত্তব্য। পতিত জমি হইলে বর্ষার ২।৩ মাস পূর্ব্বেই চাষ আরম্ভ করিতে হয়। ঐ সময়ে ২।৩ বার লাঙ্গল দিয়া জমির মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। পরে বীজ-বপনকাল উপস্থিত হইলে পুনরায় জমিতে লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়।

ভূমি কর্ষণ।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বিনাসারে কার্পাস উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ইহাতে কার্পাসের ফলন কম হয়। এইজন্য সাধারণ কৃষকগণ কার্পাসচাষে সুফল না পাইয়া উহার চাষ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রীতিমত সার প্রয়োগ পূর্ব্বক জমি প্রস্তুত করিয়া চাষ করিলে ইহা একটি লাভের ফসল। তূলার জমিতে প্রথমত ফস্ফরিক এ্যাসিড এবং কতক পরিমাণে নাইট্রোজেন ও পটাসের আবশ্যক হয়।

সার প্রয়োগ।

অস্থিচূর্ণ, ছাই, গোবর, খইল, সজীসার, পুষ্করিণীর পাঁক-মাটি, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জমি-প্রস্তুতকালে মাটির সহিত ইহা উত্তমরূপে মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

গোময়, পাতা-পচা সার ও অন্যান্য পশু-বিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে জমিতে স্বতঃই কীট জন্মিয়া থাকে। এইজন্য ঐ সমস্ত সারের সহিত কিছু ছাই ও সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা দরকার।

বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গোবরসার, ৮।১০ মণ ছাই, ১৮।২০ মণ পচা আবর্জ্জনা অথবা ১০।১২ মণ গোবরসার, ১০।১২ সের সালফেট অফ্ এ্যামোনিয়া, ৭।৮ সের সুপারফস্ফেট বা হাড়ের গুঁড়া ও সালফেট অফ্ পটাস ৬।৭ সের ব্যবহার করিতে পারা যায়। কার্পাস বীজ হইতে তৈলাংশ বাহির করিয়া লইলে যে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে সেই ১০।১২ মণ জমিতে ব্যবহার করিলে সারের কাজ করে। জমিতে চূণ ও লবণ ব্যবহার করিতে হইলে বীজ বপনের অন্ততঃ ২।৩ মাস পূর্ব্বে উহা জমিতে ছড়াইয়া লাঙ্গল দিয়া রাখিতে হইবে। জমিতে সোরা প্রয়োগ করিতে হইলে বর্ষার প্রথম ভাগে জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা বর্ষার শেষে আশ্বিন মাসে জমিতে প্রয়োগ করিবার পর জল-সেচন আবশ্যক। গাছ রোপণের একমাস পূর্ব্বে জমিতে লাঙ্গল দিয়া বিঘাপ্রতি ৫।৬ টিন গোমূত্র দ্বিগুণ জলের সহিত মিশাইয়া জমিতে প্রয়োগ করিতে পারিলে কার্পাসের ফলন অধিক হয়।

বপনের সময়।

অধিক বর্ষায় কার্পাস গাছ জন্মে না এবং জন্মিলেও তাহা মরিয়া যায়। এইজন্য অনেকে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে উহা বপনের পক্ষপাতি কিন্তু এ সময়ে বপন করিলে গাছের অধিক পরিচর্য্যা আবশ্যক। যে-সমস্ত স্থানে বৃষ্টির ভাগ অধিক তথায় ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা উচিত, কারণ বৃষ্টির অল্পতা-নিবন্ধন এ সময় গাছ মারা যাইবার সম্ভাবনা

খুব কম এবং এই সময়ে বীজ বপন করিলে বর্ষার পূর্ব্বে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ভাল ফলন পাওয়া যায়।

দেশী এবং মিশর দেশীয় কার্পাস বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বপন করা বিধেয়। কোন কোন স্থানে বার্ষিক কার্পাস বর্ষার প্রথমে ও বর্ষার শেষে অর্থাৎ বৎসরে দুইবার জন্মান হইয়া থাকে। ইহাতে পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে দুইবার ফলন পাওয়া যায়। মার্কিণ দেশীয় কার্পাস বর্ষার শেষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করাই প্রশস্ত, কারণ ইহা বর্ষায় ভাল জন্মে না কিন্তু সুবিধা মত জমি ও জো পাইলে মাঘ ফাল্গুনে বীজ বপন করিতে পারা যায় এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের মধ্যেই ফলন পাওয়া যায়। জমি এবং স্থান বিশেষে কার্পাস ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বপন করা হইয়া থাকে কিন্তু ইহার পক্ষে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই প্রশস্ত।

বপন ও রোপণ প্রণালী।

কার্পাসের বীজ ছিটাইয়া, লাইন দিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে এবং বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট জমিতে স্থায়ীভাবে —এই তিন প্রকারে বপন করা যাইতে পারে। ছিটাইয়া বপন করিলে অল্প পরিশ্রম হয় বটে কিন্তু স্থানে স্থানে বীজ ঘনভাবে পড়ায় কোন স্থানে বেশী এবং কোন স্থানে বা কম চারা জন্মিয়া থাকে। ইহাতে জমি পাট করিবার অসুবিধা হয় এবং বর্ষাকালে জমিতে জল বাধিলে জল বাহির হইয়া যাইবার কোন উপায় না থাকায় জমিতে জল বসিয়া গাছ খারাপ করে।

বৃক্ষ ও গুল্মশ্রেণীর কার্পাস এইরূপভাবে বপন করা উচিত নহে। বার্ষিক কার্পাস ঈষৎ ঢালু জমিতে ২॥০ হাত ৩ হাত অন্তর পৃথক্‌ভাবে ছিটাইয়া বপন করিলে চলিতে পারে। গুল্ম শ্রেণীর কার্পাস ছিটাইয়া বপন করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা পৃথকভাবে বপন করা আবশ্যক এবং প্রতি বৎসর ফলন শেষ হইলে গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া দিয়া গোড়ায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বার্ষিক শ্রেণীর কার্পাস বিঘাপ্রতি /১ সের হইতে /১॥০ সের এবং গুল্ম শ্রেণীর কার্পাস /৸০ পোয়া ও বৃক্ষ জাতীয় কার্পাসের বীজ /৷৵০ পোয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় প্রণালী মতে বীজ বপন করা মন্দ নহে। এই প্রণালীতে চাষ করিতে হইলে চারা না জন্মাইয়া ২॥০ হাত ৩ হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে তিন হাত ব্যবধানে এক-একটি মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাদায় ৩।৪টি করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। চারা প্রস্তুত হইলে প্রতি মাদায় ২।১টি মাত্র সতেজ চারা রাখিয়া বাকিগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। ভাদ্র আশ্বিন মাসে চাষ করিলে এই প্রণালী মতে চাষ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ তখন বর্ষার অল্পতা-বশতঃ চারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে নাড়িয়া বসাইলে গাছের তেজ কমিয়া যায়। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া জমিতে রোপণ করাই প্রশস্ত।

বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া জমিতে রোপণ করিলে গাছগুলি শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট ও ঝাড়াল হইয়া থাকে। পূর্ব্ব

অপেক্ষা পশ্চিমদিকের রৌদ্র অল্প লাগে এরূপ অল্পছায়াযুক্ত স্থানে চারা প্রস্তুত করণের জমি নির্ব্বাচিত করিয়া জমি কর্ষণ পূর্ব্বক সার মিশ্রিত করিয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণিত হইলে বীজ বপন করা উচিত। জমি শুষ্ক থাকিলে বপনের পূর্ব্বে জল-সেচন পূর্ব্বক মাটি ভিজাইয়া সরস করিয়া লইতে হইবে। জমিতে বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা জলে ভিজাইয়া লইয়া শীতল স্থানে সমস্ত দিন রাখিয়া বীজগুলি বৈকালে বপন করাই প্রশস্ত। এইরূপ বপনে অতি সহজে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন হইয়া থাকে। সামান্য গোবর জলের সহিত মাখা মাখা ভাবে গুলিয়া কার্পাস বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ১৫।১৬ ঘণ্টা উহাতে ভিজাইয়া রাখিলে অতি শীঘ্রই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। আবশ্যক মত জল-সেচন করিলে এবং মধ্যে মধ্যে চারাগুলির গোড়ার মাটি নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে পারিলে উহা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চারাগুলি এক ফুট আন্দাজ দীর্ঘ হইলে জমিতে নাড়াইয়া স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে পারা যায়। রোপণ করিবার সময় চারাগুলির মূল শিকড় ছাঁটিয়া দিলে গাছগুলি খর্ব্বকায় এবং অধিক শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট ও ঝাড়াল হইয়া থাকে। গুল্ম শ্রেণীর কার্পাস গাছ প্রতি বৎসর ফলনের শেষে ছাঁটিয়া এবং সার প্রয়োগ পূর্ব্বক গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। আবশ্যক মত গাছে মধ্যে মধ্যে জল-সেচন করা উচিত। মৈশরী কার্পাসের চাষে অধিক জল-সেচন আবশ্যক। জল-

সেচনের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে জমির মাটি কোদালি দ্বারা কোপাইয়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রতিবারে অল্প অল্প সেচন না করিয়া বাঁধাকপি প্রভৃতির জমিতে যেরূপ ভাবে জল-সেচন করা হয় সেইরূপ ভাবে কিছুদিন অন্তর আবশ্যক মত ক্ষেতের মাটি সম্পূর্ণ ভিজাইয়া সেচন করিলে ভাল হয়। জল-সেচন করিবার পর মাটি চাপিয়া যায়। এইজন্য জমিতে জল-সেচন করিবার ৮।১০ দিন পরে গাছের গোড়ার মাটি নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। ফল পরিপক্ক হইয়া ফাটিবার প্রায় মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে জমিতে জল-সেচন বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা ঐ সময়ে জল-সেচনহেতু তূলা স্বল্পবলী হইয়া থাকে। বপনের পর ৬।৭ মাসের মধ্যেই গাছের ফলন আরম্ভ হইতে থাকে।

কার্পাসক্ষেত্রে অনেক সময় কীটপতঙ্গের অতিশয় উপদ্রব হইয়া থাকে। কার্পাস গাছের পাতা গুটাইয়া চুঙ্গির মত করিয়া তাহার মধ্যে চুঙ্গি পোকা নামক এক জাতীয় পোকা অবস্থান করে। পোকাগুলির প্রজাপতি দিবাভাগে কার্পাসক্ষেত্রে উড়িয়া বেড়ায় এবং গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। তিন-চারি দিনের মধ্যে ডিমগুলি ফাটিয়া উহা হইতে ছোট ছোট পুত্তলী আকারের পোকা বাহির হয়। কীড়াবস্থায় উহারা পাতা খাইয়া থাকে। ৮।১০ দিনের মধ্যেই পোকাগুলি প্রজাপতির আকার ধারণ করে ও ক্ষেত্রময় ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের নষ্ট করিতে হইলে কীটাবস্থায়

কার্পাসের পোকা।

কোঁকড়ান পাতা সমেত উহাদিগকে গাছ হইতে তুলিয়া আনিয়া একস্থানে জড় করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। বোম্বাই এবং মিশর দেশীয় কার্পাসের ডাঁটায় ও ডালে এক প্রকার ছোট ছোট সাদা রঙ্গের পোকা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা কার্পাস গাছের ডাঁটা কুরিয়া খায়। ডাঁটার মধ্যে যেস্থানে ইহারা থাকে তথায় একটি বড় গিরার মত হইয়া ফুলিয়া উঠে। দেশী কার্পাসের গাছে সাধারণতঃ এই জাতীয় পোকা দেখা যায় না।

সাদা ও হলদে রঙ্গের স্থতলী পোকা কার্পাস গাছে গুটি ধরিলে তাহা নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের প্রজাপতি দিনের বেলায় পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে ফুলের মধ্যে, পাতার উপর বা গুটিতে ডিম পাড়িয়া থাকে। ৪।৫ দিনের পরে কীড়াগুলি ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া—হয় কার্পাসের গুটির নতুবা কচি ডগার ভিতর গর্ত্ত করিয়া প্রবিষ্ট হয় ও ভিতর কুরিয়া খাইতে থাকে। বড় গুটির মধ্যে ঢুকিলে গুটির উপরিভাগে ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং ছিদ্রের চতুঃপার্শ্বে কাল পোকার বিষ্ঠার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। কিছুদিন এইভাবে থাকিবার পর ইহারা পুত্তলীর আকার ধারণ করে ও পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

ঝাঙ্গা পোকা নামক অন্য এক জাতীয় পোকা কার্পাসের গুটি আক্রমণ করিয়া থাকে। উহারা গুটির মধ্যে না ঢুকিয়া উপর হইতে শুঁড় দ্বারা বীজের রস চুষিয়া খায়। যে-সমস্ত

গাছে এরূপ পোকা থাকে সে সমস্ত গাছে তূলা ভাল জন্মে না এবং যাহাও জন্মে তাহাতে কোন কাজ চলে না। তূলাগুলি সাধারণতঃ দাগী, অপক্ক ও স্বল্প আঁশযুক্ত হইয়া থাকে।

কার্পাস ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বন্য সিদ্ধির বা ঐরূপ তীব্রগন্ধযুক্ত কোন গাছ লাগাইলে সহজে ক্ষেত্রমধ্যে কীট প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ক্ষেত্রমধ্যে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইলে অথবা গন্ধকের ধূম দিতে পারিলে ক্ষেত্রস্থিত অনেক পোকা পুড়িয়া মরে, না হয় পলাইয়া যায়।

অন্যান্য ওষধি গাছের ন্যায় তূলা এককালে পরিপক্ক হয় না। এইজন্য ২।৩ দিন অন্তর বৈকালে ফাটা ফলগুলি হইতে তূলা মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে চয়ন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তূলা-বীজ পরিপক্ক হইয়া ফাটিতে আরম্ভ করে। তূলাতে জল লাগিলে উহা বিবর্ণ ও ময়লা হইয়া যায়। এইজন্য বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে ২।১ দিনের মধ্যে ফাটিয়া যাইবে এইরূপ পরিপুষ্ট আধ-ফাটা তূলাগুলি গাছ হইতে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া আনিতে হইবে এবং ঘরের মধ্যে কোন পরিষ্কার ও শুষ্ক স্থানে বিছাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

তূলা চয়ন।

যে গাছের তূলা বীজের জন্য রাখিতে হইবে তাহা উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজের গাছ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় কয়েকটি সতেজ গাছ বীজের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং কীটপতঙ্গ হইতে

বীজ সংগ্রহ।

উহাদিগকে সযত্নে ও সাবধানে রাখিতে হইবে। ঐ গাছগুলির গোড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল সার প্রয়োগ করিতে হইবে, গোড়ার মাটি মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে, আবশ্যক মত জল-সেচন করিতে হইবে এবং যত্নপূর্ব্বক পাট করিতে হইবে। তূলা ফুটিবার একমাস পূর্ব্ব হইতেই জল-সেচন বন্ধ করা আবশ্যক। যে সমস্ত কার্পাসের ফলন অধিক, ফলের আকার বড়, খোসা পাতলা, বীজ কম এবং তূলা অধিক, যে ফলের তূলার তন্তু আঁইশযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ—সর্ব্বপ্রথমে সেই জাতীয় তূলার বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

অযত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে দেশী কার্পাস বিঘাপ্রতি ১৪।১৫ সের ফলে কিন্তু যত্নদ্বারা সার প্রয়োগপূর্ব্বক চাষ করিতে পারিলে বীজসমেত বিঘাপ্রতি ২॥০-৩ মণ পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। ইহার শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ আঁশ, অবশিষ্টাংশ বীজ।

এদেশে অনেক স্থানে কার্পাসের বীজ অযথা ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করা হয়। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে কার্পাসের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ১০০ পাউণ্ড আমেরিকান তূলা-বীজ হইতে ২ গ্যালন (১০ সের) কার্পাস তৈল এবং ৩৫।৩৬ সের কার্পাস খইল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশী তূলা-বীজ ১ হন্দর বা ৫৬ সেরে ৪২ সের খইল ভাগ এবং ১০ সের তৈল পাওয়া যায়। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে উক্ত

তৈল সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্পাসের খইল গবাদি পশুদিগকে খাওয়াইলে উহারা অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাওয়াইলে উহারা অধিক দুগ্ধ প্রদানে সমর্থ হয়। নাগপুর কৃষিশালায় গো-জাতি পশুকে অন্য খইলের পরিবর্ত্তে দৈনিক এক সের হিসাবেকার্পাস বীজের খইল খাইতে দেওয়া হয়। পাটনা জেলায় তূলা-বীজ একপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত কার্পাসের খইল অতি উৎকৃষ্ট সার হিসাবে জমিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কার্পাসের সহিত চিনাবাদাম, অড়হর, তিল, জুয়ার, ভুট্টা, রেড়ি প্রভৃতি গাছ জন্মাইতে পারা যায়।

সাধারণতঃ কার্পাস এবং অন্যান্য খইলে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়ঃ

	নাইট্রোজেন	ফস্ফরিক এ্যাসিড্	পটাস
চিনাবাদামের খইল	৭.৬	৯	৪
কার্পাসের খইল	৬.৭	১.৫	২.৩
রেড়ির খইল	৫.৭	২.৯	২.৫
সরিষার খইল	৫.৫	১.৫	৩

আয়ুর্ব্বেদমতে কার্পাস—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পাতা—রক্তকারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ হইতে পূযস্রাব রোগে উপকারক। কার্পাসের বীজ—গুরুপাক, স্তন্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক।

পাট

পূর্ব্বে ভারতে পাটের তাদৃশ আদর ছিল না। এখন যে সমস্ত কার্য্য পাট দ্বারা সম্পন্ন হয়, পূর্ব্বে কার্পাসের এত অধিক চাষ ছিল যে, কার্পাস তূলার দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত। কিন্তু যে দিন বিদেশীর অত্যাচারে এদেশের বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস হইল, কার্পাসের চাষ উঠিল এবং যন্ত্রবলে বস্ত্র-বয়নের উপায় আবিষ্কৃত হইল, যে দিন হইতে পাশ্চাত্ত্যেরা পাটের স্বল্পমূল্যতা, পাটের সূতার শুভ্রতা ও চিক্কণতা বুঝিল, সেইদিন হইতেই পাটের আদর বাড়িল।

ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ইহা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার চাষ সম্বন্ধে এদেশীয় কৃষকগণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বঙ্গদেশ হইতে কোটী কোটী টাকার পাট প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত টাকা যদি আমাদের ঘরে থাকিত তাহা হইলে পাটের চাষে আমরা ধনী হইতাম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে আমরা যে পাটের মণ ৬৲-৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করি তাহাই বিদেশ হইতে আসিলে (তৎপ্রস্তুত দ্রব্যাদি) প্রতিমণ ২।৩ শত টাকা দরে ক্রয় করিয়া লই।

ইহাতে যে আমাদের পরিশ্রমসার এবং সর্ব্বনাশ ব্যতীত মঙ্গল নাই তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। পাট পচাইয়া কাচিবার জন্য আমাদের দেশে জলাশয়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকায় কাঁচা টাকার লোভে আমরা আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় পানীয় বা ব্যবহার্য্য জল অপবিত্র ও দূষিত করিতেছি। পাট-পচান দুর্গন্ধযুক্ত জল বায়ু দুষিত করিয়া দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিস্তৃতি ঘটাইতেছে। ঐ সমস্ত জল পান করিয়া দেশে কলেরা রোগ সংক্রামিত হইতেছে। আবার টাকার মোহে আমরা ধান্যের চাষ কমাইয়া বিদেশী প্ররোচনায় পাটের চাষে উৎসাহিত হইতেছি। আজকাল দেশে অর্থের অভাব কেন? আজকাল পাট যে দামে বিক্রয় হইতেছে তাহাতে পাটচাষের খরচও সঙ্কুলান হইতেছে কিনা সন্দেহ, তবুও আমরা এমনই মূর্খ এমনই মোহাবিষ্ট যে জীবনধারণের উপকরণ ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আজ যদি আমরা পাট-চাষে প্রবৃত্ত না হইয়া ধান্যের চাষ করিতাম তাহা হইলে আমাদের এত অভাব ঘটিত না। ভারতে যত অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয় পৃথিবীর সমস্ত স্থানে তাহার অর্দ্ধাংশও হয় কিনা সন্দেহ। পাট ব্যতীত কোন জাতির বাণিজ্য চলিতে পারে না। আমেরিকা, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু চেষ্টাতেও ইহার চাষে সুফল ফলে নাই। এইজন্য পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্যজীবী জাতিই আজ বাঙ্গালার দ্বারস্থ।

বঙ্গের প্রায় সকল স্থানেই পাটের চাষ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে

ভারতের অন্যান্য স্থানে অল্প-বিস্তর পাট জন্মিলেও বঙ্গদেশ ব্যতীত কোথাও প্রচুর পরিমাণে ইহা উৎপন্ন হয় না।

উৎকৃষ্ট জাতীয় পাটের আঁইশ রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল। এইজন্য ইহা হইতে নানাবিধ বস্ত্রশিল্প, ক্যাম্বিশ, আসন, গালিচা প্রভৃতি এবং গোড়ার মলিন অংশ দ্বারা কাগজ, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাট বহুপ্রকারের আছে। উহা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—তেতো (Corchorus Capsularies) এবং মিঠা (Corchorus Olitorious). মিঠে পাটের চাষ উঁচু বা ডাঙ্গা জমিতে এবং তেতো পাটের চাষ নিম্ন বা জলা জমিতে হইয়া থাকে। মিঠা পাটের ফল লম্বাকৃতি এবং বীজ সবুজ বর্ণের ও তেতো পাটের ফল গোলাকার ও বীজ লালচে হয়। মিঠা পাট অপেক্ষা তেতো পাটের আঁশগুলি শক্ত হইয়া থাকে।

নদীর পলিপড়া মাটি পাটচাষের পক্ষে প্রশস্ত। অধিক বালুকাময় পাহাড়ে অথবা লালমাটিতে পাট ভালরূপ জন্মিতে পারে না। লোণা মাটিতে দেশী পাট ভাল জন্মিলেও সিরাজ-গঞ্জী বা অন্য জাতীয় পাট ভাল জন্মে না। নূতন পাট উচ্চ ও নীচু জমিতে সমানভাবে জন্মায়। জমির অবস্থা অনুসারে মাঘ ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পাট-বীজ বপন করা হয়। বিল অথবা নিম্ন জমিতে কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য,

কারণ পাটগাছের গোড়ায় ২।৩ ফিট জল হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না সত্য কিন্তু গাছগুলি ১ হাত ১৷৷০ হাত হওয়ার পূর্ব্বেই যদি নদীর বান আসিয়া জমিতে পতিত হয় তাহা হইলে সেই জমিতে আর ফসলের আশা করা যায় না। অতএব বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই নিম্ন জমির গাছগুলি যাহাতে সতেজ হইয়া উঠিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পাটগাছের কিয়দংশ অল্প জলে কিছুদিন ডুবিয়া থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অধিক দিন জলে ডুবিয়া থাকিলে পাটের আঁইশ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য কিছু উচ্চ জমিতে পাটচাষ করা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেখা যায় নিম্ন বা জলা জমির পাট অপেক্ষা উচ্চ বা ডাঙ্গা জমির পাটের আঁইশ দীর্ঘ, উজ্জ্বল, শক্ত ও শুভ্র হইয়া থাকে।

শীতের প্রারম্ভেই পাটের জমির চাষ আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে ক্ষেত্রস্থ আগাছা প্রভৃতি পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনঃপুনঃ কর্ষণের ফলে যৌগিক ক্রিয়াবশে মৃত্তিকা সরস হইয়া আপনা হইতেই চাষের উপযোগী হইয়া থাকে।

বাঙ্গলায় পাটের এত অধিক চাষ হয় যে, সার দিয়া জমি চাষ করিয়া পাটের বীজ বপন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে পাটের আঁইশ দীর্ঘ ও শক্ত হয় এবং উহার শুভ্রতা ও চিক্কণতা বাড়ে। এইজন্য উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। সুতরাং অধিক পরিমাণ জমি বিনাসারে চাষ না করিয়া কিছু জমিতে সার

প্রয়োগ পূর্ব্বক চাষ করায় লাভ আছে। দোআঁশ, পলি, চর বা এঁটেল জমিতে পাট ভাল জন্মে। যে-সমস্ত জমিতে বর্ষাকালে নদীর জল উঠিয়া পাল পড়ে, সেইসমস্ত জমিতে সার দিবার বিশেষ আবশ্যক করে না। বিঘাপ্রতি জমিতে ৭০।৮০ মণ গোবরসার ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গোয়ালের আবর্জ্জনা, খড়, কুটা, পাতা প্রভৃতি জঞ্জালাদি পচাসারও ইহার জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে কচুরি-পানা নামক এক জাতীয় ছোট পানা পুষ্করিণীর জল নষ্ট করিয়া থাকে। একবার স্থান পাইলে ইহারা রক্তবীজের মত পুষ্করিণীর সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া বসে, সহজে মরে না। এই সমস্ত পানা পুষ্করিণী হইতে তুলিয়া ফেলিয়া নষ্ট না করিয়া পাটের জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাটের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিঘাপ্রতি ১০০/ মণ কচুরিপানাপচা সার প্রয়োগ করিলে পাটের ফলন প্রায় দেড়গুণ অধিক হয়।

পাটের জমিতে সার প্রয়োগ পূর্ব্বক লাঙ্গল দিয়া মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। পরে সামান্য বৃষ্টি হইয়া মাটি অল্প ভিজিয়া গেলেই বীজ বপন করা শ্রেয়ঃ। বিঘাপ্রতি ১৷৷-/২ সের বীজ লাগে। ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। জমিতে ঘনভাবে চারা জন্মিলে জমি নিড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হইয়া যায়। ইহাতে ভাল পাট জন্মে না। আবার খুব পাতলা করিয়া বীজ বপনে গাছের শাখাপ্রশাখা বাহির হয়

বলিয়া পাটের গুণ নষ্ট ও ফলন কম হয়। গাছগুলির পরস্পরের ব্যবধান যেন ৩।৪ ইঞ্চি অপেক্ষা বেশী না হয়। গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে ক্ষেতের নিড়ান কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। ঐ সময়ে বিঘাপ্রতি জমিতে ২০।২২ সের সোরা জলে গুলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথমবার জমিতে নিড়ান দিবার ২২।২৪ দিন পরে পুনরায় নিড়ান দেওয়া আবশ্যক। বর্ষার পূর্ব্বেই এই কাজগুলি সম্পন্ন করা আবশ্যক, নতুবা বর্ষারম্ভে ক্ষেতের পাট করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

পাটগাছে ফুল হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে উহারা কর্ত্তনোপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে; সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া গাছে ফল ধরিবার সঙ্গেসঙ্গেই উহাদিগকে কাটা আবশ্যক। ফল ধরিবার পর পাট কাটা হইলে উহার আঁইশের চিক্কণতা লুপ্ত হয়। গাছে ফল ধরিবার পর কিছুদিন জমিতে থাকিলে ফল পাকিয়া যায়। ঐরূপ অবস্থায় কর্ত্তন করিলে পাটের তন্তুর ওজন বাড়ে বটে কিন্তু আঁইস মোটা ও কর্কশ হইয়া থাকে। পাট ধারাল আস্তে দিয়া মাটির ঠিক উপর হইতেই কিছু অংশ বাদ দিয়া কাটা উচিত। পাট কাটিয়া ২।৩ দিন উহাদিগকে জমিতে ফেলিয়া রাখিতে হয়; পরে ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া জলে জাগ দিতে হয়।

যে স্থানে পাট জাগ দিতে হইবে সে স্থানটি বসতবাটী হইতে একটু দূরে হওয়া আবশ্যক। কারণ, পাট যে জলে পচান হয় সেই জল দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত হইয়া থাকে। পাট জাগ

দিবার অন্ত বন্দোবস্ত না থাকিলে ঐ সমস্ত জলপানে বা ব্যবহারে কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ প্রবল হয়। খোলা, লোণা, স্রোত অথবা গভীর জলে পাট পচান উচিত নহে, এতদ্ব্যতীত বাটী হইতে দূরে বিল অথবা কোন জলাশয়ে পাট পচাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।

পাট জাগ দিবার সময় ছোট ছোট আঁটিগুলি একটির পর একটি সাজাইয়া সকলের উপরে কিছু ভারী পদার্থ রাখিয়া পাট গাছগুলি সম্পূর্ণ জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ১০।১২ দিনের মধ্যে গাছের ছাল পচিয়া তন্তুগুলি বাহির হইয়া পড়ে, তখন উহা কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পক্ক পাট-গাছ পচিতে আরও অধিক সময় লাগে। স্থান বিশেষে পাট-গাছ ৭।৮ হাত বা ততোধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি সাধারণতঃ ৬।৭ মণ পাট জন্মে। সার দিয়া ভালভাবে পাট করিয়া বীজ বপন করিলে প্রায় ৯।১০ মণ শুষ্ক পাট পাওয়া যায়; তবে স্থান বিশেষে এবং জমির অবস্থাভেদে উর্ব্বরতা অনুযায়ী ইহার কিছু কম-বেশীও হইয়া থাকে।

পাটের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা রেড়ির তৈলের ন্যায় প্রদীপ জ্বালাইবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাটের শুষ্ক কাঠি জ্বালানীকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ২।১ জাতীয় বন্য পাট জন্মিয়া থাকে; নষ্ট না করিয়া উহা হইতে পাটের ন্যায় সূত্রাংশ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এক প্রকার

তেতো পাট জন্মে ; উহার শাককে বাঙ্গলায় নাল্‌তে পাতা কহে। নালিতা পাতা শুষ্ক ভাজিয়া লবণ ও তৈল ব্যতীত অন্নের সহিত প্রথম কয়েকদিন খাইলে আম অতি সহজে নির্গত হইয়া যায়। নাল্‌তে পাতা রক্তপিত্তরোগে উপকারক এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক। নাল্‌তে ভিজান জল—পিত্তনাশক, রুচিকর এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক।

পাটের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার নানাবিধ অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়ের উপদ্রবও বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণতঃ ঘোড়া পোকা, লেদা পোকা, সবুজ বর্ণের পোকা, বিদা পোকা, উইচিংড়ি, লাল মাকড়, পাটের পাতা পোকা ও ডগার মাজরা—এই কয়প্রকার পোকাই পাটগাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই সমস্ত পোকার মধ্যে কোন কোন জাতীয় পোকা পাটগাছের পাতার সবুজ অংশ খায়, কেহ বা তাহার নীচে থাকিয়া উহার রস চুষিয়া খায়, কোন পোকা গাছের ডগায় ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক কোমলাংশ খাইয়া গাছ নষ্ট করিয়া দেয়, কোন পোকা চারা অবস্থায় গাছ কাটিয়া দেয়, আবার কোন পোকা চারা গাছের কচি কচি পাতা খাইয়া গাছ মুড়া করিয়া দেয়।

ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ দ্বারা উহাদের উপদ্রব নিবারণ করা বড় কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষকের পক্ষে ঔষধ ছিটাইবার যন্ত্রাদি ক্রয় করা ও ঔষধের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। এইজন্য যাহা সহজ-সাধ্য ও [illegible]রকারী কৃষিক্ষেত্রে যাহা ব্যবহারে সুফল পাওয়া

গিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। সবুজবর্ণের পাটের ঘোড়া পোকা বর্ষাকালেই পাটগাছের পাতা খাইয়া বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহার কীড়া পাটগাছের ডগায় থাকিয়া পাতা খাইয়া থাকে; নাড়া দিলেই পোকা মাটিতে পড়িয়া যায়। ছোট অবস্থায় গাছে পোকা লাগে। ডগের পাতা খাওয়ায় গাছের বৃদ্ধি পাইবার পক্ষে বিশেষ বাধা হয়। মোটা দড়িতে কেরোসিন তৈল মাখাইয়া উহা দুইদিকে দুইজন ধরিয়া পাট-গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। এইরূপ করিলে পাটগাছের ডগায় কেরোসিন লাগিয়া যায় এইজন্য উহাতে আর পোকা লাগিতে পারে না। পোকাধরা থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহা ক্ষেত্রস্থ গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে ঘোড়া পোকা থলিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তখন উহাদিগকে কেরোসিন জলে অথবা আগুনে ফেলিয়া মারা সম্ভবপর।

হলুদবর্ণের বিছাপোকা কীড়া অবস্থায় পাটগাছের পাতার সবুজাংশ খাইয়া জালের মত করিয়া ফেলে। এই পোকাগুলি একত্র দল বাঁধিয়া থাকে এবং বড় হইলেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিছাপোকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে গাছ পাতাশূন্য হইয়া যায়। একপ্রকার বোলতা জাতীয় কাল ছোট পোকা হলদে বর্ণের বিছাপাকার গায়ে ডিম পাড়ে এবং বোলতার কীড়া বিছাপোকাকে খাইয়া মারিয়া ফেলে। হরিদ্রাবর্ণের সাধারণ বোলতাও বিছাপোকার শত্রু। ইহারা বিছাপোকার গায়ে হুল ফুটাইয়া মারিয়া খাইয়া ফেলে।

গাছের পাতা জালের মত ঝাঁজরা হইলে অথবা সবুজাংশ-শূন্য হইলে গাছ এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গাছের পাতায় একত্রে অনেক ডিম বা কীড়া থাকে। ডিমযুক্ত বা কীড়াসমেত পাতাগুলি সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে পারা যায়। বড় হইলে ইহারা আর একত্র থাকে না, ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়ে। উহারা যাহাতে অন্য ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইতে না পারে এইজন্য ক্ষেতের চারিদিকে এক ফুট দেড় ফুট চওড়া নালা কাটিয়া জলপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। কেরোসিন মিশ্রিত জলে পড়িবামাত্রই উহারা মরিয়া যায়।

লেদা পোকাও বিছাপোকার ন্যায় দল বাঁধিয়া একত্র থাকিয়া গাছের পাতা খাইয়া ঝাঁজরা করিয়া ফেলে। স্ত্রী-প্রজাপতি পাতার নীচে একত্রে পাঁচ শত পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। পড়ে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয়। এই কীড়াগুলি পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত হইলেই মাটির নীচে গিয়া পুত্তলির আকার ধারণ করে। ডিম পাড়িবার এক মাসের মধ্যেই উহা প্রজাপতির আকার ধারণ করে। শালিক, ফিঙ্গে, ছাতরা প্রভৃতি জাতীয় পাখী এই সমস্ত পোকা দেখিলেই খাইয়া ফেলে; সুতরাং ইহাদের তাড়ান উচিত নয়। জমির মধ্যে মধ্যে পাখীদের বিশ্রামের জন্য গাছের ডাল পুঁতিয়া রাখিলে ভাল হয়। ডিম বা পোকাসমেত পাতা দৃষ্ট হইলে উহা সংগ্রহপূর্ব্বক নষ্ট করাই সঙ্গত।

সবুজবর্ণের একপ্রকার পোকা চারা পাটগাছের পাতা খাইয়া ডাঁটাসার করিয়া ফেলে। এই পোকার কীড়াগুলি

সকাল ও সন্ধ্যায় পাতা খায় এবং দিবাভাগে মাটি অথবা গাছের পাতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই এই পোকা মরিয়া যায়। ইহাকে পাটের সবুজ পোকা বলা হয়। জমির মধ্যে মধ্যে রাত্রে আগুন জ্বালিয়া রাখিলে পোকাগুলি ইহার সংস্পর্শে আসিয়া মারা পড়ে।

একপ্রকার ছোট সাদা পোকা পাটের ডগার মধ্যে ছিদ্র করিয়া উহার কোমলাংশ খাইয়া ফেলে। পাটগাছের ডগা শুকাইতে দেখিলেই মাজরা পোকা কর্ত্তৃক গাছ আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত হইলেই পোকাগুলি পাটের ডগার মধ্যে পুত্তলির আকার ধারণ করে।

লাল মাকড় নামক পোকা পাতার নীচে থাকিয়া রস চুষিয়া খায়। পাতা বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়া কোঁকড়াইয়া যাইলেই লাল মাকড়ের উপদ্রব হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোঁকড়ান পাতার নীচের দিকে লক্ষ্য করিলেই এই পোকা পরিলক্ষিত হইবে। অল্প জায়গা হইলে ঔষধ ছিটাইয়া এই পোকার উপদ্রব নিবারণ করা যাইতে পারে। এক ছটাক গন্ধক ও পাঁচ ছটাক ক্রুড অয়েল ইমালসান একত্র করিয়া কুড়ি সের জলের সহিত মিশাইয়া ঔষধ সিঞ্চন যন্ত্র দ্বারা (Spraying machine) দ্বারা গাছে ছিটাইলে পোকা মরিয়া যায়। উইচিংড়া চারা পাটগাছের গোড়া কাটিয়া দেয় এবং কচি চারা গাছের ডগা খাইয়া থাকে। ইহারা মাটির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। জলের সহিত একটু কেরোসিন তৈল মিশাইয়া উইচিংড়ার গর্ত্তে ঢালিলে

পোকা বাহির হইয়া পড়ে। বৃষ্টির সময় ক্ষেত্রে আইল বাঁধিয়া কিছুক্ষণ জল আটকাইয়া রাখিতে পারিলে পোকাগুলি গর্ত্ত ছাড়িয়া উপরে উঠে, তখন উহাদের মারিয়া ফেলা সহজ। পাখীরা উইচিংড়া দেখিলেই খাইয়া ফেলে। কাঁচপোকাও উইচিংড়ার শত্রু।

শণ

শণ হইতে পাটের ন্যায় একপ্রকার আঁশ পাওয়া যায় এবং তাহাকেই শণসূত্র বলা হয়। পাট অপেক্ষা শণ দৃঢ়, মসৃণ, উজ্জ্বল এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহা হইতে দড়ি, কাছি, টোন সূতা, জাল, ক্যাম্বিশ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে পাট অপেক্ষা শোণের চাষ অধিক পরিমাণে হইত কিন্তু বর্ত্তমানে পাটচাষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। আজকাল বঙ্গদেশে খুব কম পরিমাণেই শণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সকল মৃত্তিকায় শণ জন্মিতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে শণসূত্র পাটের ন্যায় কোমল, চিক্কণ ও শুভ্র হইতে পারে।

এঁটেল জমিতে চাষ করিতে হইলে কিছু সার প্রয়োগের আবশ্যক হয়। অল্প বালিযুক্ত এঁটেল অথবা দোআঁশ জমিতে

ইহা ভালরূপে জন্মে। নিম্ন জমি অপেক্ষা উচ্চ জমিতে ইহার চাষ ভালরূপ হইতে পারে।

শণচাষে আর একটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়। উহার এমন শক্তি আছে যে, যে-কোন নিকৃষ্ট জমি হউক না কেন, যদি সেখানে একবার শণচাষ হয় তাহা হইলে সেই জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে। সেই কারণে অনুর্ব্বরা জমিতে প্রথমে শণচাষ করিয়া পরে উহার উর্ব্বরতাশক্তি বাড়াইয়া অন্য চাষ দেওয়া আবশ্যক।

চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিক বৎসরের এই দুই সময়ে শণ বীজ বপন করা চলে। চৈত্র বৈশাখ মাসে জমি উত্তমরূপে কর্ষণপূর্ব্বক মাটি চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। পরে অল্প বৃষ্টি হইলেই জমিতে আর একবার লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন করিতে পারা যায়। মাটি সরস থাকিলে ৫।৬ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে এবং সামান্য চাষেই শণ জন্মে। বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে।

গাছগুলি বড় হইয়া উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে গাছগুলি সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক আঁটি বাঁধিয়া জমিতে ৪।৫ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। এইস্থলে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুষ্পিতাবস্থায় কাটিলে উহা হইতে সুন্দর ও চিক্কণ আঁইশ পাওয়া যায় বটে কিন্তু আঁশ তত দৃঢ় হয় না। আবার গাছে ফল ধরিবার পর হইতে ফল পাকিবার সময়ে উহাদিগকে তুলিলে শণের আঁইশ দৃঢ় হইতে থাকে কিন্তু চিক্কণতা বিলুপ্ত হয়। মোট কথা, ফুল

ধরিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে জমি হইতে উৎপাটন করা উচিত নয়। ৪।৫ দিন জমিতে ফেলিয়া রাখিবার পর ছোট ছোট বাণ্ডিল বাঁধিয়া পাটের স্থায় উহা জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। ৭।৮ দিনের মধ্যে নিমজ্জিত শণগাছের ছাল পচিলে পাটের স্থায় কাটিয়া আঁশ বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত। বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ শুষ্ক শণসূত্র পাওয়া যায়।

অনেক স্থানে শণবীজ দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়; ইহাতে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। শণবীজ পচাইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। শণ, ধঞ্চে প্রভৃতি শুঁটি বা সিম্বী জাতীয় গাছ জন্মাইলে জমি উর্ব্বর হয়। শণ বমনকারক, মলভেদক, কফ ও বায়ুনাশক এবং রক্তস্রাবকারক ও গর্ভপাতক। ইহার ফুল মলরোধক ও রক্তপিত্তে উপকারক। বীজ রক্তশোধক।

ধঞ্চে

ইহা পাট ও শণ জাতীয় উদ্ভিদ্। পূর্ব্বে এদেশে পাটের চাষ ঈদৃশ প্রবল ছিল না। ইহার পরিবর্ত্তে শণ ও ধঞ্চের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। যাঁহারা শণ ও ধঞ্চে হইতে সূত্র বহিষ্করণের উপায় জানিতেন তাঁহারা পাট হইতেও সূত্র বাহির করিবার প্রণালী অবগত ছিলেন একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না; অথচ তখনকার দিনে এদেশে পাটের চাষ যে একে-

বারে ছিল না তাহাও নয়, তবে চাষ কম হইত এইমাত্র প্রভেদ। আজকাল এ-দেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এতদ্দ্বারা বোধ হয় পাটচাষের অপকারিতার বিষয় তাঁহারা অবগত ছিলেন এবং সেই কারণেই পাট অপেক্ষা শণ ও ধঞ্চের চাষ এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রকার ভূমি অপেক্ষা দোআঁশ জমিতে ধঞ্চে উত্তম জন্মে। অন্য জমিতেও ধঞ্চে জন্মাইতে পারা যায়। নিম্ন বা জলা-ভূমিতে ধঞ্চে ভাল হয়। সবুজ ও রক্তবর্ণ ডাঁটা ভেদে দুই প্রকারের ধঞ্চে এদেশে জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে সবুজ জাতি এঁটেল মৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। নিম্ন দোআঁশ জমির পক্ষে লাল ধঞ্চে উপযোগী। লাল জাতীয় গাছ বেশী বড় হয়।

চৈত্র বৈশাখ মাসে জমি উত্তমরূপে কর্ষণপূর্ব্বক মাটি চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়, পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলেই জমিতে আর একবার লাঙ্গল দিয়া ধঞ্চে বপন করা আবশ্যক। ইহা পাটের ন্যায় ঘনভাবেও ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে।

গাছগুলি বড় হইয়া পুষ্পিত হইতে থাকিলে উহা কাটিয়া ৩।৪ দিন জমিতে ফেলিয়া রাখিবার পর পাট বা শণের ন্যায় জাঁক দিয়া জলে পচাইয়া কাচিয়া ধঞ্চেগাছ হইতে সূত্র বাহির করিয়া লওয়া হয়। ধঞ্চেগাছে ফুল হইতে ফল ধরিবার পরেও গাছ কাটিয়া পচাইয়া তাহা হইতে সূত্র বাহির করা যাইতে

পারে ; ইহাতে সূতা শক্ত হইয়া থাকে। শণ অপেক্ষা ধঞ্চেসূতা অধিক দৃঢ় এবং জলসহনশীল। বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ ধঞ্চেসূতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ধঞ্চেগাছ ৮।১০ হাত অথবা ততোধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে।

ধঞ্চের সূতা হইতে কাছি, দড়ি, জাল, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধঞ্চের বীজ হইতে পাটবীজের ন্যায় একরূপ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা প্রদীপ জ্বালাইবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধঞ্চেবীজ হইতে তৈলাংশ বাহির করিয়া লইলে যে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উক্ত খইল ও কচি কচি ধঞ্চেগাছ দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাওয়াইলে অধিক দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। ইহার খইল সার হিসাবে জমিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। পানের বরোজ ধঞ্চেগাছ দ্বারা নির্ম্মাণ করিলে উহা বেশ স্থায়ী হয়। লাক্ষাকীট পালনের পক্ষে ধঞ্চে গাছ বেশ উপযোগী। ধঞ্চেগাছে লাক্ষাপোকা বেশ জন্মিতে পারে। ধঞ্চের চাষে কোন সারের প্রয়োজন হয় না, অধিকন্তু ইহার গোড়ায় সারবান পদার্থ সঞ্চিত হইয়া অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করিয়া তোলে। ইহারা বায়ু হইতে সোরাজান সংগ্রহ করিয়া জমির নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে পারে। ধঞ্চের চাষ দিয়া সেই জমিতে অন্য ফসলের চাষ দেওয়া যাইতে পারে, সেই ফসলের জমিতে অন্য সার দিবার আবশ্যক করে না। সারের উদ্দেশ্যে বিঘাপ্রতি ৭।৮ সের বীজ বপন করা যায়। সবুজ সারের জন্য চাষ করিতে হইলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে

এক পশলা বৃষ্টির পরই উহা বপন করা কর্ত্তব্য। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতেও ধঞ্চেগাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। গাছগুলি ২।৪ হাত বড় হইয়া উঠিলেই লাঙ্গল দিয়া চারা গাছ মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে উহা পচিয়া সারের কাজ করে।

মেস্তা

ইহার তন্তু পাট অপেক্ষা দৃঢ়, মসৃণ এবং সূক্ষ্ম হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা দড়ি, সূতা, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাট অপেক্ষা মেস্তা সূতার দাম অধিক। মেস্তা ফল অম্লস্বাদযুক্ত। উহা হইতে মোরব্বা, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার চাষ-আবাদ পাটের ন্যায় করিতে হয় কিন্তু পাটের ন্যায় নিম্ন অথবা বিল জমি অপেক্ষা উচ্চ প্রস্তরময় অথবা উর্ব্বর জমিতে ইহা ভালরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জমিতে বিশেষ সারের প্রয়োজন হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে চাষ দিয়া রাখিবার পর অল্প বৃষ্টি হইলেই ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে। ঘন বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই যাহাতে গাছগুলি অন্ততঃ ১০।১২ ইঞ্চি আন্দাজ দীর্ঘ হইয়া উঠিতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

মেস্তাগাছে ফুল ধরিলে উহাদিগকে উৎপাটন করিতে হয়। গাছে ফল ধরিবার পর জমি হইতে উঠাইলে উহার আঁশ মোটা ও কর্কশ হইয়া যায়। পাটের ন্যায় ইহাও আঁটি বাঁধিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয় এবং ১০।১২ দিন পরে পচিলে পাটের ন্যায় কাচিয়া তন্তু বাহির করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ৬।৭ মণ শুষ্ক সূতা পাওয়া যায়। লোণাজলে ইহার সূতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য মিটান জলে মেস্তা পাট কাচা উচিত। এলেটিসিমা নামক নূতন মেস্তা পাটের ফলন অত্যন্ত অধিক। বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ সূত্র হয়। উঁচু জমিতে ইহা ভাল জন্মায়।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় মেস্তার ন্যায় একপ্রকার গাছ জন্মিয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্থানে উহা আমলাপাট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। এই জাতীয় গাছ হইতে উৎকৃষ্ট এবং দৃঢ় সূত্র জন্মিয়া থাকে। ৪।৫ মাসের মধ্যে গাছগুলি সূত্রোপযোগী হইয়া থাকে। পাট, শণ প্রভৃতির ন্যায় এই গাছগুলি পচাইয়া কাচিয়া শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। এই জাতীয় গাছের সূত্র বা আঁইশ হইতে টোন, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢেঁড়শ

সব্জীরূপে ফল ভক্ষণের নিমিত্তই সাধারণতঃ ঢেঁড়শের চাষ হইয়া থাকে। সূত্রের নিমিত্ত ইহার চাষ খুবই অল্প হইয়া থাকে। সূত্রের জন্য ইহার চাষ করিতে হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ পাটের ন্যায় ঘনভাবে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। সব্জীর জন্য ইহার বীজ দুই হাত অন্তর লাইন দিয়া ১৷৷০ হাত ব্যবধানে বপন করিতে পারা যায়।

সূক্ষ্ম এবং চিক্কণ সূত্র পাইতে হইলে গাছে ফল ধরিতে না দিয়া ফুল ধরিবার পরই ইহার গাছ কাটিয়া জমিতে ৩।৪ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। পরে ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া জলে ৮।১০ দিন ডুবাইয়া রাখিবার পর গাছের গায়ের উপরিস্থ ছালগুলি পচিলে পাটের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়।

এই ঢেঁড়শের পাট বা সূতা পাটের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়। ঢেঁড়শের পাট হইতে দড়ি, কাগজ, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢেঁড়শগাছের ফল পরিপক্ক হইলে সেই গাছ পচাইয়া তাহা হইতেও সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। তবে ইহা হইতে যে সূতা বাহির হয় তাহা অপেক্ষাকৃত মলিন, মোটা এবং কর্কশ হইয়া থাকে। তাহা হইলেও দড়ি, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

অন্য একজাতীয় বন্য ঢেঁড়শ সাধারণতঃ বাঙ্গলা দেশে ও অন্যান্য স্থানে জন্মিতে দেখা যায়। উহার ফল ঢেঁড়শের ফল অপেক্ষা আকারে খুব ছোট এবং ইহার ডাঁটা ও পাতা অত্যন্ত রোমবহুল। ইহার পাট বা সূতা হইতে কাগজ, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যদি আমরা শিল্পোন্নতির জন্য এই ঢেঁড়শের চাষ করি তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অমূলক হইবে। কারণ ইহার পাট যদিও মসৃণ ও দেখিতে সিল্কের মত তথাপি ইহার উৎপন্নে লাভ করা যায় না। তাহার কারণ এই যে আজকাল এত উৎকৃষ্ট পাট তৈয়ার হইতেছে এবং উহা এরূপ কমমূল্যে বিক্রিত হইতেছে যে, ঢেঁড়শের পাট উহার সহিত তুলনা করিলে প্রকারে কতকটা মিলিলেও ঐরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, অর্থাৎ উহার চাষে পাটের ন্যায় লাভ করা যাইবে না।

পাটের চাষ করিতে যে পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় হয়, ঢেঁড়শের ঐরূপ পাট প্রস্তুত করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থব্যয় ও পরিশ্রম লাগে অথচ বাজারে পাটের প্রতিযোগীতায় উহা দাঁড়াইতে পারে না। যে দরে পাট বিক্রয় হইবে, ঢেঁড়শের পাট তাহা অপেক্ষা ৮।১০ গুণ অধিক মূল্যে নির্দ্ধারিত হয়; সুতরাং উহা ক্রয় করিবার খরিদ্দার কোথায়? আর একদিকে পাট যে উহা অপেক্ষা

কোন অংশে খারাপ তাহাও নহে; সুতরাং লোকে কেন বৃথা অধিক অর্থব্যয় করিয়া উহা ক্রয় করিবে।

অতএব ঢেঁড়শ-সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। উহার শিল্পে উন্নতি হইবার আশা খুব কম। তবে পরীক্ষা করিবার জন্য বা নিজে সখ করিয়া রাখিবার জন্য ঢেঁড়শের পাট কেহ কেহ উৎপাদিত করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে যখনই উহার পাটের ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন কথা উঠিবে তখনই আমি তাহাতে বাধা-প্রদান করিব। একটা কথা আছে যে "কুলি করে পুকুরের জল শেষ করা" সে উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না।

যাহা হউক ঢেঁড়শের পাটের ব্যবসার দ্বারা উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঐ বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া সেটা পাটচাষের দিকে দিলেই সকল চাষীর উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঢেঁড়শের গুণ—ইহা মূত্রকারক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং প্রমেহরোগে বিশেষ উপকারী।

লতাকস্তুরী

ইহা পাট জাতীয় গাছ। এই গাছ সাধারণতঃ ৬।৭ হাত দীর্ঘ হয় এবং যত্ন করিলে ও মাঝে মাঝে ডাল ছাঁটিয়া দিলে অনেক দিন স্থায়ী হয়। ইহার বীজ দেখিতে ঢেঁড়শের ন্যায় কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। ইহার বীজে কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হওয়ায় সাবান, পমেটম, কোন কোন ঔষধ, তৈল ও তামাকের মশলা প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃগনাভির মূল্য অধিক এবং সচরাচর উহা পাওয়া যায় না, এইজন্য অনেকস্থলে লতাকস্তুরীর বীজ ভেজালরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লতাকস্তুরী গাছ বা ডাল পচাইয়া তাহা হইতেও সূত্র বহির্গত হইতে পারে। পাট অপেক্ষা ইহার সূতা শুভ্র, কোমল, দৃঢ় এবং চিক্কণ, সেইজন্য ইহার সূতার মূল্যও অধিক।

ইহার বীজ পাট, শণ বা ঢেঁড়শের ন্যায় জমিতে ছিটাইয়া বপন করা যাইতে পারে। গাছগুলি অধিক দিন স্থায়ীভাবে জমিতে রাখিতে হইলে ২।।০-৩ হাত অন্তর বীজ বপন করা আবশ্যক। গাছগুলি বড় হইলে প্রতিবৎসর ছাঁটিয়া দিতে হয়। বৎসরে ২।৩ বার ইহার ডাল কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং কর্ত্তিত ডালগুলি জলে পচাইয়া কাচিয়া লইলে সুন্দর সূতা বহির্গত হইয়া থাকে। পুরাতন শাখা হইতে যে আঁইশ বা সূতা বাহির হয় তাহা সাধারণতঃ মোটা, কর্কশ এবং মলিন হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে ইহার চাষ অতি অল্প হইয়া থাকে এবং খুব কম স্থানেই ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার সূতা ঢেঁড়শ বা পাটের ন্যায় নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। গুড়ের গাঁজানি বা গাদ কাটাইতে অনেকস্থানে এই ফলের রস ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—শীতল, লঘুপাক, শ্লেষ্মানাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং চক্ষুরোগ, মুখরোগ ও বস্তিরোগে উপকারক।

ওলটকম্বল

ইহার পাতা স্থলপদ্মের অনুরূপ কিন্তু বড় ও গাঢ় সবুজ-বর্ণের হয়। ইহার ফুল ছোট ও রক্তবর্ণ। বঙ্গদেশে সূত্রের জন্য সাধারণতঃ ইহার চাষ দৃষ্ট হয় না, স্থানে স্থানে ২।১টি গাছ জন্মিতে দেখা যায়। ওলটকম্বলের গাছ ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং উহা হইতে দীর্ঘ এবং দৃঢ় সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

লতাকস্তুরীর মত ইহার বীজ জমিতে ফাঁক ফাঁক করিয়া ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। ৪।৫ মাসের মধ্যেই গাছগুলি ৫।৬ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। লতাকস্তুরীর মত প্রতি বৎসর ২।৩ বার ইহার ডাল কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ডালগুলি জলে পচাইয়া ঢেঁড়শ, পাট বা শণের ন্যায় কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। গাছগুলি অধিক পুরাতন

হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহার সূতা অত্যন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং সহজে জলে পচে না। ইহার সূতা হইতে দড়ি, কাছি, বোরা, কাগজ ও নানাবিধ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ষাকালে ইহার গাছে ফুল ধরে এবং শীতকালে বীজ পাকিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—জরায়ুদোষ, প্রদর, যোনিরোগ, রজোদোষ ও অর্শরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।



অর্ক বা আকন্দ

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা মান্দার নামে অভিহিত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Calotropis Gigantea; বাংলায় ইহা অর্ক বা আকন্দ নামে অভিহিত। ইহার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। শ্বেত ও বেগুনে রঙের পুষ্প ভেদে আকন্দগাছ দুইপ্রকার দেখা যায়। আকন্দ গাছ হইতে শুভ্র, কোমল ও চিক্কণ তূলা জন্মিয়া থাকে। ইহার তূলা, আঠা এবং ডাঁটার আঁইশ নানাবিধ ব্যবহারিক শিল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা অতি আয়কর ও লাভজনক বৃক্ষ। পতিত জমি ফেলিয়া না রাখিয়া তাহাতে আকন্দের চাষ করিলে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়।

আকন্দের তূলা, আকন্দের পাতা, আকন্দের আঠা, আকন্দের ডালের আঁশ বা সূতা, আকন্দের ফুল, আকন্দের

মূল প্রভৃতি ইহার প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। আকন্দের তূলা রেশমের ন্যায় চিক্কণ ও কোমল। ইহা স্নিগ্ধকর, কফ ও বাতনাশক। কফ ও বাতরোগগ্রস্থ লোক ইহার তূলা দ্বারা বালিশ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে আকন্দ তূলা দ্বারা লিণ্ট্ কাপড় ও বাত-রোগীর জন্য একপ্রকার ব্যাণ্ডেজ কাপড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বোর্ণীও দ্বীপে ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এই তূলা হইতে সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহার সূতা হইতে পাতলা ফ্ল্যানেলের ন্যায় একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। পঞ্জাব্ অঞ্চলে আকন্দ তূলা হইতে গালিচা প্রস্তুত হয়। আকন্দের তূলার উৎকর্ষ সাধন করিলে ইহা ভবিষ্যতে রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে।

আকন্দের ডাল কাটিয়া মুগুর দিয়া থেঁতো করিয়া গোবর-জলে পচাইয়া পাটের মত কাচিয়া লইলে ইহা হইতে এক প্রকার আঁশ বা সূত্র পাওয়া যায়। কাচিয়া লইবার পর ইহা রৌদ্রে না শুকাইয়া ছায়ায় ঝুলাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। আঁশ রৌদ্রে শুকাইলে সেরূপ দৃঢ় ও ভারসহ হয় না। শুষ্ক করিবার সময় গন্ধকের ধূম দিলে পাট বেশ চিক্কণ ও উজ্জ্বল হয়। আকন্দের আঁশজাত সূত্র হইতে দড়ি প্রস্তুত করিলে তাহা অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত হয়। এমন কি এক ইঞ্চি পরিমাণ আকন্দের সূতা ৬০/০ মণ ভার অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারে। এইজন্য কার্পাসের আঁশজাত সূত্র পূর্ব্বে ধনুকের ছিলায় ব্যবহৃত হইত।

কুষ্ঠব্যাধি, মৃগি ও উদরীরোগে এবং খোস-পাঁচড়ায় আকন্দের আটা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আকন্দের আঠা হইতে গাটাপার্চ্চা প্রস্তুত হয় এবং উহাদ্বারা বোতাম, চিরুণী, ফাউন্‌টেন পেনের খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নূতন চামড়ার লোম উঠাইয়া উহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে এবং কাঁচা চামড়া পাকা করিতে আকন্দের আঠা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকন্দের কয়লা অত্যন্ত হালকা। ইহা বারুদ প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আকন্দ কাঠের ভস্মে রঙ্গের অন্তর হয়। দাঁতের গোড়া বা কোন স্থান ফুলিয়া কন্‌কনে যন্ত্রণা হইলে বা বাত-বেদনার স্থানে আকন্দের পাতা আগুনের উত্তাপে গরম করিয়া সেঁক দিলে বিশেষ উপকার হয়।

আকন্দের ফুল—মধুর-তিক্ত-রস, মলরোধক এবং কফ, কুষ্ঠ, কৃমি, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও পিত্তদোষে উপকারক। আকন্দের আঠা—লঘু ও উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিরেচক এবং ক্রিমি, ব্রণ, অর্শ, উদররোগ, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

শ্বেত আকন্দের মূল মরিচের সহিত বাটিয়া সর্পদংষ্ট্র রোগীকে খাওয়াইলে আরোগ্য হয়। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। আকন্দের পাতার রস ৫।৬ ফোঁটা মধুর সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে উপকার দর্শে। শ্বেত আকন্দের মূল মদনানন্দ মোদকের উপাদান।

ইহা অতি কঠিনজীবী গাছ। বেলে, আঠাল, দোআঁশ জমিতে এবং কঙ্কর ও প্রস্তরপূর্ণ স্থানে যে-কোন জমিতে আকন্দ গাছ জন্মিয়া থাকে। আকন্দের বীজ হইতে অথবা শিকড় বা ডাল পুঁতিয়াও গাছ জন্মাইতে পারা যায়। বীজ হইতেই চারা জন্মান সহজ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চারি হাত অন্তর এক-একটি আকন্দের চারা রোপণ করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ৭।৮ শত গাছ জন্মিয়া থাকে। একবার চাষ করিলে ৮।১০ বৎসর আর চাষ করিতে হয় না। ডাল কাটিয়া লইলে উহা হইতে আবার নূতন শাখা বাহির হয়। গাছ হইতে তূলা লইতে হইলে বৎসরে একবার মাত্র ডাল কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রতি গাছ হইতে বৎসরে /০ পোয়া হিসাবে তূলা পাওয়া যায়।

রিয়া

বঙ্গদেশে সাধরণতঃ ইহার চাষ হইতে দেখা যায় না। চীন, জাপান, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে রেশমের ন্যায় কোমল, উজ্জ্বল ও দৃঢ় সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। আসামে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে রিয়া গাছ জন্মিতে দেখা যায় কিন্তু ইহা হইতে সূত্র-প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহারের বিধি না জানায় অনেক স্থানে ইহা বৃথা নষ্ট হইতেছে। কার্পাস সূত্র অপেক্ষা রিয়ার

মূল্য অধিক। ইহা শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতার জন্য কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া বস্ত্রশিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। রেশমের সহিত ইহার সূত্র মিশ্রিত করিলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার হয়। রিয়ার অনেক প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে আঁশ বা সূত্র প্রস্তুত উপযোগী দুই জাতীয় রিয়াই উৎকৃষ্ট। ইহাদের নাম বোমেরিয়া নিভিয়া (Boehmeria Nivea) ও বোমেরিয়া টেনাসিসিমা (Boehmeria Tenasissima)। বোমেরিয়া নিভিয়ার পাতার নীচে উল-সদৃশ শ্বেতবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে ভাল জন্মে কিন্তু বোমেরিয়া টেনাসিসিমা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিয়া থাকে।

রিয়া গাছ সকল প্রকার মাটিতে ভাল জন্মে না। দোআঁশ মাটিতে ইহা উত্তম জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতা দেখিতে বিছুটী পাতারই মত, তবে উহা অপেক্ষা কিছু বড়। ইহার গাছ একবার জন্মাইলে ৮।১০ বৎসরকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। বাগানের আশে-পাশে কিংবা বাগানের চতুঃপার্শ্বে ইহা লাগাইয়া বেড়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহাতে বেড়া দেওয়া এবং সূত্রপ্রাপ্তি উভয় কার্য্যই চলিতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য জন্মাইতে হইলে ইহার চাষের সুবন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

বীজ, মূল, কলম প্রভৃতি নানা উপায়ে ইহার গাছ জন্মাইতে পারা যায়। এদেশে বীজ হইতে ভাল চারা জন্মে না। সেইজন্য মূল বা কলম হইতে ইহার গাছ জন্মাইতে হয়।

ইহার জমি অত্যন্ত সরস থাকা আবশ্যক। শুষ্ক জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা দরকার। জল-বসা জমিতে ইহার গাছ জন্মে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি কর্ষণপূর্ব্বক মাটি গুঁড়া করিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ সময় জমিতে কিছু সার প্রয়োগ করা আবশ্যক, কারণ ইহার চাষ করিলে প্রতিবৎসর জমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাস, সোডা ও ফস্ফরাসের ভাগ চলিয়া গিয়া মাটি নিঃসার হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে আর ভাল ফসল পাওয়া যায় না।

অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পশলা বৃষ্টি হইবার পরই ইহার মূল সংগ্রহপূর্ব্বক জমিতে ৩ হাত অন্তর ৭।৮ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া বসাইতে হইবে। রোপণের পর এক মাসের মধ্যেই কলম লাগিয়া যাইবে। গাছগুলি বাড়িয়া উঠিলে উভয়পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা টানিয়া গাছের গোড়ায় জমা করিয়া দিতে হইবে। একবার জন্মাইতে পারিলে এই গাছ ১০।১২ বৎসরকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ইহার পর প্রতি বৎসর একবার করিয়া জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

প্রতি বৎসরই ইহার শাখা কাটিয়া লওয়া হয়। গাছ কাটিয়া লওয়ার পর পুনরায় বহুসংখ্যক শাখা বহির্গত হয় এবং শীঘ্রই উহারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথম বৎসর জমি হইতে দুইবার শাখা কাটিয়া লওয়া যায়। উর্ব্বর জমি হইলে বৎসরে ৩।৪ বার ইহার শাখা কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। শাখাগুলি ৪।৫ হাত দীর্ঘ এবং গাছের মূলভাগ ঈষৎ বাদামী রং ধারণ

করিলেই উহাদিগকে কাটিয়া উহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া লইতে হইবে।

আমেরিকা, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ইহার সূত্র নিষ্কাসিত করা হইয়া থাকে। পাট, শণ, ঢেঁড়শ প্রভৃতির ন্যায় জলে পচাইয়া কাচিয়াও ইহার সূত্রভাগ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে সূত্রের রং নষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সাধারণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা হইতে সূত্র বহিষ্করণের উপায় অবগত না থাকায় জলে পচাইয়া কাচিয়া সূত্রভাগ বাহির করিয়া লওয়া ভিন্ন তাঁহাদের অন্য উপায় নাই। ৭।৮ মণ জলে /১ সের আন্দাজ সোডা মিশাইয়া তাহাতে রিয়ার কর্ত্তিত ডাঁটা অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহার সূত্রাংশ পৃথক্ হইয়া পড়ে।

বিছুটী

ইহার পাতা ও ডাঁটা প্রভৃতিতে একপ্রকার শুঁয়া থাকে, তাহার স্পর্শে শরীর চুলকায় এবং সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। এই উদ্ভিদ্ বর্ষজীবী ; ফুল, ফল ধরিবার পরই শীতকালে গাছ মরিয়া যায়। এই জাতীয় গাছ হইতেও সুন্দর সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহা বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাগপুর, মান্দ্রাজ, আসাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালয়দ্বীপ,

নেপাল প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশেও ইহা প্রচুর জন্মে। ইহা হইতে দড়ি-দড়া, কারপেট, জালের সূতা এবং কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

অ্যালো বা মুর্গা

ইহার জন্মস্থান আমেরিকা। মান্দ্রাজ, বিহার প্রভৃতি স্থানেও এই জাতীয় গাছ জন্মিতে দেখা যায়। আনারস গাছের সহিত এই জাতীয় গাছের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার সুদীর্ঘ পত্র কণ্টকাকীর্ণ। এইজন্য বাগানের চতুঃপার্শ্বে ২।৩ হাত অন্তর বসাইয়া দিলে অতি শীঘ্র দুর্ভেদ্য বেড়া প্রস্তুত হইতে পারে। অনেকস্থানে জেলখানার চতুঃপার্শ্বে এই গাছ রোপিত হইতে দেখা যায়। এদেশে ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইহা জীবিত থাকে। অধিক পুরাতন গাছগুলির মধ্য হইতে বংশদণ্ডের ন্যায় একটি শীষ বহির্গত হয়। উক্ত বংশদণ্ডে কোন পাতা জন্মে না, উহা গাছের পুষ্পদণ্ড। উক্ত পুষ্পদণ্ড ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। পুষ্পদণ্ড জন্মিবার ২।১ বৎসর পরেই গাছ মরিয়া যায়। ঐ গাছের মূলদেশের চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য ছোট ছোট চারা জন্মিয়া থাকে। চাষ করিতে হইলে ঐ চারাগুলি তুলিয়া জমিতে বপন করা আবশ্যক।

ইহার সুবৃহৎ পত্র হইতে সুন্দর ও দৃঢ় সূতা উৎপন্ন হয় এবং

উহার দ্বারা মজবুত দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার দড়ি, পাট, শণ ও নারিকেলের কাছি অপেক্ষা দৃঢ় এবং জলসহনশীল।

বঙ্গদেশে এই গাছ অতি সুন্দররূপে জন্মে। বীরভূম, সাঁওতাল-পরগণা, বিহার, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে এই গাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহা হইতে যে অতি সুন্দর মজবুত সুতা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অনেকের অবিদিত।

তিন বৎসরের কমবয়স্ক গাছের পাতা সুতা প্রস্তুতের উপযোগী হয় না। তিন-চারি বৎসর বয়স হইলেই গাছের নিম্নভাগের পত্র পার্শ্বভাগে শায়িত হইয়া পড়ে। ঐ সমস্ত পত্রগুলিই পরিপুষ্ট এবং উপযোগী হইয়াছে জানিয়া উহাদের গোড়া হইতে কাটিয়া যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করা আবশ্যক। পত্রগুলি কাটিবার পর বাণ্ডিল বাঁধিয়া জলে পচাইতে দিতে হয়, পরে কোন ভোঁতা অস্ত্রের সাহায্যে উহার উপরের সবুজ অংশ চাঁচিয়া ফেলিলে সুতা বাহির হইয়া পড়ে। পত্রমধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ রস কোন যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়, নতুবা পত্রোৎপন্ন সূত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অন্য উপায়েও এই জাতীয় গাছের পাতা হইতে সূত্র বাহির করিতে পারা যায়। গাছের নিম্নস্থিত পত্রগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া আনিয়া মুগুর দ্বারা পিটিতে হয়। পরে সেগুলি বাঁধিয়া জলে পচাইতে দিতে হয়। ১০।১২ দিনের মধ্যেই উপরের ছালগুলি পচিয়া গেলে উহাদিগকে তুলিয়া পাট, ঢেঁড়শ প্রভৃতির ন্যায় জলে কাচিয়া

শুকাইয়া লইতে হয়। জলা বা ডোবা জমি ব্যতীত অন্য সমস্ত জমিতেই ইহা জন্মিতে পারে। কাঁকরময় শুষ্ক জমিতেও ইহা উত্তম জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ করিতে হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি কর্ষণ পূর্ব্বক মাটি গুঁড়া করিয়া রাখিতে হয়। পরে সামান্য বৃষ্টি হইলেই গাছের গোড়ার চতুঃপার্শ্বস্থ চারা তুলিয়া আনিয়া জমিতে ৩।৪ হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। এইরূপভাবে রোপণ করিতে বিঘাপ্রতি ৩।৪ শত চারার আবশ্যক হয়।

আনারস

আনারসের পাতা হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় সূতা বাহির হইয়া থাকে। ইহার পত্রোৎপন্ন সূতা সহজে জলে পচে না।

আমাদের দেশে আনারসের ফল কেবল আহার্য্যরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা হইতেও যে মজবুত সূতা বহির্গত হইতে পারে সে বিষয় অনেকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে আনারস গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ঝোপ, জঙ্গল, আওতা প্রভৃতি স্থানে এবং দোআঁশ, বেলে, আঠাল, লোণা প্রভৃতি সমস্ত মাটিতেই জন্মিয়া থাকে। আনারস গাছের মূলদেশ হইতে অনেকগুলি ফেঁকড়ি বাহির হইয়া থাকে, উক্ত চারাগুলি জমিতে লাগাইয়া চাষ করিতে পারা যায়। আনারস

ফলের উর্দ্ধভাগে যে সকল চোক্ বাহির হয় উহাও চারার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া কিছু গোবর-সার প্রয়োগ করিতে হইবে। পরে বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পশলা বৃষ্টি হইলেই জমিতে ২ হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ১॥০-২ হাত ব্যবধানে এক-একটি চারা রোপণ করিতে হইবে। * আনারসের ক্ষেতে কোন আগাছা বা জঙ্গল জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। মাটি শুষ্ক হইলে গাছের গোড়ায় জল-সেচন করা আবশ্যক।

এদেশে যে সমস্ত আনারস গাছ জন্মিয়া থাকে তাহাদের কোন যত্ন লওয়া হয় না; উহারা অযত্নেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সমস্ত স্থানজাত আনারস অম্লস্বাদযুক্ত। যত্নপূর্ব্বক সারপ্রয়োগ দ্বারা ইহার চাষ করিতে পারিলে আনারসের আকার ও আস্বাদ পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার উৎকর্ষতা লাভ হইতে পারে।

ফল পরিপক্ক হইলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ মূলের উপরিভাগ হইতে গাছগুলি ফলসমেত কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। পরে ঐ সমস্ত গাছের গোড়ার পত্রগুলি জলে পচাইয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইলেই অতি সুন্দর সুতা প্রস্তুত হইবে।

---

* ইহার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে লেখকের 'আদর্শ ফলকর' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

আনারসের সূতা সূক্ষ্ম, কোমল, শুভ্র এবং চিক্কণ। এইজন্য ইহার সূতা বস্ত্রশিল্পেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপান এবং জার্ম্মাণিতে আনারসের পত্র হইতে সুন্দর পার্চমেণ্টের ন্যায় কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আনারসের সূতা হইতে টোন দড়ি, কাছি প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার পত্র—কৃমিনাশক। ফল—শ্লেষ্মা-নাশক, রেচক ও সারক।

বেড়েলা

বেড়েলা একপ্রকার গুল্ম জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। এদেশে পীত এবং শ্বেত উভয় জাতীয় বেড়েলা দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে ইহা স্বভাবতঃ বন্যভাবেই জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ ডালপালাবিশিষ্ট ইহা ছোট গাছ হয় কিন্তু ঢাকা কৃষিক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচন ও পৃথকীকরণ প্রথাদ্বারা এত উন্নত হইয়াছে যে, ইহা আর ডালপালাযুক্ত হয় না। বেশ সরল ও ৬।৭ ফিট দীর্ঘ হইয়াছে। যত্নপূর্ব্বক উত্তমরূপে চাষ করিতে পারিলে ইহা একটি লাভের জিনিষ। ইহা হইতে শুভ্র, কোমল, উজ্জ্বল রেশমের মত এবং দৃঢ় সূতা উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা টোয়াইন, বোরা, দড়ি, ক্যাম্বিশ, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে

পারে। ইহার সূতা পাটের ন্যায় নানবিধ বস্ত্রশিল্পেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সকল জমিতেই বেড়েলা জন্মিতে পারে। তন্মধ্যে উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। চৈত্র বৈশাখ মাসে জমি উত্তম-রূপে কর্ষণপূর্ব্বক মাটি চূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলে জমিতে পুনরায় লাঙ্গল দিয়া ঘনভাবে ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হইবে। গাছগুলি ৫।৬ হাত দীর্ঘ হইয়া পুষ্পিত হইতে থাকিলে ইহাদিগকে উৎপাটন পূর্ব্বক জমিতে ২।১ দিন ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। পরে আঁটি বাঁধিয়া জলে পচাইতে দিতে হয়। ৮।১০ দিনের মধ্যে গাছের ছাল পচিয়া যাইলে পাট বা টেঁড়শের ন্যায় কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। ইহার সূত্র পাট অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ৩॥০ মণ সূত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক-মলরোধক, বলকর, কান্তিপ্রদ, রক্তপিত্ত ও রক্তদোষনাশক। দুগ্ধ ও চিনির সহিত বেড়েলা মূলের ছালচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে মূত্রাতিসারের উপশম হয়। পীত বেড়েলার মূল-চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিলে প্রমেহরোগে উপকার দর্শে।

ভাঙ্গ

ভাঙ্গ সাধারণতঃ মাদকদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা হইতেও একপ্রকার উৎকৃষ্ট সূত্র উৎপন্ন হইতে পারে। ভাঙ্গের সূত্রকে ইংরাজী ভাষায় হেম্প্ বলা হয়। ইহা পাট অপেক্ষা দৃঢ়তর, দীর্ঘকালস্থায়ী ও জলসহনশীল। এই কারণে প্রধানত জাহাজের কাছি, পাল, ক্যাম্বিশ, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুতকল্পে ভাঙ্গের সূতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে ইহার চাষ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কেবল রাজসাহী, যশোহর এবং আসামের কোন কোন স্থানে সিদ্ধি, গাঁজা, চরস প্রভৃতির নিমিত্ত ইহার চাষ হইয়া থাকে। এক জাতীয় ভাঙ্গ-গাছে কেবল ফুলই ধরিতে দেখা যায়, বীজ জন্মে না। উহাকে পুং জাতীয় গাছ বলা হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতীয় গাছে বীজ জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী জাতীয় গাছ অপেক্ষা পুং গাছে শীঘ্রই সূত্র জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রী জাতীয় গাছ গাঁজা প্রস্তুতের জন্য এবং পুং জাতীয় গাছ সূতার জন্য চাষ করা হইয়া থাকে। স্ত্রী অপেক্ষা পুং গাছের সূতা অধিক মজবুত হইয়া থাকে। সূত্র অপেক্ষা মাদকদ্রব্যের চাষে লাভ বেশী। এইজন্য কৃষকেরা মাদকদ্রব্যের চাষে আকৃষ্ট হয়। মাদকদ্রব্যের চাষে লাইসেন্স এবং অন্যান্য খরচা আছে কিন্তু সূত্রের জন্য ইহার চাষে সেরূপ কোন খরচা নাই। তবে সরকারের বিনা অনুমতিতে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ভাঙ্গের চাষে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইজন্য ইহার চাষ করিতে হইলে জমিতে সার প্রয়োগ প্রয়োজন। দোআঁশ মাটিতে কিংবা নদীর চর জমিতে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। নানাবিধ পশুপক্ষাদির বিষ্ঠা, গোয়ালের পচা আবর্জ্জনা এবং উদ্ভিজ্জ সার ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শীতল ও পার্ব্বত্য দেশজাত সূতা যেরূপ দৃঢ়, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ হইয়া থাকে অন্য স্থানে সেরূপ হয় না। এদেশে সুফল পাইতে হইতে শীতকালে ইহার চাষ করা আবশ্যক। হিসাব মত মাঘ ফাল্গুন ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে চাষ করিলে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ফসল পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে একপ্রকার বন্যসিদ্ধির গাছ যেখানে-সেখানে জন্মিতে দেখা যায়। ভালরূপে ইহারও চাষ করিতে পারিলে সূত্রের উৎকর্ষলাভ ঘটিতে পারে।

ইহার জমিতে বারংবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি গুঁড়াইয়া সমতল করিতে হইবে, পরে জমিতে 'যো' হইলে পাটের ন্যায় ঘনভাবে বীজ ক্ষেতে ছিটাইয়া বপন করা উচিত। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। এদেশে ইহার গাছ সাধারণতঃ ৪।৫ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। বীজ পাতলা ভাবে বুনিলে গাছ শাখা-প্রশাখাবহুল হইয়া থাকে; সুতরাং উহা হইতে দীর্ঘ সূত্র পাওয়া যায় না। সেইজন্য পাটের ন্যায় ঘনভাবে ইহার বীজ বপন করাই কর্ত্তব্য।

বীজ বপনের পরে ভাঙ্গের জমিতে পাট বা নিড়ানের

আবশ্যক হয় না, কারণ ভাঙ্গগাছের পরিত্যক্ত রস এত বিষাক্ত যে, উহার জমিতে অন্য কোন আগাছা জন্মিতে পারে না। ৪।৫ মাসের মধ্যেই গাছগুলি স্থান বিশেষে ৪।৫ হাত হইতে ৮।১০ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া সূত্রোপযোগী হইয়া থাকে। বীজ ভালরূপ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই গাছগুলি কাটিয়া জমিতে ৩।৪ দিন ফেলিয়া রাখিয়া গাছের রস ও পাতাগুলি শুকাইয়া গেলে আটি বাঁধিয়া জলে পচাইতে দিতে হয়। ১০।১২ দিনের মধ্যে গাছের ছাল পচিয়া গেলে পাটের ন্যায় কাচিয়া শুকাইয়া লইলেই উহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতা বাহির হইবে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটু-কষায়-তিক্ত-রস, পাচক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, নিদ্রাকারক, মত্ততাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, বিসূচিকা ও অধিক রক্তস্রাবে বিশেষ ফলপ্রদ। মটর পরিমাণ ভাঙ্গের বটী জ্বরাগমের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে শীতল জলসহ ৩।৪ দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

মাদুরকাটী

ইহা মূল জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার গাছগুলি সাধারণতঃ ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। বিহার, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার কাটী হইতে ইচ্ছামত সরু ও মোটা মাদুর প্রস্তুত করা যাইতে

পারে। মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার রীতিমত চাষ হয় এবং তথায় মাদুর প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উচ্চ এঁটেল মৃত্তিকায় ইহার চাষ অতি উত্তম হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার জমি কোপাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলেই এক ফুট অন্তর লাইন দিয়া জমিতে ৮৷৯ ইঞ্চি ব্যবধানে ৪৷৫ ইঞ্চি মাটির নীচে ইহার মূল বপন করিতে হয়। গাছগুলি বেশ বড় হইলে নিড়ানি দ্বারা গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। স্থান-বিশেষে গাছগুলি ৪৷৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। গাছগুলি বড় হইলে উহাদিগকে কর্ত্তন করিয়া ৩৷৪ দিন জমিতে ফেলিয়া রাখিতে হয়, পরে পুষ্পদণ্ডের মস্তকস্থিত ফুল ভাঙ্গিয়া দিয়া লম্বালম্বি ২ বা ৪ ভাগে চিরিয়া ফেলিতে হয়। কাটীগুলি অত্যন্ত মোটা হইলে ভিতরের শাঁসটি বাদ দিতে হয়। আবশ্যক মত কাটীগুলি সরু বা মোটা করিয়া চিরিয়া লইতে পারা যায়। কাটীগুলি চিরিবার পূর্ব্বে উহা কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া লওয়া আবশ্যক।

মাদুরকাটী জমি হইতে কাটিয়া লইবার পর জমির উপরিস্থ মৃত্তিকা কোদালি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া পাঁক বিছাইয়া রাখিলে বর্ষাকালে উহার মূল হইতে পুনরায় গাছ জন্মিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই প্রকারে জমি পরিষ্কার করিয়া পাঁক ব্যবহার করিলে উহারা ১০৷১৫ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে জন্মিয়া থাকে।

অন্যান্য গাছ

পূর্ব্বে যে-সমস্ত উদ্ভিদের কথা লিখিত হইয়াছে ঐ সমস্ত উদ্ভিদ্ ব্যতীত অন্যান্য নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ হইতেও সুন্দর, দৃঢ় ও চিক্কণ সূতা প্রস্তুত হইতে পারে।

নানাজাতীয় কলাগাছের পেটো হইতে অতি মজবুত সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে, সিংহলে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিকা, আফ্রিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নানাজাতীয় বন্য কদলী গাছ জন্মে; কোন কোন স্থানে প্রভূত পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই সমস্ত কলাগাছ হইতেও উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্বারা দড়ি, কাছি, ক্যাম্বিশ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা গদি ভরা হইয়া থাকে। নারিকেলের ছোবড়া হইতে যে আঁশ বাহির হয় উহা দ্বারা অতি মজবুত দড়ি, কাছি, ম্যাটিং, পাপোশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত সিসেল হেম্প্, বনজবা, স্থলপদ্ম, মসিনা, ঝাঁপিটেঁপারি, মেটেআলু, সানফ্লাওয়ার, সূর্য্যমণি প্রভৃতি গাছ হইতেও ব্যবহারের উপযোগী অল্প-বিস্তর দৃঢ়, মজবুত ও চিক্কণ সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে এবং ঐ সকল সূতা নানাবিধ ব্যবহারিক শিল্পে প্রযুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

মিষ্টবর্গ (Sugar Crops)

ইক্ষু

ইক্ষুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। সর্ব্বপ্রথম শরখাগড়া জাতীয় জলাভূমির একপ্রকার উদ্ভিদের মিষ্ট রসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ইহার চাষ প্রবর্ত্তন হয়। ক্রমশঃ চাষ বিবর্ত্তন ও শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা এদেশে ও বিদেশে ইহার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। জাতি বিশেষে ইহা উচ্চ, নিম্ন, সরস, নীরস, দোআঁশ, বালিআঁশ, এঁটেল, চিক্কণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিয়া থাকে। বহু প্রাচীন যুগ হইতেই ইক্ষুগুড় ও চিনির প্রচলন ভারতবর্ষে ছিল। তাহার পর যে সময় ভারতীয় বণিক্‌গণ বিদেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, সে সময় ভারতীয় চিনি পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে চিনির প্রচলন ছিল না বলিয়া জানা যায়। মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিস্ নগরই চিনির প্রধান বন্দর ছিল। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিয়া নিজ প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করা বিদেশের বন্দরসমূহে রপ্তানি করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়

বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শর্করা-শিল্প একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে শঙ্করজাতীয় নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ইক্ষু সৃষ্ট হইয়া চাষ প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। বীটপালম হইতে চিনি প্রস্তুত বিধি আবিষ্কৃত হওয়ায় ও নানাবিধ শ্রমলাঘবকারী কলকব্জা আবিষ্কৃত হইয়া অল্পসময়ে প্রচুর পরিমাণে শর্করা উৎপন্ন হওয়ায় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির-শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বাধীন দেশের সরকার তদ্দেশে শর্করা-শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা পরাধীন ভারতের পক্ষে কল্পনার বিষয়। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ভারতে উন্নত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুতের কারখানা পুনরায় স্থাপিত হইয়া ভারত তাহার নিজ প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপাদন করিতেছে। বাংলাদেশেও ৭টি বৃহৎ মিল স্থাপিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। ভারতে সাধারণতঃ ১১॥০ লক্ষ টন চিনি ব্যবহৃত হয় কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ হইয়াছিল ১৪ লক্ষ টন। তাহা হইলেও এই ২॥০ লক্ষ টন চিনি কাটতির বাজার ভারতে নাই। বিগত ১৯৩৪ সালে গভর্ণমেণ্ট ১০ বৎসরের জন্য শর্করা-শিল্পকে পর্য্যন্ত সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করিলেও ১৯৩৭ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তিতে সহি করিয়াছেন ও পূর্ব্ব সংরক্ষণ শুল্ক রহিত করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের মতে উচ্চহারে সংরক্ষণ শুল্কের

সাহায্যে এখন এদেশে চিনি প্রস্তুত হওয়ায় চিনির উৎপন্ন মূল্যে গড়পড়তা আধিক্য হইতেছে। সেইজন্য উচ্চ পড়তা মূল্যে দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিলে লোকসান অনিবার্য্য। কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় মিলগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া স্বতঃই দর কমাইয়া ফেলিয়াছে। এক চিনির পক্ষে এইরূপ হইলেও কিন্তু অন্যান্য পণ্যের বেলায় এইরূপ কখনও ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে না। কিন্তু যদি উক্ত সংরক্ষণ শুল্ক রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পুনরায় শর্করা-শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে বিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আবার ভারতবর্ষ হইতে এক ব্রহ্মদেশ ছাড়া চুক্তিবদ্ধ না হইলে অন্য কোন দেশ উহা রপ্তানি করিতেও পারিবে না। এই সমস্যার পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ইক্ষু-চাষীদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কারণ তাহারা ৵১০ দুই পয়সা মণ দরে উৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড মিলসমূহে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। মিলসমূহের গুদামে ও বেনিয়ানগণের গুদামে যে উদ্বৃত্ত চিনি জমিয়া আছে তাহা বিক্রয় না হইলে আর মিলসমূহ নূতন চিনি উৎপন্ন করিবার জন্য ইক্ষুদণ্ড ক্রয় করে নাই। ফলে কৃষকগণ সাধাসাধি করিয়া অত্যন্ত কম মূল্যে কিছু কিছু আক বিক্রয় করিয়াছে। এদিকে মিলসমূহ মণপ্রতি উৎপন্ন চিনির উপর প্রায় ১৲ করিয়া ট্যাক্স দিয়া ১৯৩৭ সালে আর লভ্যাংশ পায় নাই। অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন যে, ভারতের এই সামান্য পরিমাণ চিনি দেশের মধ্যে ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা

করার পরও যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা রপ্তানি না করিলে দেশের অভ্যন্তরেও দর ঠিক থাকা আর সম্ভব হইবে না। ইংলণ্ড এক্ষণে ১৩ লক্ষ টন চিনি সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশসমূহ হইতে ক্রয় করে। ইংলণ্ডজাত বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য পক্ষপাতিত্ব-মূলক রক্ষণ শুল্কের সাহায্যে ভারতে তাহা রপ্তানি করে। কিন্তু তাহারা ভারতীয় চিনি ক্রয় করিতে অসম্মত। পড়তা ব্যয়ের হিসাবে কোনও দেশে চিনির দর নিয়ন্ত্রিত হয় না। জাভা ও কিউবা ছাড়া কোথাও ভারতের মত সস্তায় চিনি উৎপন্ন করিতে পারে না।

উপরে মুখবন্ধস্বরূপ যাহা বলা হইল তাহার সমাধানের জন্য দেশের সুধীগণের আন্দোলন চালান প্রয়োজন। তাহা ছাড়া কি উপায়ে ইক্ষু চাষের উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

বাংলাদেশে অনেক প্রকার ইক্ষু আছে। তন্মধ্যে হেমজা, খাড়ি, খাগড়ী, মুঙ্গো প্রভৃতি ইক্ষুরই অধিক চাষ হইয়া থাকে। সামসাড়া, গেণ্ডারী ও ভেলনামুখী ইক্ষু মাঝারি মোটা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহাদের ত্বক্ কোমল বলিয়া ইহাতে পশু ও রোগের উপদ্রব বেশী। বাংলার মোটা আকের মধ্যে কাজলী, খাড়ী ও ধলসুন্দর উল্লেখযোগ্য।

চিনির ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে এবং বিদেশীর সহিত ইহার প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় বিশেষ বিশেষ ইক্ষুর চাষ করা আবশ্যক।

সামসাড়া :—ইহা ৫।৬ হাত দীর্ঘ হরিদ্রাভাবিশিষ্ট দৃঢ়ত্বক্ এবং মোটা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা উত্তম জন্মে।

বঙ্গদেশীয় ইক্ষুর মধ্যে অনেকে ইহাকেই শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া থাকেন। ইহার চাষে অধিক পরিমাণে জলের আবশ্যক হয়, অথচ গাছের গোড়ায় সামান্য জল দাঁড়াইলেও ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য ক্ষেত্রে যাহাতে স্থায়ীভাবে জল দাঁড়াইতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। রেড়ির খইল, গোবর, পচা আবর্জ্জনা ইহার জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা চলে। ইহা হইতে প্রচুর মিষ্ট রস পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি প্রায় ৪০।৪৫ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খাড়ি :—ইহার রং ফিকে সবুজ আভাযুক্ত। পক্ক অবস্থায় হরিদ্রাবর্ণের হয়। ইহা অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং দৃঢ়ত্বক্ বলিয়া সহজে কীটে ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। বঙ্গদেশে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। উচ্চ দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহা ভাল জন্মে। ইহার রস মিষ্ট। বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা জমিতে একবার জন্মাইলে প্রতি বৎসর গোড়া হইতে চারা বাহির হইয়া ক্রমান্বয়ে ৫।৬ বৎসর ফসল জন্মিয়া থাকে। খাড়ি আকের আর একটি গুণ এই যে, ইহা শুষ্কস্থানেও জন্মে আবার ১৫।২০ দিবস গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলেও ইহার

কোন ক্ষতি হয় না। বঙ্গদেশের পক্ষে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ লাভজনক।

কাজলী :—এই জাতীয় ইক্ষু ৬।৭ হাত দীর্ঘ হয়। ইহার ত্বক্ দৃঢ় হইলেও সামসাড়া অপেক্ষা কিছু কোমল ও মিষ্ট হইয়া থাকে। এই জাতীয় আক ঈষৎ বেগুনেবর্ণের হয়। নদীয়া, বর্দ্ধমান, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে।

শুষ্ক দোআঁশ মাটিতে ইহা ভালরূপ জন্মে। পশুপক্ষাদির বিষ্ঠা, আবর্জ্জনা, উদ্ভিজ্জসার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। নিয়মিতরূপে চাষ করিতে পারিলে বিঘাপ্রতি ২০।২২ মণ গুড় উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

পুঁড়ি :—সাহারানপুর জেলায় এই জাতীয় ইক্ষু ৬।৭ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। বঙ্গদেশে ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে। গাছের বর্ণ হরিদ্রাভ। ইহা কঠিন ত্বক্‌বিশিষ্ট ইক্ষু নহে। ইহা সাধারণতঃ স্থূলকায় ও রসবহুল। এই নিমিত্ত অনেকে ফলমূলাদির ন্যায় খাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার চাষের জন্য সরস ও সারযুক্ত জমি নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলেই বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গুড় উৎপন্ন হইতে পারে।

লাল ইক্ষু :—ইহা অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক্‌বিশিষ্ট এবং কঠিনপ্রাণ। এইজন্য ইহা কীটাদিতে সহজে নষ্ট করিতে পারে না। আসাম

অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নিম্ন-ভূমিতে ইহা অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। এই জাতীয় ইক্ষু হইতে অধিক পরিমাণে রস পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

অধুনা কেয়েম্বাটুর, হেরেল (মহীশূর) ও অন্যান্য আক-শঙ্কর প্রজননকেন্দ্রে যে সমস্ত উন্নত আক সৃষ্টি করা হইতেছে, সেগুলি নানাবিধ পরীক্ষার পর কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা হয় ও বীজগাছ প্রদান করা হয়। এই সমস্ত উন্নত আকের নামকরণ শঙ্কর প্রজননকেন্দ্রের নামের আদ্য অক্ষর মিলাইয়া ও নম্বর করিয়া করা হয়। এই সমস্ত আক দুই প্রকারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, কৃষকদের গুড় প্রস্তুত করিবার উপযোগী নরম আক যাহাতে গরু বা মহিষ দ্বারা আক পেষণ করা সহজ হয় ও পোকা ও শৃগালের উপদ্রব কম হয় সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি জাতির সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত এই জাতীয় আক হইতে পূর্ব্ব প্রচলিত আকের অপেক্ষা গুড়ের ও চিনির ফলন হয় অধিক। দ্বিতীয়তঃ, কারখানার উপযুক্ত আক, যাহারা বিস্তৃত ক্ষেত্রে ট্রাক্টর ও নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা চাষ-আবাদ করেন ও কলের সাহায্যে আক পেষণ করেন, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার আকের সৃষ্টি করা হয়। এই আক মোটা ও ফলন বেশী ও চিনিও হয় বেশী। প্রথমোক্ত আকের মধ্যে C. O. কোয়েম্বাটুর ৩৬০, ৪১৯, ৪১৪, ৪১৭,

৪২৬ এবং H. M. ৩২০ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রচলিত জাভা E. K. ২৮ ও হলদে ট্যানা ক্রমশঃ অবনীত হইলেও চাষীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত। কারখানার উপযুক্ত মধ্যে C. O. ৪০৯, ৪০৮, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৯ এবং ৪২১ এবং P. O. J. ২৮৭৮ অধুনা প্রচলিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আক।

B. 208 (বি. ২০৮) :—এই ইক্ষু খুব বড় ও বেশ মোটা এবং খোসা খুব নরম। ইহা বেশ মিষ্ট, চিবাইয়া খাইবার উপযোগী। ইহা খুব ঝড়ঝাপটা সহ্য করিতে পারে না।

B. 147 (বি. ১৪৭) :—উত্তর-বাঙ্গলায় ইহা ভাল জন্মে। ইহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং চিবাইয়া খাওয়াও চলে। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় আক।

C.O. 213 (সি. ও. ২১৩) :—ইহার ফলন উত্তম, গাছ বেশ ঝাড় বাঁধে, আকের বর্ণ লালচে-কটা, আক মাঝারি সরু, গাছ কঠিনজীবী, অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করিতে পারে। এই আকের গুড় খুব উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

Yellow Tanna (হলদে ট্যানা) :—আক বেশ মোটা ও শক্ত, রোগ খুব কম হয় এবং শৃগালাদি পশু সহজে নষ্ট করিতে পারে না। বিঘাপ্রতি প্রায় ৩০ মণ গুড় হয় কিন্তু খুব মিষ্ট নয়, একটু টক্ টক্ লাগে। ইহার গুড় অধিক দিন ঘরে রাখিয়া দেওয়া চলে না, নষ্ট হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন বহু প্রকারের ইক্ষু আমাদের দেশে জন্মিয়া থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষীয় ইক্ষু প্রায় একশত প্রকার কিংবা

ততোধিক হইবে কিন্তু সকলেই যে বিভিন্ন জাতি এমন নহে। একই জাতীয় ইক্ষু নানাদেশে বিভিন্ন জলবায়ু ও আবহাওয়ার গুণে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতজাত বিলজ তৃণ শর খাগড়া প্রভৃতি সমগোত্রীয় তৃণই বর্ত্তমান প্রচলিত যাবতীয় ইক্ষুর জনক-জননী; সুতরাং ইহাতে জলীয় ভাগই অধিক। ১০০ শত ভাগ সরস ইক্ষুদণ্ড শুষ্ক করিলে ২৫ ভাগ খাকি বা ছোবড়া পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহার চাষে প্রচুর জল-সেচন করিতে পারিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। বাংলা দেশের মধ্যে পদ্মা ও গড়াই এবং ইহার শাখা ও উপশাখা সমূহে পলি-সংযুক্ত মৃত্তিকায় পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোন স্থানের মৃত্তিকার অপেক্ষা শত শত গুণ ভাল আক উৎপাদনের উপাদান বর্ত্তমান আছে। আর উক্তস্থানসমূহের পলিতে এরূপ পরিমাণে ইক্ষুর মিষ্টরস 'স্যাকরোজ' উৎপাদনের উপাদান আছে যে, পৃথিবীর যে-কোন অংশের ফসল অপেক্ষা এখানকার ফসল ভাল হয়। এই মিষ্ট রসই চিনির প্রধান উপাদান। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ সরস। সেইজন্য বিনাসেচেও ভাল ইক্ষু জন্মান সহজসাধ্য।

জমি :—জাতি বিশেষে ইক্ষু সকল প্রকার মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে সত্য কিন্তু সরস হালকা দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহার চাষ উত্তম ফলপ্রদ। এই প্রকার জমির একান্ত অভাব হইলে আবশ্যক মত বালি ও উদ্ভিজ্জসার প্রয়োগ করিয়া মাটির অবস্থা

পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। লোনা জমিতে সাধারণতঃ অন্য কোন ফসল জন্মায় না। কিন্তু সেখানে ইক্ষু ভালই জন্মাইতে দেখা যায়। সামান্য উচ্চ এবং সমতল ভূমিই ইক্ষুচাষের উপযুক্ত স্থান।

ছায়াযুক্ত স্থানে ইক্ষুচাষ করা ঠিক নহে, কারণ ইক্ষুগাছ যদি প্রচুর পরিমাণে রৌদ্রতাপ না পায়, তাহা হইলে উহাতে শর্করার অংশ কমিয়া যায়। ফলতঃ উহার আস্বাদন পানসে হইয়া যায়।

ইক্ষুচাষে প্রচুর সার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে বিনাসারেও ইক্ষুচাষ হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকা স্বতঃই উর্ব্বরা হয় ও সরস থাকে তাহা হইলে প্রথম বৎসর কোন প্রকার মধ্যম রকমের ফসল উঠা সম্ভব হইলেও দ্বিতীয় বৎসর হইতে আর ভাল ফলন মোটেই হয় না। ইক্ষু অত্যন্ত সারপ্রিয় গাছ। ইহারা জমি হইতে অত্যন্ত অধিক সার গ্রহণ করায় অল্পদিনের মধ্যেই জমি অনুর্ব্বর হইয়া উঠে।

ইক্ষুর উপযুক্ত হালকা দোআঁশ মাটিতে পূর্ব্ব-বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাস হইতে চাষ ও সার প্রয়োগ আরম্ভ করা হয়। দেশী প্রচলিত লাঙ্গল দ্বারা চারিখানা চাষ দিয়া প্রথমে বিঘাপ্রতি ৪।৫ গাড়ী গোবরসার প্রয়োগ করিয়া ১৫।২০ দিন ফেলিয়া রাখে। পুনরায় চারিখানা চাষ দিয়া সার মিশ্রিত করিয়া ১৫।২০ দিন বিশ্রাম দেয় ও প্রতিবারেই গোবরসার ব্যবহার করে। জমি

প্রস্তুত করিতে ২৪-৩০ বার চাষ দেয় ও ২০-২৫ গাড়ী গোবরসার ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানে পৌষ মাসের প্রথমেই বিঘা প্রতি এক শত মণ বা দশ গাড়ী গোবরসার দিয়া জমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করে ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া পুনঃপুনঃ কর্ষণ করিয়া জমি প্রস্তুত হয়। রাজসাহী হইতে নদীয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোহর, ঝিনাইদহ প্রভৃতি স্থানসমূহে এইরূপভাবে উত্তম চাষ দ্বারা ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়া কৃষকেরা যে ইক্ষু উৎপাদন করে তাহা সত্যই আনন্দদায়ক। এমন কি উক্তস্থানে গভর্নমেণ্টের কৃষিবিশেষজ্ঞগণকেও ইক্ষুচাষ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি।

যাহা হউক, উক্তরূপ চাষ দ্বারা বাংলায় রেকর্ড গুড় তৈয়ারী সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যদি সারের দিকে আর একটু অধিক মনোযোগ দেন তাহা হইলে ফলন যে আরও বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আখের চাষের উপযুক্ত পলিপড়া চরভূমির হালকা দোআঁশ মৃত্তিকা অগ্রহায়ণের শেষ হইতে চাষ দিয়া জমি ভাঙ্গিতে হয়। পৌষের প্রথমে উক্ত জমিতে ১০০ মণ গোবরসার, ২/ মণ রেড়ি বা সরিষার খৈল ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া সমানভাবে জমিতে ছড়াইয়া দিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হয়। জমি বেশী হইলে পল্লীগ্রামে সকলে যদি ১০ গাড়ী হিসাবে সার সংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে রেড়ি বা হাড়ের গুঁড়ার পরিমাণ বেশী করিয়া দিয়া পচাপানা ও সহজলভ্য হইলে ঘোড়ার গোবর ৫০/ মণ বিঘাপ্রতি ব্যবহারে

উত্তম ফলনের আশা করা যায়। দোআঁশ মাটি হইলে প্রথমে হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া পরে গোবরসার ও খৈলগুঁড়া ছড়াইয়া পুনঃপুনঃ চাষ দিয়া সার ও মাটি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেলিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া পচিতে ও উদ্ভিদের কার্য্যকর হইতে বিলম্ব হয়। সেইজন্য কার্ত্তিক মাসে মাটি ভাঙ্গিবার সময় হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া লওয়া ভাল। পরে পৌষ মাসে গোবরসার ও খৈল ব্যবহার করিতে হয়। যদি মাটি দুধে এঁটেল হয় তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে মাটি ভাঙ্গিবারকালে ২-২॥০ মণ হাড়ের গুঁড়া সমানভাবে ছড়াইয়া দিয়া লাঙ্গল চালাইতে হয়।

পরে পুনঃপুনঃ চষার দরুণ মাটি চূর্ণীকৃত হইতে দুইবার বিদা টানিয়া ঘাস ও আগাছা তুলিয়া ফেলা ও জমিতে মই টানিয়া সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জমি মাসের প্রথমেই প্রস্তুত করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। জমি প্রস্তুত হইলে নালা বা জুলি কাটিয়া ১।।-২ ফিট পেটি বান্ধিয়া জমিকে ভাগ করিয়া ফেলিতে হয়। প্রত্যেক চৌকা যত ইচ্ছা অর্থাৎ জমি যতই লম্বা হউক ক্ষতি নাই কিন্তু পাশ ও চওড়ার দিকে ১০ হাতের বেশী না হওয়াই ভাল। এক্ষণে জমির 'চালের' অর্থাৎ স্বাভাবিক গড়ান ঠিক রাখিয়া উক্ত পেটি বা নালার মধ্য ৪ ইঞ্চি গভীর করিয়া জল-নিকাশের ও প্রয়োজন মত জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। এক্ষণে প্রত্যেক বাটির মধ্যে ৪ ফিট অন্তর সমান্তরালভাবে এক ফুট চওড়া করিয়া ও ৮।৯ ইঞ্চি গভীর করিয়া জুলি কাটিতে হয়। এই জুলির মধ্যেই

আকের ডগা রোপণ করিতে হয়। জুলির মাটি তুলিয়া দুই-পার্শ্বে দাঁড়া বান্ধিতে হয়। জুলি ও দাঁড়া বান্ধা শেষ হইলে জুলির তলদেশ কোদাল দ্বারা একবার উত্তমরূপে কোদলাইতে হয়। কোদলাইবার সময় পুনরায় কিছু গোময়সার দিয়া মাটি চূর্ণ করিতে হয়। কারণ আক লাগাইবার সময় সাধারণতঃ মাটি নীরস হইয়া পড়ে কিন্তু গোময়সারে মাটির রস কৈশিকার্ষণ দ্বারা উত্তোলিত হইলে উহা ধরিয়া রাখায় মাটি সরস থাকে। কিন্তু সেচের সুবিধা থাকিলে জুলতে যে কয় প্রকার সার ব্যবহার করা হইবে তাহা তিন-চারবারে প্রয়োগ করা বিধেয়। প্রথম সার দিয়া মাটি তৈয়ার করিবার পর জুলির মধ্যে যে সার ব্যবহার করা হয় তাহা পরিমাণে বিঘাপ্রতি এইরূপ হইলে ভাল হয়ঃ যথা—তিন গাড়ী বা ৩০/ মণ গোবর-সার, ৮০ সের রেড়ির খৈলচূর্ণ ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া। গোবরসার অভাবে ঘোড়ার নাদিসার ১২/-১৩/ মণ অথবা শুষ্ক পানাপচা সার ১৭/-১৮/ মণ প্রয়োগ করা চলে। দোআঁশ মাটিতে ১০-১২ মণ গোবরসার, ১॥/ মণ রেড়ির খৈল ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োজন। দুধে এঁটেল মাটিতে হাড়ের গুঁড়া ও শুঁটকি মাছ ১/ মণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। জুলির মধ্যে সার প্রয়োগের ৭।৮ দিন পরে আকের বীজডগা পুঁতিতে হয়।

সাধারণতঃ ইক্ষুর অগ্রভাগের এক হাত হইতেই বীজ বা বিছন কাটা হয়। কিন্তু সেরূপ বীজে তিন বা চারিটি চোখ

(bud) ছাড়া অন্য অংশের চোখ যেগুলি ঘন ঘন গাঁটযুক্ত তাহা অপুষ্ট বিধায় ভাল গাছ হয় না। আবার একেবারে গোড়ার কিয়দংশের (প্রায় ২-২॥ হাত) চোখ অত্যন্ত পুষ্ট ও মাথাগুলি শুষ্ক। সেইজন্য তাহা হইতেও ভাল গাছ জন্মায় না। সেই কারণে উপরের ও গোড়ার কিয়দংশ বাদ দিয়া মধ্যভাগ হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই মাথা হইতে ১॥০ হাত কাটিয়া লইয়াই চাষীরা বীজ প্রস্তুত করে। মাথা হইতে চারা একদম হয় না তাহা নহে। মাথায় চারা বাহির হইতে বিলম্ব হয় ও গাছ বেশ তেজাল হয় না। গোড়ার অংশ হইতেও চারা বাহির হয় কিন্তু চারা অনেক কম বাহির হয়। ইহার চারা বাহির হইবার সময় প্রত্যেক গিঁটের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় গজায় ও মাটির রস শোষণ করিয়া মুকুল বা চোখকে সজীব করিয়া তোলে। শিকড়ের রস যোগান পাইয়া ঘুমন্ত চোখ বা মুকুল ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে ও মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে। বীজ বাছাই করিবার সময় বেশ পাকা দেখিয়া আক কাটিতে হয়। শুধু পাকা আক হইলেই ভাল বীজ হয় না। যে-সমস্ত পাকা আকের পাবগুলি লম্বা লম্বা ও পরিপুষ্ট চোক সমন্বিত ও জমিতে খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকে তাহা হইতেই উত্তম বীজ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ একটি করিয়া পাব কাটিয়া বীজ প্রস্তুত করার প্রথাই বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। খুব ধারাল দা দ্বারা পাবের দুই-দিকের গাঁটের উপর আঙ্গুল পরিমিত আক রাখিয়া বীজ কাটা

হয়। কিন্তু দুইটি গিঁট অপেক্ষা যদি তিনটি গিঁট রাখিয়া বীজ প্রস্তুত হয় তাহাতে ফলন ভাল হয় বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে অধিকাংশ স্থানেই বীজ-গুলিকে কোন সিক্ত স্থানে রাখিয়া খড় বা বিচালি চাপা দিয়া জল ঢালিয়া শিকড় ও চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া জমিতে বসান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি ২৫০ কাহন প্রায় ৩৫০০ ঠিকালি বীজ প্রয়োজন হয়। ভালভাবে আকের চাষ করিতে হইলে ও উহার উন্নতি করিতে হইলে বাছাইকরা ভাল আকের মধ্য অংশের তেজাল বীজই প্রয়োজন। আর হাপোর-দেওয়া প্রথা বিহিত করা উচিত।

গুড় ও চিনির জন্যই প্রধানতঃ আকের চাষ হইয়া থাকে। অন্যান্য কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ হইতেও উক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ইক্ষুর পরই বীট, খর্জ্জুর ও তাল বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। উক্ত কয়প্রকার উদ্ভিদের বিশেষ সময়ে বেশী মিষ্টরস ও স্যাকরোজ জন্মায়। যেমন, বর্ষার পরই খেজুর রস বেশী হয় ও শীত পড়িলে রস আরও বেশী পাওয়া যায় ও গাঁজিয়া যায় না। সেইজন্য খেজুরে গুড় প্রস্তুতের প্রশস্থ সময় শীত-কাল। বাংলা দেশের ইক্ষুতে মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসেই বেশী শর্করা বা স্যাকরোজ জন্মায়। সেইজন্য এই সময়ই আক-কাটাই ও মাড়াই হইয়া থাকে। গুড়ের জন্য ও চিনির জন্য আক জন্মাইতে হইলে নানাবিধ আকের মধ্য হইতে বাছিয়া যে-সমস্ত আক মাঘ ফাল্গুন মাসে পরিপক্ক

হয় তাহাই নির্ব্বাচন করা উচিত। ফাল্গুন মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করিতে না পারিলে পরবর্ত্তী মাঘ ফাল্গুনে আক পরিপুষ্ট হয় না। কিন্তু বাংলার যে-সমস্ত অংশে পশ্চিমে বায়ু প্রবাহিত হয় সে-সমস্ত জেলায় মাঘ ফাল্গুনে রস ধরিয়া রাখা যায় না। সেইজন্য জল-সেচন প্রয়োজন হয়। পশ্চিম-বঙ্গে একটি গাথা চলতি আছে—

"শোন ভাই আকের চাষ,
যদি করিস্ লাভের আশ,
হাতের কাছে সেচের জল,
তবেই জানিস্ চাষ সফল।"

কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের যে-সমস্ত জেলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট আক জন্মায় বলিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে সমস্ত স্থানে সেচ দেওয়া হয় না। সেচ দিতে পারিলে ফলন খুবই ভাল হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে ও যে-সমস্ত স্থানের মৃত্তিকা লাল ও শুষ্ক সে সমস্ত স্থানে খাড়ি, সি. ও. ২১৩ রোপণের পর কিংবা পূর্ব্বে একবার ও বর্ষা নামিবার পূর্ব্বে আর একবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি বৈশাখ মাসে ধরণ হয় তাহা হইলে আরও দুই-তিনবার সেচ না দিলে ইক্ষু ভাল হয় না। শ্যামসাড়া, ভেণ্ডামুখী ও গেণ্ডারী আকে চারি-বারেরও অধিক সেচ দিতে হয়। প্রচুর সার দিয়া আক চাষ করিলে বর্ষায় আরও এক বা দুইবার জল-সেচন প্রয়োজন হইতে পারে।

চারাগুলি একটু বড় হইয়া ১॥০-২ ফিট উচ্চ হইলে আর

একবার সার ব্যবহার করিতে হয়। ফাল্গুনের প্রথমেই বীজ রোপিত হয়। এ সময় জমি উপযুক্ত হইলে বিঘাপ্রতি ২৫/ মণ গোবরসার, ॥০ মণ রেড়ির খৈলচূর্ণ, ।৫ সের সুপার-ফস্ফেট্, ।০ সের সোডিয়াম নাইট্রেট্ ও ।০ সের সালফেট্ অব্ পটাস একত্র মিশ্রিত করিয়া জুলির সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পরে জল-সেচন দিতে হয়। সেচের পর 'যো' ধরিয়া মাটি খুলিয়া দিতে হয়। সার মিশ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ছড়াইয়া সেচ দেওয়া বিধেয়। মাটিতে উপযুক্ত 'যো' থাকিলে সেচ প্রয়োজন হয় না। এই সময় আকের ক্ষেতে চাষীর কাজ অনেক বাড়িয়া যায়। সার প্রয়োগ শেষ হইলে ও 'যো' বান্ধা হইলে জুলির উপরকার মাটি ভাঙ্গিয়া জুলির মধ্যে চারার গোড়ায় দিয়া জুলির অর্দ্ধেক ভরাট করিয়া দিতে হয়। দোআঁশ মাটিতে সার প্রয়োগে একটু কৌশল প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক সারের সহিত ৪।৫ গুণ মাটি মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। দুধে এঁটেল মাটির সহিত অর্দ্ধ মণ শুঁট্কি মাছের সার অভাবে অর্দ্ধ মণ রেড়ির খৈলের সহিত অন্যান্য সার মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার প্রয়োগের পর যথোপযুক্ত পাইট করিয়া জুলি অর্দ্ধেক ভরাট করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপরোক্তবৎ সার দিয়া ও পাইট করিয়া জুলি একবারে ভরাট করিয়া জমি সমতল করিয়া দিতে হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, জলসেচ প্রয়োজন হইলে যেন জল জমির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবার অবসর ও পথ

পায়। ক্রমশঃ জুলি ভর্ত্তি হইবার পর, তুই জুলির ব্যবধানের জমি হইতে পাইট করিয়া মুখে মাটি কাটিয়া আকের গোড়ায় দাঁড়া বান্ধিয়া দিতে হয়। এইরূপ না করিলে আকের গোড়ায় বর্ষার জল জমিয়া আকের ক্ষতি হয়। আষাঢ়ে ও বৈশাখ মাসের মত মৃত্তিকা বিশেষে একই নিয়মে সার প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপভাবে জমি পাইট করিবার সময় আগাছা জঙ্গলাদি পরিষ্কার রাখা ও শুষ্ক পাতা আক বিশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলা কিংবা আক জড়ান প্রয়োজন হয়। প্রথম জড়ান আরম্ভের সময় প্রত্যেক আক পাতা দ্বারা জড়ান হয়। এইরূপে পত্রাচ্ছাদিত তিন-চারিটি আককে একত্র করিয়া পুনরায় জড়ান হয়। ইহাকে গোছা জড়ান বলা হয়। এইরূপ করিবার সময় প্রত্যেক চাষী একখানা ছুরি-হস্তে জমিতে প্রবেশ করে ও যে-সমস্ত আক পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় সেগুলির ডগা চিরিয়া পোকা মারিয়া ফেলিতে থাকে। এইরূপ পোকা মারার নাম 'বোঙ্গা মারা'। সাধারণতঃ নরম ও চিবাইয়া খাইবার আকে বেশী পোকা লাগে ও শৃগাল, শূকরে খাইয়া নষ্ট করে। সেইজন্যই পাতা-জড়ান প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন জড়-বাঁধার জন্য আকগুলি জলঝড়ে হেলিয়া পড়িতেও পারে না। আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি পূর্ব্বেকার ধলি ও কাজলি আক পাতা-জড়ানর জন্য বেশী নরম ও মিষ্ট হয়। সেইজন্য চিবাইয়া খাইবার আকে পাতা-জড়ান প্রথা উত্তম ব্যবস্থা। সাধারণতঃ আষাঢ়ের প্রথম হইতেই পাতাবাঁধা আরম্ভ করিতে

হয় ও আশ্বিন মাসের মধ্যে পাতাবাঁধা শেষ করিতে হয়। প্রথম যখন আকে পাতাজড়ান হয় তখন পাতাগুলি বাঁ পাকে মোচ্‌ড়াইয়া আকগুলি জড়ান হয়। দ্বিতীয় বন্ধনে পাতাগুলিকে ডাইন পাকে জড়ান হয়। তাহার পর শেষ বন্ধনের সময় আক প্রায় ৭।৮ হাত দীর্ঘ হইয়া উঠে। সে সময় দাঁড়ার দুইদিক হইতে আক একত্রে আনিয়া ৬।৮খানা পর্য্যন্ত একত্র জড়ান হয়। চাষীর ভাষায় সাধারণতঃ এই প্রথাগুলিকে পাতাভাঙ্গা বলে।

কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, এইরূপভাবে পাতা জড়ান হইলে আকের অপকর্ষ সাধিত হয়—শর্করা ভাগ কমিয়া যায়। বর্ষার জলে পাতা পচিয়া গিঁট হইতে শিকড় গজায় ও জড় বাঁধিবার সময় টানিয়া একসঙ্গে করার জন্য আক স্বতঃই কিঞ্চিৎ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। আক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া না থাকিলে তাহার শর্করা ভাগ কমিয়া যাইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া পাতা ঢাকা পড়ায় চোখ-গুলি জল পাইয়া বাড়িয়া উঠে ও শর্করার অংশ কমিয়া যায়। খড়ি খাগড়ি, সি. ও. ২১৩ এবং অধুনা প্রবর্ত্তিত কয়েক জাতীয় আকের জড় বাঁধা হয় না কিন্তু পূর্ব্ব প্রচলিত কাজলি, ধলি, নটা প্রভৃতি আকের জড় বাঁধা হয়। শ্যামসাড়ার পাতা ভাঙ্গিয়া দিলে আক বেশী বাড়ে ও মিষ্ট বেশী হয়। সেইজন্য পাতা দ্বারা না জড়াইয়া যাইতে আকের পাতাগুলি যাহাতে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তাহা দেখা চাষীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-বঙ্গে এইরূপ পাতা ভাঙ্গিবার

সময় পাতা ও যে-সমস্ত চোখ বাড়িয়া ডালপালা বাহির হয় সেগুলি ভাঙ্গিয়া আনিয়া মহিষ ও গরুকে খাওয়ান হয়।

ইক্ষু অত্যন্ত সার-খাদক তৃণ হইলেও অতি অল্প পরিমাণে প্রস্ফুরাকাম্ল (ফস্ফরিক্ এ্যাসিড্) সার গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্ফুরাকাম্ল-প্রধান ঘটিত সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে ইহার শর্করা ভাগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য জাভা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে হাড়ের গুঁড়া, সুপারফস্ফেট্ অন্যান্য সারের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন্। অন্যান্য দেশের উন্নত প্রণালীর চাষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের দেশেও উপযুক্ত মৃত্তিকাতে বিঘাপ্রতি ২০০ মণ গোবরসার, ৮।১০ মণ রেড়ির অথবা সরিষার খইল ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু বহু-দিন যাবৎ এদেশের ইক্ষুসমূহ প্রায় বিনাসারেই চাষ হইতেছে। সেইজন্য হঠাৎ অতিরিক্ত সার প্রয়োগে অনেক সময় খারাপ ফল দেখা গিয়া থাকে। যথোপযুক্ত সার পাইলে পাতাগুলি চাপ দিলে মচ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু সার কম থাকিলে ভাঙ্গে না—অনেকটা স্থিতিস্থাপকভাবে থাকে।

ইক্ষুকে ধীরে ধীরে সারপ্রয়োগে সার খাইবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে সেইরূপভাবে জল-সেচনের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হইবে। জল না পাইলে সার মৃত্তিকা মধ্যে বিগলিত হয় না ও শুষ্কসার শিকড় শোষণ করিতে পারে না। সেইজন্য অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় সেচের জলের

ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু স্থান বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে জল-সেচনে সমস্ত ফসলেরই পাকিবার সময় পিছাইয়া যায়। সেইজন্য আকের চাষেও এই সত্যের অপলাপ হয় না।

যে-সমস্ত আকে ফুল হয় সেগুলির ফুল হইলেই বুঝিতে হইবে আক কাটিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে। কিন্তু যে-সমস্ত আকে ফুল হয় না তাহাদের পরিপক্কতা নির্ণয়ের জন্য পাতা বড় ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া স্থির করিতে হয়। গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ ও নিম্নমুখে পড়ে ও ক্রমশঃ অগ্রভাগ হইতে শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। পাকা আক মোচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় কিন্তু কাঁচা আকের ছালগুলি মচ্‌কাইয়া থাকে। ইক্ষু পাকিবার পূর্ব্বেই গুড় তৈয়ারীর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। বাইন প্রস্তুত বাড়ই, মাড়াই কল, জ্বালানি, টিন, চাড়ি ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ ঠিক হইলে আক-কাটা আরম্ভ করিতে হয়। সাধারণতঃ কোদালি দ্বারা আক কাটা হয়। পরে আক ঝুড়িয়া পরীক্ষা করিয়া খোলায় বা বাইনে আনয়ন করিতে হয়। কেহ কেহ 'মুড়ি' রাখিয়া একই ক্ষেতে দুই-তিন বৎসর ধরিয়া ইক্ষু উৎপাদন করেন। ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু কাটা হইয়া গেলে কেহ কেহ গোড়া-গুলি উঠাইয়া ফেলেন না। জমি সমান করিবার পূর্ব্বে শুকনা পাতা দ্বারা জমি পোড়ান হয়। পরে লাঙ্গল দ্বারা কিংবা কোদাল দ্বারা জমি উল্টাইয়া দিবার সময় মোথাগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দেন ও সার ব্যবহার করেন। পরিত্যক্ত গোড়া হইতে পুনরায়

নূতন আাক জন্মায় ও পর বৎসর একই ক্ষেত্রে আাক জন্মায়। এই মুড়ি আাকের বীজ ‘পত্তনের’ জন্য একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য, কারণ মুড়ি আাকের ডগার বীজ খুব ভাল হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সুফল প্রদান করে না। কিন্তু ভেণ্ডামুখী, শ্যামসাড়া আাকের ‘পত্তনী’ আাক অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের মুড়িতে ভাল ফলন হইতে দেখা যায়। খাগড়ি আাকও প্রায়ই দ্বিতীয় বৎসরে মুড়ি হইতে ভাল জন্মায়। পর পর ৩।৪ বৎসর ধরিয়া একই ক্ষেতে মুড়ি জন্মাইলে জমির শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে ও ধসা রোগ জন্মায়। মুড়ি আাকের চাষ করিতে হইলে প্রথমে আাকের উপরকার দুই-তিনটি গিঁট নীচে অবধি কাটিয়া ফেলিতে হয়। পরে নূতন চারা বাহির হইবার পূর্ব্বেই জমি পোড়াইয়া দিতে হয়। এই কার্য্য শেষ হইলে চারা বাহির হইলে পর পর পত্তনী আাকের চাষের মতই পাইট করিতে হয়।

ইক্ষুক্ষেতে সাধারণতঃ কীটপতঙ্গাদির ভয়ানক উপদ্রব হইয়া থাকে। শৃগালাদি জন্তুও ইক্ষুক্ষেতের অনেক অনিষ্ট করিয়া থাকে। নির্দ্দোষ ও রোগশূন্য ইক্ষুর কলম রোপণ করিলে অনেক সময় উই ও পিপীলিকাদিতে ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া থাকে। জমি গভীরভাবে বারবার কর্ষণ পূর্ব্বক মাটি বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিলে ইহাদের উপদ্রব কমে।

মাজরা লাগিলে ধান, যব ও গমের যেমন গর্ভশীষটি শুকাইয়া যায়, আাকেরও সেইরূপ মাঝপাতাটি শুকাইয়া যায়। এইরূপ শুকান মাঝপাতা অল্প টানিলেই উঠিয়া

আসে। কয়েকপ্রকারের প্রজাপতির কীড়া এই মাজপাতা খায় এবং তাহারা খাওয়াতে যখন জোড় পচিয়া যায় তখন মাছিরা ঐ স্থানে ডিম পাড়ে। ছোটবেলায় মাজরা দ্বারা আক্রান্ত হইলে আকগাছ মারা যায়। বড় অবস্থায় গাছে মাজরা লাগিলে আক আর বাড়ে না। সময় সময় এক জাতীয় পোকা আকের মাঝপাতাটি খাইতে খাইতে ডাঁটার অগ্রভাগে ফুকর করিয়া প্রবেশ করে এবং ১২।১৪ দিনের মধ্যেই ফুকরের মধ্য হইতে প্রজাপতি আকারে বাহির হইয়া আইসে ও আকের পাতার উপর ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এক জাতীয় আঁইস পোকা গাছের পাতার রস শুষিয়া খায় এবং উহারা শীঘ্রই গাছের তেজ কমাইয়া ফেলে। ইহাদের বংশ অতি শীঘ্র বাড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষেতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা একেবারে সমস্ত ক্ষেতে লাগে না। সেইজন্য প্রথম হইতেই নজর রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিলে আর ইহার বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না।

অনেক সময় আকগাছে ছাতরা রোগ জন্মিতে দেখা যায়। ছাতরা পোকাদের একটি খুব সরু শুঁড় আছে। এই শুঁড় পাতার বা ডাঁটার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া ইহারা রস চুষিয়া খায়। কেরোসিন মিশ্রিত জল অথবা ফিনাইল জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী অথবা ঝারির সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দিলে ছাতরা পোকা মরিয়া যায়।

সেঁকোবিষ চুর্ণ, রেড়ির খইল, তুঁতিয়া ও চুণ একত্র

মিশাইয়া উহা জলের সহিত গুলিয়া রোপণকালে কলমগুলি এই জলে ডুবাইয়া রোপণ করিলে সর্ব্ববিধ কীটের উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে।

ইক্ষু জমি হইতে কাটিয়া আনিয়াই উহা হইতে রস বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া আনিয়া কাটা অবস্থায় অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে উহার অভ্যন্তরস্থ অম্লভাগ উত্থিত হইয়া চিনিকে গলাইয়া ফেলে, সুতরাং এই রস জ্বাল দিলে তাহাতে চিনির ভাগ অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়। সাধারণতঃ আক মাড়িবার কল দ্বারা রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। আক কলে চড়াইবার পূর্ব্বে পাত্রাদি ও যন্ত্রের মলিন অংশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ইক্ষুদণ্ড কলে নিষ্পীড়ন করিয়া লইলেও কিয়দংশ রস ইক্ষুর কঠিন ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে। এইজন্য ইক্ষুগুলি দ্বিখণ্ডিত করিয়া কলে পিষিয়া লওয়া উচিত। ২।৩ রোলারের লোহার কলের ব্যবহার বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ কল বলদের দ্বারা চালিত হয় এবং সর্ব্বদা রোলারের মধ্যে ইক্ষু চালিত করিতে একজন লোক আবশ্যক হয়।

যে পাত্রে রস সঞ্চিত হইতে থাকে উহা পূর্ণ হইলেই গুড় প্রস্তুতের জন্য জ্বাল দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ইক্ষুর রস সাধারণতঃ অম্লবিশিষ্ট। অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে উহার অম্লতা আরও বৃদ্ধি পায়।

আকের অম্লতা দূর করিতে হইলে ও গুড় পরিষ্কার করিতে

হইলে রস জাল দিবার সময় উহাতে চূণ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। এক মণ রসের সহিত এক তোলা আন্দাজ চূণের জল মিশান যাইতে পারে। গভীর রাত্রে রস ঢালিয়া উহা চুলার উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। যখন উহা ফুটিতে থাকিবে তখন এক পোয়া আন্দাজ দুগ্ধের সহিত এক সের বা পাঁচ পোয়া জল মিশাইয়া একটু একটু করিয়া ফুটন্ত রসের উপর ছিটাইতে হইবে। এরূপ করিলে যখন রসের গাদ ও ময়লা-ভাগ কাটিয়া উঠিয়া উপরে ভাসিতে থাকিবে তখন উহা ছাঁকনার দ্বারা কাটাইয়া লইতে হইবে।

চূণ অধিক প্রয়োগ করিলে গুড় খারাপ হইয়া যায় ও কালচে রং ধরে। এইজন্য ইক্ষুরসে চূণের মাত্রা ঠিক রাখা আবশ্যক। যত মণ রস হইবে মণ প্রতি এক তোলা হিসাবে চূণের জল প্রয়োগ করিতে হইবে। চূণ প্রয়োগের পর পাত্রস্থ রস জ্বাল দিবার সময় একটি কাষ্ঠখণ্ড বা তাড়ু দ্বারা ঘনভাবে সঞ্চালন করিলে যদি উহার রং ঈষৎ শ্বেতবর্ণ হয় তাহা হইলে চূণ অধিক হইয়াছে এবং যদি পীতবর্ণ হয় তাহা হইলে চূণের মাত্রা ঠিক আছে বুঝিতে হইবে।

যখন রস গাঢ় হইতে থাকে এবং গাদ অতি অল্প পরিমাণে উঠিতে থাকে তখন জ্বাল অধিক আবশ্যক। রস হইতে গাদ কাটান ঈষৎ মৃদু জ্বালে সম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু এ সময় অগ্নির অধিক উত্তাপ আবশ্যক। রস ক্রমে ঘন হইতে থাকিলে তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে। ক্রমে রস কমিয়া উহার পাক

শেষ হইতে থাকিলে রসের বর্ণ ফিকা হরিদ্রাভাব ধারণ করে এবং বুদ্‌বুদ্‌ আকারে ফুটিতে ফুটিতে ফাঁপিয়া পাত্র ছাপাইয়া উঠে। এ সময় দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাড়ু অনবরত নাড়িতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে অল্প গুড় লইয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর সাহায্যে নাড়িয়া উহা সরু তারের মত চট্‌চটে ভাব ধারণ করিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। যখন এইরূপ ভাব ধারণ করিবে তখন পাত্রটি চুল্লী হইতে নামাইয়া পাত্রমধ্যস্থ গুড় অন্য কোন পাত্রে ঢালিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে দানাদার গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও জল সহযোগে যেরূপ চিনি পরিষ্কৃত করিবার জন্য রসের গাদ কাটান হইয়া থাকে, হুড়হুড়ে অথবা লতাকস্তুরীর ফলের রসও এই একই উপায়ে রসের গাদ কাটাইয়া উহার মলিনাংশ দূরীভূত করিয়া পরিষ্কার করিতে সমর্থ হয়।

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে গুড়ের পাত্রের নিম্নে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া রাখিলে গুড়ের পাতলা ভাগ চুয়াইয়া পড়ে ও পাত্রের মধ্যে দানাদার সারগুড় থাকে। কোন বাঁশের চোবড়া বা ঝুড়িতে পরিষ্কার সাদা বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তাহার উপরে ঐ দানাদার সারগুড় রাখিয়া উপরে ঝাঁজি অথবা পানিশ্যাওলা চাপা দিয়া কোন অন্ধকারময় ঘরে কিছুদিন রাখিয়া দিলে গুড়ের মলিন ভাগ কাটিয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত শুভ্রভাব ধারণ করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে উপ-রোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে উক্ত দানাদার গুড় শ্বেতবর্ণ শর্করাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত অতি বিলম্বে ঘটিয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত খরচাও অধিক পড়ে। এইজন্য আজকাল অন্য প্রক্রিয়া দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

গুড়ের কলসীর নিম্নে একটি ছিদ্র করিয়া রাখিলে উহার গাদ বা মাত অংশ চুয়াইয়া বাহির হইয়া যাইবে। পরে কলসীর মধ্যস্থিত সারগুড়ের সহিত অল্প চূণ মিশ্রিত করিয়া গরম জলে গুলিয়া লইতে হইবে, তৎপরে একখণ্ড ফ্লানেল কাপড়ের মধ্য দিয়া ও ফিল্টারের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া ঐ রসটাকে জাল দিলেই অতি উত্তম চিনি প্রস্তুত হইবে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত চিনি অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত চিনি শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইক্ষুমাত্রই রসে ও পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, মূত্রজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকারক, কান্তিজনক, তৃপ্তিকারক, ক্রিমিজনক এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্ত-দোষে উপকারক।

বীট

আজকাল বীট হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে বীট হইতে চিনি প্রস্তুতের উপায় কেহই অবগত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দে Sigismund Magraff (সিজিসমণ্ড মাগ্রাফ) প্রথমে বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে বীট সব্জী এবং পশুখাদ্য উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হইত,—উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইত না। চাষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ বীটে শর্করার পরিমাণ অতি অল্প থাকায় উহা হইতে চিনি প্রস্তুতে লোকের খরচা পোষাইত না কিন্তু ক্রমে প্রকৃষ্ট উপায়ে কর্ষণ ও সুমিষ্ট জাতীয় বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ উত্তরোত্তর প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিগত দেড় শত বৎসরের মধ্যে বীট এরূপ উন্নত ও মিষ্টবহুল হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে উহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হইতেছে।

বীট বহুপ্রকারের দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি সব্জীরূপে মানুষের আহার্য্য, কতকগুলি পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত এবং কতকগুলি হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। লংব্লড, ব্লডরেড, টার্নিপরুটেড্, ইজিপসিয়ান প্রভৃতি বীট সব্জীরূপে মানুষের খাদ্য। ম্যাঙ্গোল্ড বা অতিকায় বীট গরু, ঘোড়া ও মহিষা।দ জন্তুর খাদ্য। উহা আকারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

বড় হইয়া থাকে। সুগার বীট চিনি প্রস্তুতের জন্য চাষ করা হয়। ইহা হইতে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বীট এদেশীয় সব্জী নহে। ইহা শীতপ্রধান দেশের সব্জী। সেইজন্য এদেশে বীট সাধারণতঃ শীতকালে চাষ করা হয়। বপনের পর ৪।৫ মাসের মধ্যেই বীট চিনি প্রস্তুতের উপযোগী হইয়া উঠে। অষ্ট্রেলিয়া, জাভা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে সুগার বীট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাহারাণপুর ও মাদ্রাজ ব্যতীত এদেশে অন্য কোথাও চিনি প্রস্তুতের জন্য মিষ্ট জাতীয় বীটের চাষ হয় না। ইক্ষু হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইক্ষুর পর বীটের স্থান। তাল ও খেজুরের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয় কিন্তু তাহা বাট অপেক্ষা পরিমাণে কম হইয়া থাকে।

ঈষৎ লবণাক্ত দোআঁশ জমিতে বীট ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গোবরসার, ১॥০ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৩।৪ মণ খইল ব্যবহার করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।



খর্জ্জুর

ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই অল্পাধিক খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা মাদকদ্রব্য-বোধে খর্জ্জুর রস গ্রহণ করেন না। বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পাতলা ও দানাদার গুড়, পাটালি ও চিনি প্রস্তুত করা হয়। এদেশীয় খেজুরের শাঁস অল্প এবং বীজ বড় কিন্তু আরব দেশে যে খেঁজুর জন্মে তাহার বীজ অতি ক্ষুদ্র এবং শাঁসের ভাগ অধিক। বাঙ্গলা দেশে খর্জ্জুর রস হইতে যে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নলিন গুড়ই বিখ্যাত। ইহা পাতলা হইলেও অতি সদগন্ধযুক্ত। সেইজন্য ইহার এত বেশী আদর।

বর্ষাকালে ইহার বীজ বপন করা হয়। বীজ হইতে গাছ জন্মাইতে হইলে সুপক্ব বীজ চারাইয়া জমিতে বপন করা আবশ্যক। বাংলা দেশে যেখানে-সেখানে অযত্নে ইহার বীজ হইতে আপনা-আপনি গাছ জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্ষেতের চতুঃপার্শ্বে এই সমস্ত গাছ লাগাইলে জমি আটক থাকে ও বেড়া দিবার আবশ্যক হয় না, অধিকন্তু ইহার রস হইতে গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। ৫০।৬০টি খেজুর গাছ থাকিলে একটি বড় গৃহস্থের সম্বৎসরের মত গুড় ও চিনি কিনিবার আবশ্যক হয় না।

খেজুর গাছ রোপণ করিবার পর প্রতি বৎসরেই গাছের গোড়ায় পাঁকমাটি প্রয়োগ করিতে হয়। মাটি দিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়ার চতুঃপার্শ্ব কোদালি দ্বারা কোপাইয়া কিছুদিন জমি ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। এইরূপ করিলে গাছ তেজাল হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৭।৮ বৎসরেই গাছে ফল ধরে। সাধারণতঃ ৩।৪ বৎসরের গাছ হইতে রস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসর রসের নিমিত্ত মুড়া দিবার পূর্ব্বে গাছের মাথার নীচেকার শাখাগুলি ভালরূপে ছাঁটিয়া দিলে গাছ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ শীতের প্রারম্ভে আশ্বিন মাসে গাছের মুড়া দিয়া কার্ত্তিক হইতে মাঘ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত রস লওয়া যাইতে পারে। এক-একটি গাছ হইতে প্রতিদিন ৬।৭ সের হইতে ১০।১২ সের রস পাওয়া যায়। প্রতি বৎসরেই খেজুর গাছের পত্রগুচ্ছের কিছু নিম্নে এক হাতের কিছু কম তিন পোয়া আন্দাজ স্থান চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। কিছুদিন বিশ্রাম দিয়া সেই স্থানের অর্দ্ধেকটা আরও একটু গভীর করিয়া চাঁচিলেই সেই স্থান হইতে রস চুয়াইতে থাকিবে। পরে ৮।৯ অঙ্গুলি একটি নল বা গাঁটযুক্ত কঞ্চি দুই ভাগ করিয়া চিরিয়া ফেলিয়া উহার একখণ্ড লইয়া একদিক একটু সরু করিয়া চাঁচিয়া যে স্থান চাঁচা হইয়াছে তাহার নিম্নে পুঁতিয়া দিতে হয়। পরে নলের নিম্নে ভাঁড় বা কলসী বাঁধিয়া দিতে হয়। ৩ দিন কাটিবার পর ৪।৫ দিন জিরান দিয়া পুনরায় গাছ কাটিবার

নিয়ম। বিশ্রাম দিবার পর প্রথম যে দিন কাটা হয় তাহা জিরান বা নলিন, দ্বিতীয় দিনকে দোকাট ও তৃতীয় দিনকে তেকাট কহে। এই সমস্ত কাজ যাহারা করে তাহাদিগকে সিউলি বলে।

সকাল হইবামাত্রই গাছ হইতে রস নাবাইয়া জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা বেলা হইলে রস ঘোলা হইয়া আসে। যে হাঁড়িতে রস ধরা হয় তাহা প্রত্যহ ধুইয়া ফেলা উচিত এবং হাঁড়ির বা কলসীর ভিতরে চূণের লেপ দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত কিংবা ভাল করিয়া ধুইয়া উনানের উপর ধুঁয়ায় রাখা ভাল। প্রত্যেক দিন গাছে ভাঁড় ঝুলাইবার সময় কাটাস্থান জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। জ্বাল দিবার সময় রসের সহিত সামান্য তেঁতুলগোলা জল অথবা ফটকিরী দিলে গুড়ের রং অতি উজ্জ্বল হয়। ইহার পর আকের রসের ন্যায় জ্বাল দিয়া গুড়ের গাদ কাটাইয়া দানাদার গুড় ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে খেজুর রস—মধুর, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মূত্রকারক ও বাতশ্লেষ্মানাশক। খেজুর গাছের মাথার কোমল পত্র বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বমন-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও মূত্ররোগ নিবারক।

তাল

বঙ্গদেশে তাল অতি সাধারণ বৃক্ষ। এই গাছ শাখা-প্রশাখা বিহীন হইয়া সরলভাবে উর্দ্ধদিকে ২৫।৩০ হাত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

খেজুর গাছের যেমন মস্তকস্থ পত্রের নিম্নে চাঁচিয়া রস বাহির করিয়া লওয়া হয়, তালগাছের সে প্রণালীতে রস বাহির করা যায় না। তালগাছ বড় হইলে উহার অগ্রভাগে অনেকগুলি মোচা বাহির হয় এবং নারিকেলের কাঁদির স্থায় প্রত্যেকটিতে অনেকগুলি করিয়া ফল ধরে। তালের রস পাইতে হইলে ক্ষুদ্রাবস্থায় (ফল ধরিবার পূর্ব্বে) এই মোচার অগ্রভাগ কাটিয়া তাহাতে চূণ লাগান আবশ্যক। কিছুদিন পরে উহা পুনরায় চাঁচিলে তাহা হইতে রস বাহির হইয়া থাকে। তখন একটি কলসী বা ভাঁড় তথায় ঝুলাইয়া দিতে হয়। গাছ কাটিবার এবং রস হইতে গুড় ও চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী খেজুরের স্থায় একই প্রকার।

তালের ফলগুলি গোলাকার। কচি অবস্থায় উহাতে এক প্রকার পাতলা শাঁস জন্মে এবং শাঁসের ভিতরে সামান্য পরিমাণে সুমিষ্ট জল থাকে। তালশাঁসের জল বিশেষ উপকারী। পক্ক অবস্থায়ও তাল ভক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ক তালের ভিতরকার বর্ণ হরিদ্রাভ। প্রত্যেকটি তালে দুই কিংবা

তিনটি আঁটি থাকে। পক্ব তালের ভিতরে ছিবড়া চাঁচিয়া উহা হইতে ঘন ক্ষীরের ন্যায় একপ্রকার মোলামেয় পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া হয়। উহা সামান্য চূণের সহিত মিশাইয়া ঘাঁটিয়া কোন পাত্রের উপর রাখিলে ২।১ ঘণ্টার মধ্যে উহা বসিয়া গিয়া পাটালির ন্যায় হইবে। অনেকে আদরের সহিত ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। পক্ব তালের মধ্যস্থিত ক্ষীরাংশ হইতে নানা-বিধ পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাকা তালের আঁটি কিছুদিন সেঁতসেতে জায়গায় রাখিলে উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুরগুলি বৰ্দ্ধিত হইলে নারিকেলের ন্যায় উহার ভিতরে ফোঁপল জন্মে। ইহা অতি সুস্বাদু এবং মুখরোচক।

তালপাতা হইতে পাখা তৈয়ারী হইয়া থাকে। অধিক দিনের পুরাতন পক্ব গাছের কাণ্ড চিরিয়া উহা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে আড়কাটরূপে কড়ির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তালগাছের গোড়ার দিককার খানিকটা অংশ বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে তেলো ডোঙ্গা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তালের গুড় হইতে মিছরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তালের রস হইতে একপ্রকার তাড়ি প্রস্তুত হয়। উহা অতি মত্ততাজনক।

আয়ুর্ব্বেদমতে কচি তালশাঁস—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বলকারক এবং দাহ, পিত্ত, বায়ু ও ক্ষয়রোগে উপকারক। তালশাঁসের মধ্যস্থ জল গুরুপাক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও আশু হিক্কানিবারক। পক্ব তাল

বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মূত্রকারক। তালের মজ্জা বা মাথী—স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘুপাক, বিরেচক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক এবং বাত ও পিত্তনাশক। তালের জটা রুক্ষ ও ক্ষতরোগনিবারক। তালের আঁটি-শাঁস—শীতল-মধুর-রস, গুরুপাক ও মূত্রকারক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুক্‌খুকে কাসি হইলে দুগ্ধের সহিত সামান্য তালের মিছরি মিশাইয়া খাওয়াইলে আশু ফল পাওয়া যায়।

যে-সমস্ত বৃক্ষ হইতে পূর্ব্বে চিনি প্রস্তুতের উপায় লিখিত হইয়াছে ঐ সমস্ত বৃক্ষ ব্যতীত নিম্ব, মহুয়া, ক্যারিওটা, আরেঙ্গা, ম্যাফল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল, নিম্ব ও মহুয়ায় চিনির পরিমাণ অতি অল্প। ক্যারিওটা ইউরেন্স খেজুর জাতীয় উদ্ভিদ্। সিংহলে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে ম্যাফল এবং আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে আরেঙ্গা প্রভৃতি গাছ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তালের পাতা ও ডগা হইতে যেরূপ পাখা প্রস্তুত হয় সেইরূপ তালের ডগা হইতে একপ্রকার কঠিন ও শক্ত আঁশ পাওয়া যায়। উক্ত আঁশ হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ঐ দড়ি অত্যন্ত শক্ত ও দীর্ঘদিন জলে ও শিশিরে পচে না এবং রৌদ্রেও ক্ষতি করে না। ধীবরগণ এই আঁশ ও বাঁশের শলাকা দ্বারা নানাবিধ মৎস্য শিকারের যন্ত্র প্রস্তুত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

তৈলবর্গ (Oil Crops)



চিনাবাদাম

চিনাবাদাম শুঁটীধারী গাছের অন্তর্গত। ইহা তৈলপ্রদ বীজের মধ্যে পরিগণিত। ইহা হইতে উত্তম তৈল প্রস্তুত হয় এবং উহা বাদাম তৈলের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেক স্থলে চিনাবাদামের তৈল ঘৃতের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। পণ্ডিচেরী, ছোট জাপান, বড় জাপান প্রভৃতি তিন-চারি প্রকারের চিনাবাদামের চাষ এদেশে হইয়া থাকে। এই বাদাম হইতে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ তৈল বাহির হইয়া থাকে। তৈল বাহির করিয়া লইলে ইহার যে ছিবড়া বা খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা গবাদি পশুর একটি উপাদেয় খাদ্য। চিনাবাদাম অতি মুখরোচক ও সুস্বাদু। বাজারে বহুল পরিমাণে ইহার আমদানি হইয়া থাকে।

সারযুক্ত দোআঁশ অথবা উঁচু বেলে জমিতে ইহা ভাল জন্মে। দোআঁশ মাটিতেও ইহার চাষ চলিতে পারে। ইহার জমিতে গোবরসার, কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়া ও চূণ ব্যবহার

করা যাইতে পারে। বেলে জমিতে বিঘাপ্রতি ১২।১৪ গাড়ী গোবর, ১ মণ হাড়ের গুঁড়া বা সুপারফস্ফেট, ৪।৫ মণ কাঠের ছাই ও ১০।১২ সের চূণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। এক বৎসর ইহার জমিতে সার প্রয়োগ করিলে ২।৩ বৎসর আর সার প্রয়োগের আবশ্যক করে না। অন্য সার প্রয়োগের পূর্ব্বে মাটির পাট করিবার সময় চূণ ব্যবহার করা উচিত।

চিনাবাদাম অধিক পরিমাণে বৃষ্টির জল সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য যে জমিতে চিনাবাদামের চাষ হয় তাহা উঁচু জমি হইলেই ভাল হয়। চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে পাহাড়ের গায়ে বালু জমিতেও চিনাবাদামের চাষ ভাল হইয়া থাকে।

জমিতে কার্পাস লাগাইয়া তাহার মাঝে মাঝে চিনাবাদামের বীজ বপন করা চলে। এক জমিতে ক্রমান্বয়ে অধিক কাল ইহার চাষ করা উচিত নয়। বর্ষার ২।৩ মাস ভিন্ন বৎসরের যে-কোন সময়ে ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর একবার ইহার চাষ করা যায়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসই চিনাবাদামের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চিনাবাদামের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁটী আছে। একপ্রকার বীজাণু উহার মধ্যে বাস করে। উহারা গাছের প্রধান খাদ্য সোরাজান সংগ্রহ করিয়া মাটিতে জমা করে এবং তাহাতে জমি খুব উর্ব্বরা হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ১ ফুট অন্তর

লাইন দিয়া ৯ ইঞ্চি ব্যবধানে ইহার বীজ বপন করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত করিবার এক মাস পূর্ব্বে চূণ ছিটাইতে হইবে এবং জমি-কর্ষণ করিবার সময় হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া উহা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ৭।৮ সের বীজ লাগে এবং বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০।১২ দিন সময় লাগে। চিনাবাদাম লাগাইবার পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। নূতন খোসা-ছাড়ান বীজ ব্যবহার করা উচিত, কারণ ইহা হইতে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

চারা বাহির হইবার পর বড় হইলে গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমির উপরি-ভাগে গাছে যে ফুল জন্মে উহাতে বাদাম ধরে না। উহা বাঁজা ফুল। গাছের শাখাপ্রশাখাগুলি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পত্রগ্রন্থি হইতে সরু সরু শিকড় উদ্গত হয়। এই শিকড়গুলিকে মাটি দিয়া চাপা দেওয়া আবশ্যক, কারণ এই শিকড়গুলিই চিনাবাদামের শশু অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। মাটি চাপা দিলে অল্পদিনের মধ্যে উহা স্ফীত হইয়া বাদামে পরিণত হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফল জন্মে।

বিঘাপ্রতি ইহার ফলন প্রায় ৭।৮ মণ এবং এক বিঘা জমিতে ২৫।৩০ মণ গবাদি পশুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। এক-একটি গাছে শতাধিক বাদাম জন্মে এবং প্রত্যেক শুঁটীতে ২।৩টি করিয়া দানা থাকে। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, জমিতে একবার জন্মাইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা ফসল দিতে থাকে

কিন্তু একই জমিতে ক্রমান্বয়ে একই ফসল উৎপন্ন করিতে থাকিলে মৃত্তিকার স্বভাব খারাপ হইয়া যায় এবং জমির উর্ব্বরা-শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে ; সুতরাং ৫।৬ বৎসরের বেশী ইহা জমিতে রাখা উচিত নয়। জমি হইতে ইহা উঠাইয়া লইবার পর কিছুদিন রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়।

জমি হইতে সমস্ত শুঁটী বাছিয়া লইতে পারা যায় না। এই-জন্য কোদালি দ্বারা কোপাইয়া মাটি আলগা করিয়া জমি হইতে ইহার শুঁটীগুলি বাছিয়া লইতে হয়। ফলগুলি বাছিয়া লইবার পর মাটি ঈষৎ আলগাভাবে চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমি হইতে সমস্ত শুঁটী খুটিয়া সংগ্রহ করা যায় না। মাটি আলগা-ভাবে চাপা দিলে ঠিক সময়ে মৃত্তিকাস্থিত শুঁটীগুলি হইতে নূতন চারা বাহির হইবে। ঘানিতে বা কলে পিষিয়া ইহার তৈল বাহির করা হয়। অন্য এক প্রকারে ইহার তৈল বাহির করিতে পারা যায়। বাদামের খোলা ছাড়াইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া কোন মাটির হাঁড়ির তলায় ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে রাখিতে হয় এবং অন্য একটি পাত্রে জল চড়াইয়া উনানে ঝুলাইতে হইবে ও ঐ বাদাম সমেত হাঁড়িটি উক্ত জলের পাত্রের উপরে রক্ষা করিয়া মুখে সরা চাপা দিতে হইবে। এইভাবে অর্দ্ধঘণ্টাকাল ভাপাইয়া (vapour-এ সিদ্ধ করিয়া) লইবার পর ঐ ভাপান বাদাম কোন শক্ত পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া জাঁক দিয়া যেরূপে ছানার জল বাহির করা হয় ঐরূপে রক্ষা করিতে হইবে। বাদাম সমেত কাপড়ের উপরে যাঁতা বা ঐরূপ কোন

ভারি দ্রব্য চাপা দিলে অনায়াসে ও শীঘ্র তৈল নির্গত হইতে থাকিবে। এইভাবে এক মণ বাদাম হইতে ঘণ্টায় ৫।৬ সের তৈল বাহির হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে চিনাবাদাম—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহার তৈল—গুরুপাক, সারক, বলকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে হিতকর।

সরিষা বা সর্ষপ

সর্ষপকে চলিত কথায় সরিষা কহে। সমগ্র ভারতে নানা জাতীয় তৈলপ্রদ বীজের আবাদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বঙ্গে সরিষাই অন্যতম। সরিষা হইতে বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন হয় এবং ঐ তৈলই আমাদের রন্ধনকার্য্যের প্রধান উপাদান। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সরিষার তৈল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে কোথাও কোথাও তিল তৈল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় কিন্তু কোনটাই সরিষার তৈলের ন্যায় তত উপাদেয় এবং প্রীতিদায়ক নহে। মহুয়ার তৈল সাঁওতালদের রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বঙ্গে তিলের তৈল, মান্দ্রাজে নারিকেল তৈল এবং ভারতের মধ্য-প্রদেশে সোরগোঁজার তৈল পাককার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

রাই, শ্বেত এবং টোরিয়া বা মাঘি এই তিন জাতীয় সরিষা আমাদের দেশে সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। সর্ষপের কচি ডগা ও পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পোড়া, সিদ্ধ প্রভৃতি তরকারীতে রাই সর্ষপের গুঁড়া বা বাটনা মাখাইয়া ভক্ষণ করিলে অতি মুখরোচক হয় এবং অধিক সুস্বাদু লাগে। চট্টগ্রাম ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্বেত সরিষা চাষের প্রচলন আছে। শ্বেত সরিষা হইতে শতকরা ৩৩ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। টোরি বা মাঘি সরিষা অন্য জাতীয় সরিষা অপেক্ষা আশু পরিপক্ক হয়। উহা হইতে শতকরা ৩২ হইতে ৪০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। রাই বা লাই নামক সরিষা হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহার ঝাঁজ অন্য জাতীয় সরিষা অপেক্ষা অধিক তীব্র। ইহাতে শতকরা ২১ হইতে ১৮ ভাগ তৈল আছে।

সর্ষপের সহিত সোরগুজা মিশাইলে তৈলের পরিমাণ অধিক হয় এবং উহাতে ভেজাল আছে বলিয়া সহজে ধরিতে পারা যায় না। একারণ বাজারের সরিষার তৈল প্রায় কখনও খাঁটি হয় না।

তিল, তিসি, সোরগুজা প্রভৃতির ন্যায় সরিষাও বর্ষার পরে ভাদ্র হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে বপন করিতে হয়। সাধারণতঃ ভাদুই ফসল জমি হইতে উঠাইয়া লইবার পরই জমিতে সরিষা বপন করা হয়। বিঘাপ্রতি /১ সের বীজ লাগে এবং ১½-২ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। সরিষা ও কলাই জমিতে একসঙ্গে একটু আগু-পিছু বপন করিতে পারা যায়। এইরূপভাবে বপনে

উহাদের ফসল কমে না—সমানই হয়। সরিষা কলাইএর পূর্ব্বে পাকে। সাধারণতঃ সরিষা পাকিবার এক মাস পরে কলাই পরিপক্ক হয়।

বর্ষার পূর্ব্বে বীজ বুনিলে বৃষ্টিপাতে মাটি চাপা পড়িয়া যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরও বৃষ্টি হইলে জমিতে কাদা হইয়া গাছের গোড়া আট্‌কাইয়া চারা জন্মাইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা জন্মিবার পর ও বৃষ্টি হইলে অত্যধিক বর্ষণে শিকড় কাটিয়া যায় এবং চারাগুলি মাটিতে শুইয়া পড়ে। এইজন্য বর্ষার শেষে জমিতে সরিষার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। সচরাচর ভাদুই ফসল জমি হইতে তুলিয়া লইবার পর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করা হয়।

উচ্চ দোআঁশ, এঁটেল, বালুকাময় এবং প্রস্তরময় জমিতেও সরিষা জন্মিয়া থাকে। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি ২৫।৩০ সের হাড়ের গুঁড়া, ৫।৬ মণ খইল অথবা ২০।২৫ মণ গোবর ব্যবহার করা চলে। ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই। জমি ৩।৪ বার কর্ষণ করিয়া গোবরসার, খইল অথবা হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ভাদ্র হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে সরিষা বীজ পাতলা-ভাবে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। বীজ যাহাতে সমভাবে ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে এইজন্য সামান্য শুষ্ক ঝুরা মাটি বা বালি উহার সহিত মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে সরিষা বীজ পাকিতে আরম্ভ হয়। বীজ পরিপক্ক হইলেই উহাদিগকে আর ক্ষেতে না রাখিয়া শীঘ্র

শীঘ্র কর্ত্তন করা আবশ্যক। সরিষার বীজ একপ্রকার পাতলা খোসার আবরণে ঢাকা থাকে। বীজগুলি পাকিয়া শুষ্ক হইলে বীজকোষ ফাটিয়া সরিষাগুলি জমিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ বীজ এইরূপে নষ্ট হয়। এইজন্য বীজগুলি সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইবার ২।৪ দিন পূর্ব্বে গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া কোন পরিষ্কৃত আবৃত স্থানে ৫।৭ দিন স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। এইরূপভাবে ৬।৭ দিন রাখিলে বীজে সামান্য রস থাকিলেও তাহা শুকাইয়া যায় এবং সরিষা লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ বা ধূসর-বর্ণ ধারণ করে। তখন উহাদিগকে মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

এক মণ সরিষা হইতে ১৪।১৫ সের পর্য্যন্ত তৈল উৎপন্ন হয়। দেশী ও শ্বেত সরিষা হইতে ১৪।১৫ সের এবং রাই সরিষা হইতে ১০।১২ সের তৈল পাওয়া যায়। ঘানি অথবা কলে পিষিয়া বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়। বীজ হইতে তৈলাংশ বাহির করিয়া লইবার পর ছিবড়া বা খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে। উহা গবাদি জন্তুদিগের খাদ্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহপালিত পশুদের পক্ষে ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। উৎকৃষ্ট সার হিসাবেও ইহা জমিতে ব্যবহার করা চলে।

আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ সরিষা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। বিলাতে সাবান প্রস্তুত, রং প্রস্তুত এবং কলকব্জা পরিষ্কার করিবার জন্য ইহার তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে সরিষা—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহবৃদ্ধিকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে উপকারক। শ্বেত সরিষা—রুচিকর, ত্বক্‌দোষনাশক এবং ব্রণ, বাত, রক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক। সর্ষপ তৈল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, কফ, মেদ, অর্শ, কণ্ডু, ক্রিমি, ব্রণ, কর্ণরোগ ও শিররোগে উপকারক।

সরিষা গাছে মেড়ি পোকা ভয়ানক উপদ্রব করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার প্রজাপতির কীড়া। ডিম ফুটিলে কীড়ারা পাতা জড়াইয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং গাছে ফুল ও শুঁটী ধরিলে তাহা খাইয়া নষ্ট করে। কীড়াগুলি কিছুদিন পরে পুত্তলির আকার ধারণ করে ও পরে তাহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। কালমেড়ি অন্য একপ্রকার পতঙ্গও সরিষার পাতা খাইয়া নষ্ট করে। গাছ ঝাড়া দিলেই কাল মেড়ির কীড়ারা মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তখন উহাদিগকে মারা চলে। কেরোসিন মিশ্রিত জল পিচকারী দ্বারা গাছে ছিটাইয়া দিলে মেড়ির কীড়া নষ্ট হয়। রাই সরিষারই উপজাতি। ইহা হইতে বিখ্যাত সর্ষপ-বাষ্প যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

কুসুম ফুল

বঙ্গদেশে ইহার চাষ কদিচ্ দৃষ্ট হয় কিন্তু ইহার চাষ অতিশয় লাভজনক। অন্যান্য তৈলপ্রদ বীজের ন্যায় কুসুম ফুলের বীজ হইতেও উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু সরিষার তৈলের ন্যায় বঙ্গদেশে ইহা আহারার্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন নাই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশের লোকেরাই ইহা আহারার্থে ব্যবহার করে। অভ্যাস না থাকিলে কুসুম ফুলের বীজোৎপন্ন তৈলে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া খাইলে পেটের অসুখ হয়। সাধারণতঃ রং-এর সহিত ইহার তৈল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া চট কিংবা মোটা কাপড়ের উপর লাগাইয়া ত্রিপল, ওয়াটার প্রুফ (Waterproof) প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন দেওয়ালের গাত্রে প্রস্তর বসাইবার জন্য এবং কাঁচ জোড়া দিবার জন্য ইহার আবশ্যক হয়। সরিষা, নারিকেল, কার্পাস, তিসি, চিনাবাদাম প্রভৃতির খইলের ন্যায় ইহার খইলও গবাদি জন্তুদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আশ্বিন কর্ত্তিক মাস ইহার বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। নিম্ন চর-জমিতে গোবর, খইল ও ছাই সার মিশ্রিত করিয়া ইহার চাষের জমি প্রস্তুত করা চলে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিঘাপ্রতি ৴১॥০ সের বীজ পাতলা ভাবে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। ছোলা, যব প্রভৃতি রবি শস্যের সহিত

ইহার বীজ বপন করা চলে। সাধারণতঃ মাঘ ফাল্গুন মাসে ইহার বীজ পরিপক্ক হইয়া থাকে। উত্তমরূপে জন্মাইতে পারিলে বিঘাপ্রতি প্রায় ৪ মণ বীজ পাওয়া যায়। কাঁটাযুক্ত পাতা ও গাছের জন্য ইহাতে গবাদি পশুর উপদ্রব হয় না।

আয়ুর্ব্বেদমতে কুসুম বীজের তৈল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, গুরুপাক, ত্রিদোষকারক, ক্রিমিনাশক, চক্ষুর অহিতকর এবং বল ও পুষ্টির হানিকারক।

রেড়ি বা রেঢ়

ইহার বীজ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহাকে এরণ্ড অথবা রেড়ির তৈল কহে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার গাছ অল্প-বিস্তর জন্মিতে দেখা যায় কিন্তু রীতিমত চাষ করিতে পারিলে ইহা একটি লাভের ফসল। ইহার তৈল দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ না হইলেও নানাপ্রকার আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ জ্বালানিকার্য্যে, কল-কারখানার কলকব্জা পরিষ্কার করিতে এবং উৎকৃষ্ট কেশতৈলে ইহার ব্যবহার আছে। শোধিত রেড়ির তৈল (Refined Castor Oil) জোলাপরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যন্ত্রাদির ক্ষয় নিবারণের জন্য এই

তৈল Lubricant হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহার খইল গবাদি জন্তুদিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত না হইলেও উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জসারের মধ্যে রেড়ির খইলই উৎকৃষ্ট এবং তেজস্কর সার।

বড় এবং ছোট ভেদে রেড়ি দুই জাতিতে বিভক্ত। বড় জাতীয় বীজ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে বপন করিলে পৌষ মাঘ মাসে উহার ফল পাকিয়া থাকে। ছোট জাতীয় বীজ ভাদ্র আশ্বিন মাসে বপন করিলে চৈত্র মাসে উহার ফল পাকিয়া থাকে। এক বৎসর গাছ জন্মিলে কয়েক বৎসর বিনা চাষে ফসল পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ফলন কম হয়।

উচ্চ দোআঁশ অথবা এঁটেল জমিতে ইহার চাষ করিতে পারা যায়। পুরাতন পাঁকমাটি এবং গোবরসার মিশ্রিত করিয়া ইহার জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক ৬ ফিট অন্তর লাইন দিয়া ৪ ফিট ৪৷৷০ ফিট ব্যবধানে ২৷৩ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া এক-একটি মাদা প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রতি মাদায় ২৷৩টি করিয়া বীজ বপন করিতে পারা যায়। ছোট জাতীয় বীজগুলি ৩ ফিট অন্তর লাইন দিয়া ২ ফিট ব্যবধানে বপন করা চলে। বপনের সময় প্রত্যেক গর্ত্তে সামান্য পরিমাণ খইলচূর্ণ অথবা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে গাছগুলি অতি তেজাল হইয়া উঠে। চারা বাহির হইলে প্রতি মাদায় একটিমাত্র সবল চারা রাখিয়া বাকিগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলা

আবশ্যক। অবশিষ্ট গাছগুলি অন্যস্থানে লাগাইতে পারা যায়। ক্ষুদ্রাবস্থায় গাছগুলিতে আবশ্যকমত জল-সেচন প্রয়োজন। বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের বীজ লাগে এবং ৪।৫ মণ ফলন হইয়া থাকে।

এণ্ডি কীট বা এক জাতীয় রেশমী পোকা পালনার্থে অনেক স্থানে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। ইহার পাতা দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় কিন্তু এ নিমিত্ত বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুবই অল্প হইয়া থাকে। বাংলায় বহুস্থানে বিনাচাষেও এই গাছ জন্মাইতে দেখা যায়।

এরণ্ড তৈল—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বেদনা-নাশক, বায়ুনিবারক এবং কফ, উদর, কোষবৃদ্ধি, কটী প্রভৃতি স্থানের শোথ ও বেদনা, আমদোষ, ক্রিমিদোষ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

তিল

ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ শস্য। বাঙ্গলায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেবকার্য্য, শুভকার্য্য এবং তর্পণাদিতে ইহা একটি বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য। তিল হইতে একপ্রকার সন্দেশ এবং নানাবিধ পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক রোগে

কবিরাজী ঔষধের অনুপান হিসাবেও তিল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তিল হইতে উৎকৃষ্ট কেশতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকেরা তিলের তৈল আহারার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। তিল তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তিল তৈল জ্বালানিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ শ্বেত, কৃষ্ণ এবং রাই এই তিন প্রকার তিল এদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণ তিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্বেত মধ্যম এবং রাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

শ্বেত তিলের বীজ আষাঢ় মাসে বপন করিয়া পৌষ মাঘ মাসে ফসল উত্তোলন করিতে হয়। কৃষ্ণ তিল শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বপন করিয়া মাঘ ফাল্গুন মাসে, এবং রাই তিল মাঘ ফাল্গুন মাসে বপন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল উত্তোলন করিতে হয়।

তিল প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মিতে পারে কিন্তু যে জমিতে চূণ ও লবণের ভাগ অধিক তাহাতে তিল জন্মে না। উচ্চ দোআঁশ মৃত্তিকা ইহার পক্ষে প্রশস্ত। ইহার জমিতে সার প্রয়োগের বিশেষ আবশ্যক হয় না কিন্তু জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি দেড় সের দুই সের বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা দরকার। বীজ যাহাতে ক্ষেতে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে এইজন্য সামান্য শুষ্ক ঝুরা মাটি অথবা বালি বীজের সহিত মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অধিক ঘন করিয়া বীজ বপন করিলে ভাল চারা জন্মে না।

৬।৭ দিনের মধ্যে উহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ হইতে সমস্ত চারা অঙ্কুরিত হইলে স্থানে স্থানে যদি ঘনভাবে চারা জন্মে তাহা হইলে কতকগুলি গাছ তুলিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিলের জমিতে জল-সেচনের আবশ্যক হয় না। তবে জমি নিতান্ত নিরস ও শুষ্ক হইলে আবশ্যক মত জল-সেচন করিতে হইবে। বৃষ্টির জলে তিল গাছের ক্ষতি হয় না কিন্তু গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। কৃষ্ণ তিল পৌষ মাঘ মাসেই পাকিতে আরম্ভ হয়। তিলের শুঁটীগুলি গাছে পাকিয়া গেলে গাছ সমেত কাটিয়া আনিয়া কোন পরিষ্কৃত আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে জাগ দিয়া রাখিতে হয়। পরে উহা মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া লইতে হয়। সাদা ও রাই তিল বিঘাপ্রতি প্রায় ৩।৪ মণ এবং কৃষ্ণ তিল বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ ফলিয়া থাকে। অন্যান্য তৈলপ্রদ বীজের ন্যায় ইহা ঘানিতে অথবা কলে পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। তিলের খইল গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদমতে তিলের তেল—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কান্তিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, কেশের উপকারক, শ্রান্তিনাশক, ধাতুপুষ্টিকারক, কফ্‌বর্দ্ধক, বায়ু-নাশক এবং ক্রিমি, কণ্ডু ও ব্রণরোগনিবারক।

সরগুজা

সরগুজা হইতেও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল অন্যান্য তৈলের ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও অনেকস্থলে সরিষা প্রভৃতি তৈলের সহিত ভেজাল দিয়া বাজারে আমদানি করা হয়।

ইহার চাষ অতি সহজসাধ্য। পাহাড়ে, বেলে, এঁটেল, কাঁকরওয়ালা অসার জমিতেও ইহার চাষ করা চলে। ইহার জন্য বিশেষ সার প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। অন্যান্য রবিশস্যের মধ্যে ইহা খুব শীঘ্র ফলিয়া থাকে। আশু ধান্য উত্তোলন করিবার পর শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে ইহার বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। অতিবৃষ্টি ইহার পক্ষে মারাত্মক। ইহার বীজ দেখিতে ক্ষুদ্র জাতীয় সূর্য্যমুখী ফুলের বীজের ন্যায়। বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের বীজ লাগে এবং ২।৩ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। পৌষ মাঘ মাসে ইহার ফসল উত্তোলনের উপযোগী হইয়া থাকে। ভারতের মধ্য-প্রদেশে ইহার তৈল ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল গবাদি পশুর খাদ্যরূপে এবং জমির উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসি বা মসিনা

ইহা একপ্রকার রবিশস্য। তিসি হইতে সুন্দর তৈল এবং উৎকৃষ্ট সূত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তৈলের জন্যই এদেশে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র কয়েকটি স্থানে, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান, মধ্য-প্রদেশ, জব্বলপুর এবং নর্ম্মদা নদীর উপকূলবর্ত্তী ভূমিতে কতক পরিমাণে সূত্রের নিমিত্ত ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে তৈলের নিমিত্ত ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে কিন্তু তৈল অপেক্ষা ইহার সূত্রের মূল্য অধিক। কেবলমাত্র তৈলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ইহা হইতে সূত্র এবং তৈল উভয়ই উৎপন্ন করিতে পারিলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। তিসির সূত্র সূক্ষ্ম এবং রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্ত্রশিল্পে এবং টোয়াইন, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, মিশর এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সূত্রের নিমিত্ত ইহার চাষ প্রচলিত আছে। তিসি গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

তৈলের নিমিত্ত ইহার চাষে লাভ হয় না এমন নহে কিন্তু সূত্রের নিমিত্ত চাষে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যে রং ও পালিশ লাগাইবার জন্য এবং

ছাপার কালী ও নরম সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রচুর তিসির তৈলের প্রয়োজন হয়। তিসির খইল সার হিসাবে এবং গবাদি জন্তুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইহা হইতে ভাল লিনেল নামক কাপড় প্রস্তুত হয়। যে সমস্ত গাছ ৩।৪ ফিট লম্বা হয় সেইগুলি হইতে সূত্র ভাল হয়। ঢাকা কৃষিগবেষণাগার হইতে যাহাতে সহজে ইহার সূত্র প্রস্তুত করা যায় তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। এদেশে পূর্ব্বে ইহার সূত্র হইত না, বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

সাধারণতঃ দুই জাতীয় তিসি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শ্বেত জাতীয় তিসির তৈলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। সারযুক্ত এঁটেল অথবা দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। যে জমিতে নীল ভাল জন্মে তথায় ইহার চাষ করা যাইতে পারে। তিসি ও ছোলা একই জমিতে মিশ্রিতভাবে চাষ করা চলে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমি গভীরভাবে কর্ষণ পূর্ব্বক মাটি চূর্ণ করিয়া উহাতে সার মিশ্রিত করিতে হইবে। বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গো-মহিষাদির মলমূত্র অথবা আবর্জ্জনাদি পচা সার ইহার জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ৩-৩৷৹ সের বীজ লাগে। তৈলের নিমিত্ত চাষ করিতে হইলে ইহার বীজ যব, গম, ছোলা প্রভৃতির সহিত মিশ্রভাবে বপন করা যাইতে পারে। উহাতে বীজ কম লাগে কিন্তু সূতার নিমিত্ত ইহার চাষ করিতে

হইলে মিশ্রভাবে বপন করা উচিত নহে। সূতার নিমিত্ত বীজ অর্দ্ধপক্কাবস্থায় এবং তৈলের জন্য বীজ সম্পূর্ণ পক্ক হইলে উঠান আবশ্যক। সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে গাছগুলি সমূলে উপড়াইয়া এবং তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে উপরিভাগ হইতে গাছগুলিকে কাটিয়া লওয়া আবশ্যক। বীজ সম্পূর্ণ পক্ক হইলে সে গাছের সূতা মোটা এবং মলিন বর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য শুভ্র ও সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে গাছগুলিতে ফল ধরিবার কিছুদিন পরে এবং বীজ সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক এবং পরিষ্কৃত স্থানে ৫।৬ দিন জাঁক দিয়া রাখা আবশ্যক।

পক্ক বীজ মাড়িয়া, ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লইয়া কলে বা ঘানিতে চাপাইয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। শিকড় সমেত তিসির গাছগুলি ছোট ছোট বাণ্ডিল বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া পচাইতে দিতে হয়। ১০।১২ দিন পরে গাছের ছালগুলি পচিলেই উহা পাট, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির ন্যায় কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ২॥০-৩ মণ দানা ও ১॥০-২ মণ সূতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, বলকারক এবং কফ, বাত ও ব্রণনাশক। পোড়া ঘায়ে তিসির তৈল ও চূণের জল একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা ও ঘায়ের উপশম হয়। মসিনার বীজ পুলটিস দিবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য তৈলপ্রদ শস্য

উপরোক্ত তৈলপ্রদ বীজ ব্যতীত নারিকেল*, পোস্তদানা, নিম, রয়না, মহুয়া ও সূর্য্যমুখীর বীজ হইতেও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পক্ক ঝুনা নারিকেলের ভিতরকার শ্বেতবর্ণ শাঁস বাহির করিয়া লইয়া উহা রৌদ্রে শুকাইয়া ঘানিতে বা কলে পিষিয়া নারিকেলের তৈল প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী লবণাক্ত ভূমিতে, বিশেষতঃ মালয়, সিংহল, সিঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বহু নারিকেল গাছ জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত স্থানের নারিকেল ফল বাঙ্গলা দেশের উৎপন্ন নারিকেল ফল অপেক্ষা আকারে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। নারিকেল তৈল আমাদের দেশে কেশতৈল রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে নারিকেল তৈল পাককার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নারিকেলের শাঁসের ছিবড়া বা খইল গবাদি জন্তুর উত্তম খাদ্য। শুষ্ক নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি, কাছি, পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের মালা হইতেও হুঁকার খোল, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

---

* ইহার চাষের বিষয় সবিশেষ জানিতে হইলে লেখকের 'আদর্শ ফলকর' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

নারিকেল তৈল—শীতল, গুরুপাক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, ক্ষতনিবারক, বাত ও পিত্তনাশক এবং শ্বাস, কাশ ও ক্ষয়রোগের উপশমকারক। নারিকেল তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মহুয়ার তৈল সাঁওতালেরা আহারার্থে ব্যবহার করে, এবং নিম্বের তৈল উহারা মাখিয়া থাকে। নিম্ব, রয়না ও মহুয়ার তৈল জ্বালানিকার্য্যে ও সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত খৈল গবাদি জন্তুর অখাদ্য হইলেও জমিতে উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। মহুয়া ও নিম্বের খোল তিক্ত বলিয়া ইহা অতি উৎকৃষ্ট কীটরোধক সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূর্য্যমুখীর বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা সাবন প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহা জ্বালানি-কার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈলের নিমিত্ত এদেশে ইহার চাষ দৃষ্ট হয় না। রাশিয়া, চীন, টার্কি প্রভৃতি দেশে ইহার অল্প-বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। বীজ হইতে তৈলাংশ বাহির করিয়া লইলে যে ছিবড়া বা খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা গবাদি জন্তুদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সূর্য্যমুখীর গাছ হইতেও একপ্রকার মোটা সূতা বাহির করিতে পারা যায়। ইহার চাষ-প্রণালী ঢেঁড়শের ন্যায়।

টাং গাছ

চীন দেশের এ্যালুরাইটস্ ফরডাই (Aleurites Fordii) এবং A. Montana নামক গাছ হইতে বর্ত্তমানে জগদ্বিখ্যাত রং ও বাণিসের উপযোগী টাং তৈল পাওয়া যায়। রেড়ি প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে যেমন তৈল নিষ্কাশিত হয় ইহার ফল হইতেও সেইরূপ তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত গাছ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও গুণে প্রথমোক্ত জাতির সমকক্ষ নহে। এই গাছ নাতিগ্রীষ্ম-প্রধান মধ্য ও পশ্চিম চীনে, বিশেষ করিয়া ইয়াংটিজ উপত্যকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে চীনদেশস্থ এই বৃক্ষের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-ইউরোপে চীন দেশের টাং তৈল ব্যবসায় হিসাবে প্রথম প্রচলিত হইয়া আজ বার্ণিশ রঙের প্রধান উপকরণরূপে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই তৈলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রং খুব দ্রুত শুষ্ক হইয়া যায় এবং যে-সমস্ত কাজে জলরোধ ও উচ্চ পালিশ ও চক্‌চকে রং প্রয়োজন সেইরূপ স্থানে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন তৈল আর নাই। এই তৈল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-নিরোধক আবরণের রঙের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

চীনের গিরিতটপ্রস্থের সমতল ভূমিতে নদীজল বাহিত পলিমাটিতে এই বৃক্ষ স্বচ্ছন্দে জন্মে বলিয়া জানা গিয়াছে কিন্তু নিম্ন ভূমিতে ইহা কিরূপে জন্মে তাহা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের কোন জঙ্গলে অধিকতর তৈলসম্ভারযুক্ত টাং গাছের সন্ধান মিলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে চীনদেশ হইতে আনীত চা গাছ যখন আসাম অঞ্চলে উৎপন্ন করিয়া বর্ত্তমানে চীনদেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চা উৎপাদিত হইতেছে, তখন চীনদেশের এই টাং গাছ আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপাদন করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আসামের বহু চা-বাগানে এই গাছের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার চাষ যে বেশ লাভজনক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

ডাইল শস্য (Pulses)

অড়হর

ইহা একপ্রকার শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ্। ছোলা, মটর, সীম প্রভৃতি শস্য এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অড়হর সাধারণতঃ দুই জাতীয়, মাঘী ও চৈতালি। একই সময়ে অড়হরের বীজ লাগাইলে এক জাতি মাঘ ফাল্গুন মাসে, অন্য জাতি চৈত্র মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়। চৈতালি অড়হর অধিক ফলে এবং ইহার বীজও মাঘি অড়হর অপেক্ষা আকারে বড়। মাঘি অড়হর সহজে বিবর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু চৈতালি অড়হর নষ্ট না হইয়া একই অবস্থায় অনেক দিন থাকে।

এঁটেল অথবা দোআঁশ জমিতে ইহার চাষ করা চলে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। গাছগুলির পরস্পর ব্যবধান অন্ততঃ দুই হাত থাকা বাঞ্ছনীয়। ফল পাকিলে গাছগুলি তুলিয়া আনিয়া মাড়িয়া, ঝাড়িয়া ও বাছিয়া বীজগুলি পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে এবং ৫-৬ মণ ফলন হয়।

অড়হর গাছে ফুল ধরিবার পর গাছগুলি কাটিয়া গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে উহা অনেক দিন থাকে এবং গবাদি জন্তুর উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা অড়হর ডাইল ভাঙ্গিয়া উহা হইতে ছাতু প্রস্তুত করে। ঐ দেশের লোকেরা অন্য ডাইল অপেক্ষা ইহা অধিক পছন্দ করে। অড়হর গাছের কয়লা অতি হাল্‌কা। এইজন্য উহা বারুদ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই কয়লা হইতে ভাল টিকা প্রস্তুত হয়। ইহার ছাই বা ভস্মে খার থাকায় সাজিমাটির কাজ করে। গালা প্রস্তুত ও রেশম-কীট পালনের জন্যও অনেক স্থানে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। মাদাগাস্কার দ্বীপে অড়হর গাছে রেশমকীট পালন করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আসাম অঞ্চলে এবং উত্তর-বঙ্গে গালা প্রস্তুতের জন্য অড়হরের চাষ প্রচলিত আছে। গালার জন্য কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করিয়া চারাগুলি ২-২৷৷০ হাত লম্বা হইলে ২৷৷০ হাত আন্দাজ লাইন দিয়া ৪।৫ হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। পরে লাক্ষাকীট বা পোকা গাছে ছাড়িয়া দিতে হয়। এক বিঘা জমি হইতে ৬-৭ মণ গালা উৎপন্ন হইতে পারে। অড়হরের ভূষি অতি তেজস্কর ও বলকারক। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে ইহার ভূষি খাওয়াইলে উহারা অধিক দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির ন্যায় ইহার গাছ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এইজন্য এক বৎসর অন্তর জমিতে ইহার চাষ করিলে উপকার আছে।

আয়ুর্ব্বেদমতে অড়হর—গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, কফ ও পিত্তনাশক, রুচিকারক এবং জ্বর, গুল্ম, মুখব্রণ, কাশ, বমি ও অর্শরোগে উপকারক।

ছোলা

ইহা একপ্রকার রবিশস্য। ছোলা সাধারণতঃ তিন জাতীয়, যথা—দেশী, পাটনাই ও কাবুলী। দেশী অপেক্ষা পাটনাই ও কাবুলী ছোলা আকারে বড় ও স্বাদে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

সরিষা, যব, গম, মসিনা বা তিসি প্রভৃতির সহিত একত্রে মিশ্রভাবে ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ভাদুই ফসল জমি হইতে উঠাইয়া লইয়া ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। পাট, ধান প্রভৃতির ফসল ক্ষেত হইতে তুলিয়া লইয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমি উত্তমরূপে চষিয়া ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা হয়। এঁটেল বা দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। বিঘাপ্রতি দেশী ছোলা ১০-১২ সের এবং কাবুলী ছোলা ১২-১৪ সের আবশ্যক। সরস জমিতে ইহার বীজ বপন করা উচিত।

অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে গাছে ফুল ও শুঁটী ধরিতে আরম্ভ হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল পাকে। ফসল সম্পূর্ণ পরিপক

হইলে বীজকোষ ফাটিয়া বীজগুলি জমিতে ছড়াইয়া পড়ে। এইজন্য বীজ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইবার ২।৪ দিন পূর্ব্বে জমি হইতে তুলিয়া আনা আবশ্যক। গাছগুলি কোন শুষ্ক পরিষ্কৃত স্থানে ৫।৬ দিন জাঁক দিয়া রাখিবার পর উহা মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া লইয়া এবং পরে জাঁতায় অথবা কলে ভাঙ্গিয়া উহা হইতে ডাইল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। বিঘাপ্রতি ২-৩ মণ ডাইল প্রস্তুত হয়। অনেকস্থানে ছোলা শাক অন্যান্য শাকের ন্যায় তরকারী রাঁধিয়া খাওয়া হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ছোলা—মধুর-রস, রুক্ষ, রুচিকর, বর্ণ ও বলবর্দ্ধক এবং রক্ত, কফ, কণ্ঠরোগ, পীনস, ক্রিমি ও মেহরোগে হিতকর।

মটর

ইহা একপ্রকার রবিশস্য; সব্জী হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে।

মটর দেশী ও বিদেশী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দেশী মটর আকারে ছোট এবং বিলাতী মটর বড় হইয়া থাকে। কাবুলী মটর নামে আর একপ্রকার মটর দৃষ্ট হয় উহার বর্ণ সাদা এবং দেশী অপেক্ষা আকারে বড়। মটর ডাইল অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার গাছ দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাওয়াইলে অধিক দুগ্ধ প্রদান

করিয়া থাকে। এইজন্য গবাদি জন্তুর আহার্য্যরূপে অনেকস্থলে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

দোআঁশ অথবা এঁটেল জমিতে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ইহার জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ছাই ও গোবরসার প্রয়োগ পূর্ব্বক ৩ ফিট অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ৪।৫ ইঞ্চি ব্যবধানে ইহার বীজ বপন করা হয়। পাটনাই বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা চলে। বিঘাপ্রতি দেশী পাটনাই বীজ ৮।১০ সের এবং বিদেশী বীজ ৫।৬ সের আবশ্যক। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দেশী মটর এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বিদেশী মটরের বীজ বপন করা চলে। কাঁচা মটরশুঁটী বিক্রয় করিতে হইলে কিছু পূর্ব্বে বীজ বপন করা ভাল। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফসল পাকিলে কাটিবার উপযোগী হয়। জমি হইতে কাটিয়া আনিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হয়। মটর ডাইল জাঁতায় অথবা কলে ভাঙ্গিয়া ডাউল বাহির করিয়া লওয়া হয়। বিঘা প্রতি ৫-৬ মণ ফসল জন্মায়। ছোলা প্রভৃতি শাকের ন্যায় মটর শাকও তরকারীতে ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে মটর—কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, বায়ু-বর্দ্ধক, আমদোষজনক, কফ ও পিত্তনাশক এবং বায়ুনিবারক।

মসূর

ইহা একপ্রকার ডাইল শস্য। বাঙ্গলায় ইহাকে মসূরী, হিন্দিতে মসূর, মহারাষ্ট্রদেশে চনই, কর্ণাটে গনগি, তেলেগু ভাষায় চিরিশন মলু কহে। মসূর সাধারণতঃ দুই প্রকার, দেশী ও পাটনাই। পাটনাই মসূর আকারে একটু বড় এবং দেশী মসূর ছোট কিন্তু পাটনাই অপেক্ষা সুস্বাদু।

নিম্ন এবং সরস জমি মসূর কলাই চাষের বিশেষ উপযোগী। যে জমিতে বর্ষার জল অধিকক্ষণ দাঁড়ায় না এবং মাটি সরস থাকে সেই জমিতে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। মধ্য-ভারত ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে মসূরের চাষ বেশী। বাংলার মধ্যে পাবনা জেলাতেই উৎকৃষ্ট মসূর জন্মে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস ইহার বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। সাধারণতঃ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল পাকিয়া থাকে। ফসল পাকিলে গাছগুলি জমি হইতে উৎপাটন পূর্ব্বক ৬।৭ দিন একস্থানে জাঁক দিয়া রাখিতে হয়। পরে উহা ঝাড়িয়া ও বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। ইহার বীজ কলে বা জাঁতায় ভাঙ্গিয়া ডাউল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। বিঘাপ্রতি ৫-৬ মণ ফলন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে মসূর—মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক,

মলরোধক, বায়ুজনক, শূল, গুল্ম ও গ্রহণীরোগের বৃদ্ধিকারক এবং রক্তপিত্ত ও জ্বররোগে হিতকর। মসুরের যূষ—মধুর-রস, পুষ্টি ও বলকারক, মলরোধক এবং প্রমেহনাশক।

মুগ

সর্ব্ববিধ দাউলের মধ্যে মুগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মুগ সাধারণতঃ তিন প্রকার—সোনামুগ, কৃষ্ণমুগ ও ঘোড়ামুগ। এই তিন প্রকার মুগের মধ্যে সোনামুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সোনামুগ ঃ—উচ্চ দোআঁশ জমিতে সোনামুগ উত্তম জন্মিয়া থাকে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ১৩-১৪ মণ গোবরসার মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। বিঘাপ্রতি /২-/২৷৷০ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করা বিধেয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে শস্য পরিপক্ব হইলে গাছগুলি ক্ষেত হইতে উঠাইয়া আনিয়া কোন শুষ্ক পরিষ্কৃত স্থানে ৫।৬ দিন জাঁক দিয়া রাখিতে হয় পরে উহা মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ৩-৩৷৷০ মণ ফলন হইয়া থাকে। বাঙ্গলার অন্য স্থান অপেক্ষা পূর্ব্ব-বঙ্গে ইহার চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। সোনামুগ অন্য মুগ অপেক্ষা আকারে ছোট ও দেখিতে পীতবর্ণ।

কৃষ্ণমুগ :—সোনামুগের ন্যায় জমি প্রস্তুত ও সার প্রয়োগ করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল পাকিলে উহা জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া ৫।৬ দিন কোন একটি পরিষ্কৃত শুষ্ক স্থানে জাঁক দিয়া রাখিতে হয়। পরে মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া যথানিয়মে উহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। বীজগুলি জাঁতায় অথবা কলে ভাঙ্গিয়া উহা হইতে ডাল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে এবং ৪-৪।।০ মণ ফলন হইয়া থাকে। সোনামুগ অপেক্ষা উহা আকারে বড়।

ঘোড়ামুগ :—মুগের মধ্যে ইহা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। ইহার বর্ণ ঈষৎ সবুজ এবং অল্প লম্বাকৃতি। দোআঁশ জমিতে ইহার চাষ করিতে হয়। বিঘাপ্রতি ৩-৩।।০ সের বীজ লাগে এবং প্রায় ৪ মণ ফলন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, রুচিকর, কফ ও পিত্তনাশক এবং জ্বর ও নেত্ররোগে উপকারক। কাঁচামুগের ডালের যূষ বা ঝোল—মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রক্তপরিষ্কারক, বাত, পিত্ত ও কফনাশক এবং অরুচি ও পিত্তবিকারে হিতকর। ভাজামুগ—সারক, সুস্বাদু ও রুচিকারক।

খেসারী

সর্ব্বপ্রকার ডালের মধ্যে ইহা নিম্ন শ্রেণীর। ইহার চাষে কোন পাট করিতে হয় না এবং জমিতে সার প্রয়োগের প্রয়োজন করে না। নিম্ন ও সিক্ত জমিই খেসারীর পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণতঃ আমন ধান কাটিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা হয়। মৃত্তিকা সামান্য ভিজা ও নরম থাকিতে থাকিতে ইহার বীজ বপন করা আবশ্যক। ইহাতে বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ধান্যের জমিতে খেসারী ভালরূপ জন্মে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস ইহার বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের বীজ লাগে ও ৩॥০-৪ মণ ফলন হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে শস্য পাকিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি জমি হইতে ২-২॥০ মণ ডাউল এবং ২-৩ মণ খেসারীর শুষ্ক গাছ বা বিচালী পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—শীতল, রুক্ষ, রুচিকর, মলরোধক, কফ, পিত্তনাশক, শোষণকারক এবং দাহ, অর্শ, শোথ ও হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি পীড়ার উৎপাদক।

কুলতি বা কুলত্থ

শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে তিন প্রকার কুলত্থ কলাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় ডাল, খুব অল্পমূল্যে বাজারে আমদানি হইয়া থাকে। সচরাচর গরীব লোকেরাই ইহা ব্যবহার করে। কুলতি অতি উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য-রূপে উৎপন্ন করিতে পারা যায়। ইহার জমিতে সার প্রয়োগের বিশেষ আবশ্যক করে না এবং ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না।

দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিঘাপ্রতি ৩-৪ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। পৌষ মাঘ মাসে ফসল উঠিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি প্রায় ২॥০ মণ শস্য বা বীজ ও পশুখাদ্যোপযোগী ৩-৪ মণ শুষ্ক গাছ পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রক্তপিত্তকারক এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাশ, হিক্কা, গুল্ম ও অর্শরোগে উপকারক এবং শুক্র ও বলের হানিকারক।

বিরীকলাই

ইহা একপ্রকার ডাউল জাতীয় শস্য। উঁচু এঁটেল অথবা দোআঁশ জমিতে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ অতি সহজসাধ্য। ইহার জন্য জমির বিশেষ পাট অথবা সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। কেবল জমি কর্ষণ পূর্ব্বক ১॥০-২ সের বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে ফসল পাকিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ২-৩ মণ কলাই ও ৩-৪ মণ শুষ্ক গাছ পাওয়া যায়।

বরবটী

ইহা শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার পক্ক দানা হইতে ডাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা অবস্থায় ইহার শুঁটী সব্জী হিসাবে এবং পক্ক অবস্থায় ইহার বীজ হইতে ডাউল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তবে বরবটীর ডাউল এদেশে বিশেষ প্রচলিত নাই।

দোআঁশ অথবা এঁটেল জমিতে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

ইহার জমি কর্ষণ পূর্ব্বক বিঘাপ্রতি ৬-৭ মণ গোবর মিশ্রিত করিতে হইবে। বৎসরে দুইবার ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। দুইবার বপন করিতে হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পুনরায় ইহার চাষ দেওয়া আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ৩-৩৷৷৹ সের বীজ লাগে এবং ৪-৫ মণ ফলন হইয়া থাকে। ইয়ার্ডলং নামক এক জাতীয় বরবটী বারমাসই জন্মান যায় ও ইহার শুঁটীগুলি সাধারণতঃ ২-২৷৷৹ হাত লম্বা হয়। বিশেষ পরিচর্য্যা করিলে ইহা ৫৷৷৹-৬ হাত দীর্ঘও হইতে দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—গুরুপাক, সারক, বলকারক, রুক্ষ, রুচিকর, স্তন্যজনক এবং কফ, শুক্র ও অম্লপিত্তের বৃদ্ধিকারক।

সয়বীন বা গাড়ী কলাই

সয়বীন একপ্রকার কলাই বিশেষ। ইহা সীম জাতীয় কিন্তু সীমের ন্যায় ইহা দেখিতে অতটা চেপ্টা নয়। ইহা দেখিতে কতকটা কলাইএর শুঁটীর ন্যায় বটে কিন্তু আকারে কলাইশুঁটী অপেক্ষা একটু লম্বা ও বড়। ইহা খাইতে মিষ্ট ও সুস্বাদু। কচি অবস্থায় সয়বীন তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং শুষ্ক করিয়া উহা ডাউলরূপে ব্যবহৃত হয়। সয়বীনের অত্যুত্তম

খাদ্যদ্রব্য বিদেশীয়দের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। ইহা ছাড়া এই গাছ পশুখাদ্যের ও সাইলেজের জন্য অথবা সবুজ সারের জন্যও চাষ করা হয়।

সয়বীন পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে উৎপাদিত হইত কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় প্রচারিত ছিল না। ইহার চাষ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার গাছ দুই প্রকার, লতানিয়া ও ঝুপি। ঝুপিগাছগুলি ১½-৩½ ফিট লম্বা হইয়া থাকে এবং তাহাতে অসংখ্য ফল ফলে। লতানিয়া গাছেও প্রায় অনুরূপ ফল হয় বটে কিন্তু ঝুপিগাছ অপেক্ষা উহাতে কিছু কম ফলন হয়। ফলগুলি ঝুপিগাছের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত যখন ফলিয়া থাকে তখন গাছগুলি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া সকলের মনকে আনন্দিত করিয়া তুলে।

জমি :—যে কোন সাধারণ জমিতে উহা উৎপন্ন হয় কিন্তু একটু ডাঙ্গাজমি যেখানে পূর্ব্ব হইতে শুঁটী জাতীয় শস্য উৎপাদিত হইয়াছে, সেই জমিতেই ইহার চাষ বহুল পরিমাণে হইতে পারে। ইহাও অন্যান্য শুঁটীধারী ফসলের ন্যায় বায়ু হইতে নাইট্রোজেন ধারণ করিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত করে।

জমি-প্রস্তুত :—দুই-তিন দিন অন্তর ৪।৫ বার লাঙ্গল দিয়া ও মই দিয়া জমির ঢেলা ভাঙ্গিয়া ঝুর্‌ঝুরে করিয়া লইলেই বীজ বপনের উপযুক্ত হয়। শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ বপন করিতে হয়। বীজগুলি একটু টের্‌চাভাবে ফেলিলে অধিক ফলপ্রসূ

হইয়া থাকে। গাছের জাতি হিসাবে প্রত্যেক সারের ও গাছের ব্যবধান ২-৩ ফিট হইলে চলে। বীজ ছড়াইয়াও বপন করা চলে। ছড়াইয়া বীজ বপন করিলে ঘন গাছ তুলিয়া যথোপযুক্ত ফাঁক করিয়া দিতে হয় কিংবা অধিক ফাঁকস্থানে ঘনস্থানের চারা তুলিয়া রোপণ করিয়া ফাঁক বন্ধ করিয়া দিতে হয়। বিঘাপ্রতি ৩-৩।৷৹ সের বীজ শুধু বীনের জন্য প্রয়োজন হয় কিন্তু সাইলেজ, পশুখাদ্য বা সবুজ সারের জন্য ইহার তিন গুণ বীজ প্রয়োজন হয়। ১ সের বীজে আনুমানিক ১১।৷৹ হাজার দানা পাওয়া যায়। ১″-২″ গভীরভাবে বীজ বপন করিতে হয়।

যে সমস্ত জমিতে শুঁটী জাতীয় শস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় সেই সমস্ত জমি উত্তমরূপে নিড়ান একান্ত আবশ্যক। মাটি বেশ গুঁড়া হইলে আর চাষ না দিয়া জমির আগাছাগুলিকে জমি হইতে তুলিয়া ফেলিতে হয়।

মাটি ঃ—জমির মাটি সতেজ করিতে হইলে গোবরসারের সহিত ছাই ও বোদ মাটি মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক। অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া কোন রাসায়নিক সার উহাতে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না।

বীজ বপনের সময় ও পরিমাণ ঃ—ইহা সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। ইহার ফুলগুলি নরম বিধায় অতিবৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপনের বিশিষ্ট সময় কিন্তু

অগ্রহায়ণের প্রথমেও ইহার বীজ বপন করিয়া সুফল ফলিয়াছে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলি জলে ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়, কারণ ভিজান বীজ বপন করিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারা বাহির হইবার ১০।১২ দিন পরে উহা নাড়াইয়া বসান উচিত। গাছ বসাইবার ৩।৪ মাস পরে উহাতে পরিপক্ক ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে; সুতরাং সয়বীন চাষ-প্রণালী এমন বিশেষ শক্ত নহে। আমাদের মতে সকল চাষীরই ইহার চাষ করা উচিত। যাহা হউক, এখন ইহা আমাদের সকলের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে।

উপকার ঃ—সয়বীন হইতে আমরা প্রচুর পরিমাণে উপকার পাইয়া থাকি। ইহার দ্বারা প্রথমতঃ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা অতি উপাদেয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে ইহার গুণাগুণ অনেকেই জানিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন আছে। ইহার ডাউল একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। ছোলার ন্যায় ইহা ভিজাইয়া পরে আহার করিলে দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। এই সয়বীনের ব্যবহার প্রণালী সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হইতেছে। ইহা ডাউল জাতীয়, অতএব ইহাকে ভাঙ্গিয়া ডাউল তৈয়ার করিতে হয়। মটরের ন্যায় ইহার ঘুগ্‌নিও করা চলে। মোটের উপর দেখা যায় যে ইহা আমাদের একটি বিশেষ উপকারী উপাদান।

সয়বীন যে কেবল আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, কারণ পশুখাদ্যরূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা আমরা উভয়দিকেই উপকার পাই। গাভীকে এই সয়বীন খাওয়াইলে তাহার নিকট হইতে সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও উত্তম দুগ্ধ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে সয়বীনের চাহিদা আরও অনেক দিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সয়বীনে প্রোটীন জাতীয় যে উপাদান রহিয়াছে তাহার জন্য বলিতে হয় যে উহার দ্বারা আমাদের দেহের প্রচুর পুষ্টিসাধন হয়।

সাধারণ লোকে প্রত্যহ দুধ, মাংস প্রভৃতি খাইতে সক্ষম নহে কিন্তু সয়বীন আমাদের সে দুঃখ দূর করিয়াছে, কারণ উহার মধ্যে দুধ ও মাংসের সমস্ত উপাদান আছে এবং উহার মূল্যও খুব অধিক নহে; সুতরাং উহার চাষ করিয়া উহার চাহিদা বাড়ান দরকার ও আমাদের দেশে উহার প্রচলন অধিক পরিমাণে করিয়া উহার দ্বারা আমাদের দৈহিক পুষ্টিসাধন করিয়া দেহের বল বাড়ান একান্ত আবশ্যক।

ইহা হইতে যে-সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে বেতার যন্ত্রের অধিকাংশ সরঞ্জাম ইহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন পুতুল, বোতাম ও অন্যান্য খেলনা প্রস্তুত হইয়া আমাদের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটা কথা, যে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে, সে জমিতে যদি সয়বীনের চাষ করা যায়, তাহা হইলে তাহার উর্ব্বরতাশক্তি বর্দ্ধিত হয় বলিয়া জানা যায়।

সয়বীন হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। ঐ তৈল এরূপ সুস্বাদু যে, অনেকে উহা খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ তৈলের মধ্যে যাহা রন্ধনের উপযোগী নয় তাহা হইতেও আমরা অনেক উপকার পাইয়া থাকি। কল-কব্জা, গাড়ীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে ইহার তৈল লাগাইয়া রাখিলে তাহাতে সহজে মরিচা পড়ে না। ইহার খইলও অনেক দেশের লোকে আহার্য্যরূপে ব্যবহার করে।

ইহা হইতে নানারূপ রং ও সাবান প্রস্তুত হয়; সুতরাং দেখা যায় শিল্পজগতেও ইহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় চাষীদিগকে জানিতে অনুরোধ করি। কারণ বর্ত্তমানে ইহার প্রচুর প্রচলন হওয়ায় ইহা অর্থোপায়ের একটি চমৎকার পথ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা আমরা অখাদ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম বর্ত্তমানে তাহারই চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মাস কলাই

ইহা একপ্রকার ডাইল জাতীয় শস্য। সাধারণতঃ আশু ধান্যের জমিতেই ইহার চাষ দেওয়া হয়। নিম্নভূমিতে ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহার বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। সাঁওতাল-পরগণা এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার বীজ বপন করা হয়। ইহার জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক বিঘাপ্রতি ১৫।২০ মণ গোবরসার মিশাইয়া দিতে হয়। বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের বীজ লাগে এবং ৬-৭ মণ ফলন হইয়া থাকে। ঠিক মত চাষ করিতে পারিলে ৭-৮ মণ কলাই এবং গো-মহিষাদির ভক্ষণোপযোগী ১০-১২ মণ শুষ্ক গাছ পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, মেদজনক, কফ ও পিত্তকারক, এবং বায়ু, অর্শ, শূল ও শ্বাসরোগে হিতকর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্যশস্য (Cereal Crops)

ধান্য

ধান এদেশের প্রধান ফসল। বাংলা দেশে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এদেশে ছোট দানা, বড় দানা, সরু, মোটা, সুগন্ধযুক্ত প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতীয় ধান্য জন্মে। সমুদয় ধান্যকে আউস, আমন ও বোরো এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এই তিন প্রকার ধান্য পরস্পর বিভিন্ন গুণসম্পন্ন। আউস ধান হইতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ মোটা ও লাল্‌চে, আমন ধান হইতে যে চাউল উৎপন্ন হয় উহা সরু এবং মোটা উভয়ই হইতে পারে কিন্তু আউস অপেক্ষা আমনের বর্ণ উজ্জ্বল। বোরো ধান হইতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা খুব মোটা এবং কাল্‌চে।

আউস :—চলিত ভাষায় ইহাকে আউস এবং শুদ্ধ বাংলায় ইহাকে আশু ধান্য বলা হয়। প্রকারভেদে আশু ধান্য দুই প্রকার, ছোটনা আশু ও বড়না আশু। ছোটনার চাষের জন্য জমিতে জল ধরিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, অল্প বৃষ্টি হইলেই উহার আবাদ হইয়া থাকে। এইজন্য যে সকল জমিতে

সহজেই জল দাঁড়ায় তাহাতে উহার আবাদ করা উচিত নহে কিন্তু বড়না আশুর ক্ষেতে প্রায় এক হাত জল থাকা আবশ্যক। ছোটনার ফসল কিছু আগে এবং বড়নার ফসল কিছু পরে পাকিয়া থাকে।

আশু ধান্য তিন চারি মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়। এইজন্য ইহার জমিতে একই বৎসরের মধ্যে অন্য একটি প্রধান ফসল চাষ দিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আশু ধান্য লাগাইলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই উহা কাটিয়া লইতে পারা যায়; সুতরাং জমি ফেলিয়া না রাখিয়া উহাতে পুনরায় লাঙ্গল দিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আলু, শণ, খেসারী, মসুর অথবা গমের চাষ দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত শস্য ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমি হইতে উঠাইয়া লইতে পারা যায়। পরে উহাতে লাঙ্গল দিয়া সময় মত ধান্যের চাষ দেওয়া যাইতে পারে।

জমিতে কোন ফসল না থাকিলে শীতের শেষেই জমিতে চাষ দিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলে জমিতে পুনরায় লাঙ্গল ও মই দিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। জমি গভীর-ভাবে ও উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। আমন ধান্য অপেক্ষা আশু ধান্যের ফলন কম এবং ফসলের মূল্যও আমন ধান্য অপেক্ষা অল্প। এইজন্য আশু ধান্যের জমিতে বেশী মূল্যবান বা দামি সার দেওয়া পোষায় না। যাহাতে উত্তম ফসল পাওয়া যায় এবং খরচাও পোষায় এরূপ সার ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।

জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ১-১॥ গাড়ী গোবর-সার এবং গাছ একটু বড় হইলে রেড়ির খইল ১ মণ অথবা সালফেট অফ্ এ্যামোনিয়া ১০।১২ সের এবং সুপারফস্ফেট বা হাড়ের গুঁড়া ১২।১৪ সের প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পলি, দোআঁশ অথবা এঁটেল জমিতে আশুধান্য ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসই আশুধান্য বপনের প্রশস্ত সময়। ছিটাইয়া বপন করিলে বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে। বপনের পর মই দিয়া মাটি চাপিয়া দিতে হয়। জমি নীচু হইলে আমন ধান্যের ন্যায় ইহারও চারা রোপণ করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এক কাঠা জমিতে ৫।৬ সের বীজ বপন করিয়া উহার চারা এক বিঘা জমিতে বপন করা চলিতে পারে। চারা করিয়া রোপণ করিলে বীজ বেশী লাগে।

চারা লাগাইতে হইলে জমিতে ২।৩ বার হল চালনা করিয়া এবং মই দিয়া কাদা করিয়া একসঙ্গে ২।৩টি চারা জমিতে লাগান কর্ত্তব্য। গাছগুলি বড় হইলে গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ ২।৩ বার জমি হইতে আগাছা বাছিয়া জমি পরিষ্কার রাখা উচিত। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ধান পাকিয়া থাকে। ঐ সময় জমি হইতে ধান সমেত গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া পরিষ্কৃত স্থানে গাদা দিয়া রাখিতে হয়। পরে উহা আছড়াইয়া ও ঝাড়িয়া লইয়া ধান ও খড় বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। বিঘাপ্রতি জমিতে ছোটনা ধান প্রায় ৮-১০ মণ

এবং বড়না ৫-৬ মণ ফলিয়া থাকে। ছোটনার খড় প্রায় ১৫-১৬ মণ এবং বড়নার খড় প্রায় ২০-২২ মণ হইয়া থাকে।

আমন ঃ—যত প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় চাউল বা ধান্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই আমন ধান্যের অন্তর্ভুক্ত। আমন ধান্য হেমন্ত ঋতুতে পাকিয়া থাকে। এইজন্য উহার আর একটি নাম হৈমন্তিক ধান্য। আমন ধান্যের অন্তর্গত ইন্দ্রশাইল, দুধসর, নাগরা প্রভৃতি বিভিন্ন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান্য আছে কিন্তু উহারা সকলেই সকল স্থানে সমান জন্মে না, স্থান বিশেষে ইহারা এক একস্থানে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।

আমন ধান্য অধিক জলে প্রায় নষ্ট হয় না। ইহা কাদা-মাটিতে ভাল জন্মে। যে জমিতে জল আদৌ দাঁড়ায় না সে জমিতে আমন ধান জন্মায় না। কোন কোন জমিতে আমন ধান ৫।৬ হাত জলেও জন্মিয়া থাকে। আশু ধান্য আমন ধান্য অপেক্ষা অনাবৃষ্টিসহনশীল। যে বৎসর অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টির অল্পতাহেতু আমন ধান্য কম জন্মে সেই বৎসর আশু ধান্য ভাল জন্মিয়া থাকে।

ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া জমিতে লাগাইতে হয়। কোন কোন স্থানে বীজ ছিটাইয়া বপন করারও প্রথা আছে। যে জমিতে বীজ ফেলিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে বীজগাছ রোগা ও লম্বা হইয়া যায়। সাধারণ জমি অপেক্ষা বীজতলা কিছু উচ্চ এবং রৌদ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজতলা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া কাঠাপ্রতি ৫।৬ সের খইলচূর্ণ ও ৩ মণ গোবরসার মিশ্রিত করিয়া বীজতলার মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বীজ বপন কাদামাটিতে করা যাইতে পারে কিন্তু যে জমিতে বীজ বপন করা হইবে সে জমিতে জল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এক কাঠা জমিতে ৬।৭ সের বীজ বুনিলে উহা এক বিঘা জমিতে রোপণ করা চলিতে পারে। কোন একটি মাটির হাঁড়ি বা পাত্রে বীজগুলি ১২।১৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে জল ফেলিয়া বীজগুলি উন্মুক্ত বাতাসে শুকাইয়া থলে চাপা দিয়া রাখিলে শীঘ্রই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলি [illegible] কাদামাটিতে ছড়াইয়া মই দিয়া মাটি চাপিয়া দিতে হয়।

বর্ষারম্ভের পরেই অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমন ধান্যের চারা রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি এক হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে উহাদিগকে আস্তে আস্তে উপড়াইয়া লইয়া জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। স্থান বিশেষে জল-হাওয়া এবং জমির অবস্থানভেদে ভাদ্র মাস পর্য্যন্তও চারা রোপণ করা যাইতে পারে।

আমন ধান্যের জমিতে বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গোবরসার অথবা ১২।১৪ মণ গোবর, ১॥০ মণ রেড়ির খইলচূর্ণ, ৮।১০ সের সুপারফস্ফেট বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে উত্তম ফসল

পাওয়া যায়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় এই সার মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করা উচিত। চারা রোপণ করিবার সময় বিঘাপ্রতি জমিতে ১০।১২ সের সল্‌ফেট অফ্ এ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। জমিতে অধিক সার প্রয়োগ করিলে গাছগুলি ঝাঁড়াইয়া যায়, ইহাদের পত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং গাছগুলি দীর্ঘ হয়; ফলতঃ তাহাতে ফসল জন্মে না, যদিও জন্মে তাহা অতি সামান্যই হইয়া থাকে। উঁচু জমি অর্থাৎ যেখানে কার্ত্তিকশাইল জাতীয় ধান উৎপন্ন হয় কিংবা দোআঁশ জমি ইহার চাষের উপযোগী।

চারাগুলি অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে একত্রে তিন-চারিটি পর্য্যন্ত রোপণ করা যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ফসল পাকিয়া কাটিবার উপযোগী হয়। শস্য সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া আনা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি প্রায় ৮-১০ মণ ফসল হইয়া থাকে এবং প্রায় ২০-২২ মণ খড় পাওয়া যায়।

বোরো ধান :—ইহার চাউল অতি নিকৃষ্ট এবং বর্ণও মলিন। এক কথায় বলিতে গেলে ইহা গরীবের খাদ্য। বঙ্গদেশে এবং আসামের কোন কোন স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহার জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক নাই। সার দিলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না বরং উপকারই হইয়া থাকে কিন্তু সার দেওয়ার খরচা উঠিয়া ইহাতে লাভ দাঁড়ায় না, কাজেই অল্প যাহা পাওয়া যায় তাহাই চাষীদের পক্ষে লাভজনক।

বারমাসই ইহার চাষ হইতে পারে কিন্তু সচরাচর কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ মাসে বীজতলায় বীজ বুনিয়া পৌষ মাঘ মাসে ইহা জমিতে বপন করিতে হয়। জল শুকাইতে আরম্ভ হইলে নিম্ন জমিতে বিলের মধ্যে ও নদীর ধারে ইহার চাষ করিতে পারা যায়। জমি ডুবিয়া গেলে তৃণাদি পচিয়া মাটি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা হইয়া উঠে, এইজন্য এইরূপ জমিতে ইহার চাষ করিলে ফলন বেশী হইয়া থাকে। বন্যার জল উঠিয়া যে জমি প্লাবিত হইয়া যায় ও আমন ধান্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়া উঠে না, সে স্থলেও ইহার চাষ করা চলিতে পারে। চর কিংবা পলিপড়া জমির জল সরিয়া গেলেও তথায় ইহার চাষ করা যাইতে পারে। খুব জলা জায়গায় ও যেখানে আমন ধান জন্মে না সে স্থানেও ইহা হইয়া থাকে। আমন ধান্যের ন্যায় ইহারও চারা রোপণ করিতে হয় কিন্তু বীজতলার জন্য তত পরিশ্রম করিতে হয় না।

বীজ ধানগুলি ৩।৪ দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর বাতাসে শুকাইয়া থলে চাপা দিয়া রাখিলে শীঘ্রই বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন হইয়া থাকে। অঙ্কুরিত বীজগুলি কোন কর্দ্দমাক্ত স্থানে ছড়াইয়া বপন করিতে হইবে। অনন্তর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ঐ চারাগুলি আধ হাত তিন পোয়া হইলে জমিতে রোপণ করা আবশ্যক। ১ কাঠা জমিতে ৫ সের বীজ বপন করিলে ১ বিঘা জমির উপযুক্ত চারা জন্মিবে। বোরো ধানের ক্ষেতে প্রায়ই কেহ ভালরূপ চাষ করেন না। জমি কর্ষণ করিয়া কর্দ্দমাক্ত নরম মৃত্তিকায় চারাগুলি সারি বাঁধিয়া রোপিত হইয়া থাকে।

৮।৯ ইঞ্চি ব্যবধানে ২।৩টি চারা একত্রে বপন করাই বিধেয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে শস্য পাকিলে উহা জমি হইতে উত্তোলন করিতে পারা যায়। বিঘাপ্রতি ৫-৬ মণ ফলন হইয়া থাকে। আশু ধান্য অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু আমন ধান্য পারে না। আমন ধান্য অধিক জলে জন্মিতে পারে কিন্তু আশু ধান্য তাহা পারে না। আউস অপেক্ষা আমনের ফলন অধিক। কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা আশু ও আমন ধান্যের গুণ একত্রিত করিতে পারা যায়। আশু ধান কাটিয়া লইবার পর সেই জমিতে কোন চাষ না করিলে গোড়া হইতে নূতন গাছ বাহির হইবে এবং তাহাতে পুনরায় ধান্য জন্মে। প্রথমে যেরূপ ধান জন্মে দ্বিতীয়বারে তাহার অর্দ্ধ, সিকি কিংবা তাহারও কম জন্মিয়া থাকে। ব্যবহার না করিয়া পর বৎসর আমন ধান্য বপনের সময় উহা বীজধান রূপে ব্যবহার করিলে গাছগুলি অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না এবং ফলনও অধিক হইয়া থাকে। সরু ও উৎকৃষ্ট জাতীয় আউস ধান এইরূপ ভাবে চাষে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারা যায়। পেশোয়ার ও মধ্য-প্রদেশে স্বভাবতঃ বঙ্গদেশ অপেক্ষা বৃষ্টি কম হয়। অনাবৃষ্টিহেতু বঙ্গদেশীয় আশু ধান্য না জন্মিলেও নাগপুরী ও পেশোয়ারী আশু ধান্য জন্মিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশে এইভাবে আশু ধান্যের দোকাট বীজ বপনে সুন্দর ফসল জন্মাইলে পারা যায়।

ধান হইতে চাউল বাহির করিয়া উহা সঞ্চয় করিয়া রাখা অপেক্ষা ধান্য সঞ্চয় করিয়াই রাখাই অধিকতর নিরাপদ।

ধান অপেক্ষা চাউলে সহজে পোকা লাগে। ধান্যের উপরকার আবরণ চাউলকে পোকার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে। চাউল ভিজিয়া যত সহজে পচিয়া যায়, ধান তত সহজে পচে না। •

যতপ্রকার ফসলের অনিষ্টকারী পোকা আছে তাহার অধিকাংশই ধান্যের অনিষ্ট করিয়া থাকে। বাস্তবিকই ধান্যের অনিষ্টকারী এত অধিক পোকা আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পেদোপোকার ন্যায় গন্ধযুক্ত একপ্রকার সবুজ রঙের ছোট গন্ধপোকা ধানগাছে ফুল ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে আবির্ভাব হয় এবং যতদিন ক্ষেতে গাছ থাকে ততদিন ইহারা গাছ ছাড়িয়া কোথাও নড়ে না। গন্ধপোকা ধানের মধ্যে সরু শুঁড় ঢুকাইয়া দিয়া ধানের রস চুষিয়া খায়। ঐ সমস্ত ধানে শস্য জন্মে না, আগড়া হইয়া যায়। পাতলা কাপড়ের পোকাধরা হালকা থলে ছাড়া গন্ধপোকাকে মারা বিশেষ শক্ত, কারণ উহারা ধান্যের রস চুষিয়া খায়। গাছে বিষ প্রয়োগ করিলেও এই জাতীয় পোকার কোন অনিষ্ট হয় না। ধামসা পোকা গন্ধীর শত্রু। ইহাদের মারিয়া ফেলা কিংবা তাড়ান উচিত নহে।

ভোমরা, গোবরে বা কোরা পোকা ধান গাছের শিকড় কাটিয়া দিয়া গাছগুলিকে মারিয়া ফেলে। পতঙ্গাবস্থায় ইহাদের ডানা হয় এবং এক সঙ্গে অনেকগুলি উড়িয়া বেড়ায়। পতঙ্গাবস্থায় কোরাপোকা গাছের পাতা ঝাঁঝরা করিয়া খায়। ইহাদের মারিতে হইলে কেরোসিন ইমাল্‌সান্‌ গাছের গোড়ায় প্রয়োগ

করা আবশ্যক। ধানগাছগুলির চারা অবস্থায় মরিচ পোকার উপদ্রব দেখা যায়। ধানগাছ জন্মিলেই মরিচ পোকা গাছের পাতায় ডিম পাড়িয়া থাকে। উহাদের ডিমগুলি খুব ছোট ও কাল রঙ্গের। ৫।৬ দিন পরে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয়। কীড়াবস্থায় উহারা গাছের পাতা খাইতে খাইতে নীচের দিকে যায়। পাতার যতখানি অংশ উহারা খাইয়া থাকে ততখানি স্থান সাদা হয় ও শুকাইয়া যায়। কীড়াগুলি ক্রমে পুত্তলি ও পরে পতঙ্গাবস্থায় উপনীত হয়। যে জমিতে জল থাকে সেই জমিতে প্রায়ই এই পোকা লাগে। ক্ষেতে মরিচ পোকা লাগিয়াছে জানিতে পারিলে উহারা গাছে ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে জমির জল ছাড়িয়া দিলে উপকার হইতে পারে। ধূনা অথবা গন্ধকের ধূমেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। মাজরা পোকা ধান গাছের মধ্যে ঢুকিয়া মাজপাতার গোড়া খাইয়া থাকে। যে গাছের মাজপাতা অথবা গর্ভশীষ শুকাইয়া সাদা হইয়া যায় সেই গাছ মাজরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বালাইলে মাজরার প্রজাপতি তাহাতে পুড়িয়া মরে। ধান কাটিয়া লইলে উহারা গাছের গোড়া আশ্রয় করিয়া শীতকাল কাটায়। সেই সময় জমিতে লাঙ্গল দিয়া ধানগাছের গোড়াগুলি একত্র করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। এইরূপ ধানের গোড়া ক্ষেতে রাখিলে এই জাতীয় পোকাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লেদাপোকা, ফড়িং, নলিপোকা, শোঁয়াপোকা প্রভৃতিও

ধানগাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। কাটফড়িং ধানের চারা গাছের পরম শত্রু।

সময় সময় পঙ্গপাল আসিয়া ধানগাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। পঙ্গপালের আকৃতি ফড়িং-এর ন্যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়। পঙ্গপালের বাসস্থান পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম এবং বোম্বাই প্রদেশ। বোম্বাই-এর পঙ্গপাল বাঙ্গলায় আসে না, পঞ্জাবের পঙ্গপালই সময় সময় এদেশে আসিয়া পড়ে। রাজপুতানা, বেলুচিস্থান ও পারস্য দেশের পাহাড়ের উপর ইহারা সাধারণতঃ অবস্থান করে। বাঙ্গলা দেশে ইহারা অধিক দিন থাকিতে পারে না এবং এখানেও ডিম পাড়িতে পারে না। সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান স্থানে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। পঙ্গপাল কখনও একক বা দুই-একটি কোন স্থানে যায় না। উহারা সকলে এক সঙ্গে থাকে ও এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যায় এবং দলের আগের দুই একটি ফড়িং যে স্থানে বসিয়া পড়ে সেই দলের সমস্ত ফড়িং তথায় যোগ দেয়। ইহারা একবার যে ক্ষেতে আসিয়া পড়ে সে ক্ষেতের গাছ উজাড় না করিয়া যায় না। পঙ্গপাল আসিতেছে জানিতে পারিলে ঢোল, শাঁক, কাঁসি প্রভৃতি বাজাইলে এবং অনেক লোক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে সেস্থানে পঙ্গপাল বসিতে পারে না।

এই সমস্ত পোকা লাগা ছাড়া ধানগাছে একপ্রকার

ভূষারোগ জন্মিতে দেখা যায়। ধানের 'গু' এই জাতীয় রোগ। ধানের শীষের মাথায় একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় পদার্থ জন্মিয়া থাকে। কোন গাছে এইরূপ হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করা উচিত, নতুবা ইহার বীজাণু ক্ষেত্রময় সংক্রামিত হইয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। এই ধানের বীজ জমিতে বপন করিলে সেই সমস্ত গাছেও এই রোগ পরিলক্ষিত হয়। তুঁতে, সেঁকোবিষ, চূণ ও রেড়ির খইল-চূর্ণ একত্র মিশাইয়া উহা জলে গুলিয়া সেই জলে কিছুক্ষণ বীজ ডুবাইয়া লইলে বীজস্থিত ধসাধরা বা ভূষারোগের বীজাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধানের যত প্রকার কীট ও রোগ আছে তাহারা ফসলের কিছু-না-কিছু অনিষ্ট করেই কিন্তু ধান অধিক মূল্যবান্ ফসল নয় বলিয়া সহজে ইহার কোন প্রতিকার করা যায় না; কারণ যে কোন উপায় অবলম্বন করিলেই অধিক খরচা পড়িবে এবং ফসল বিক্রয়ে লাভ না হইয়া লোকসান হইবে। জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা, ভালরূপ কর্ষণ, জমি পরিষ্কার রাখা, ভাল বীজ ব্যবহার, পর্য্যায়ক্রমে ফসল লাগান এবং ফলন শেষ হইলে জমিতে পরিত্যক্ত খড় বা লতাপাতাদি পুড়াইয়া ফেলিলে অনেক সময় পোকার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

গোলার ধান :—ধান বা চাউল অনেকে মোড়ায় বা গোলাতে রাখেন কিন্তু একপ্রকার ধানপুরী ও চাউলের পোকা উহার মধ্যে থাকে। সেই সমস্ত পোকা উহার মধ্যে যাহাতে যাইতে না পারে তাহার বিষয় নিম্নে কিছু বলা হইতেছে।

আমপাতা, 'ডা' করমচার পাতা প্রভৃতি একত্রিত করিয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া দিলে কোন পোকার দ্বারা ধান ও চাউলের অনিষ্ট হয় না বলিয়া শোনা যায়। মরাই-এর মধ্যে নিমপাতা রাখিয়াও সুফল পাওয়া যায়। ন্যাপথলিনও উহার পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত।

শালিধান্যের বাঙ্গলা নাম আমন ধান, ষষ্টিক ধান্যের বাঙ্গালা নাম ষেটে ধান, ব্রীহি ধান্যের বাঙ্গলা নাম আউস ধান।

আয়ুর্ব্বেদমতে শালিধান্য—লঘুপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং বাত ও কফবর্দ্ধক। ষষ্টিকধান্য—বাত, মূত্র, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিজনক, ত্রিদোষনাশক ও মলরোধক। ব্রীহিধান্য—লঘুপাক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং বায়ু ও মূত্রবর্দ্ধক।

যব

ইহা একপ্রকার শূক ধান্য জাতীয় প্রসিদ্ধ শস্য। যব ও যই গাছের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না, যবের দানায় শুঁয়া আছে কিন্তু যই-এর তাহা নাই। যব হইতে ময়দা, বার্লি, ছাতু প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহার চাষ অতি অল্প। অনেকে ছোলা, মসূরি প্রভৃতির সহিত অল্প যব লাগাইয়া থাকেন।

যে কোন জমিতে যব জন্মিতে পারে; তন্মধ্যে বেলে দোআঁশ মৃত্তিকাতেই ইহা ভাল জন্মে। ইহার জমিতে বিঘা-প্রতি ১০।১২ মণ গোবরসার, ৬।৭ সের অস্থিচূর্ণ এবং ৫।৬ সের সলফেট্ অফ্ এ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহার জমি বিশেষ গভীর করিয়া কর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না কিন্তু মাটি খুব চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক। জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিঘাপ্রতি ১২।১৪ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করা আবশ্যক। ৫।৬ দিনের মধ্যেই যবের অঙ্কুরোৎপাদন হইয়া থাকে।

গাছ বড় হইলে ২।১ বার নিড়াইয়া ও আগাছা বাছিয়া দেওয়া ব্যতীত যবের আর অন্য কোন পরিচর্য্যা করিবার আবশ্যক হয় না। যবের ক্ষেতে প্রায়ই জল-সেচনের আবশ্যক হয় না কিন্তু জমি নীরস হইলে আবশ্যক মত জল-সেচন করিতে পারিলে গাছগুলি সতেজে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৪।৫ মাসের মধ্যেই যব পরিপক্ক হয়। উত্তমরূপে না পাকিলে যব কাটা উচিত নহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহারা সাধারণতঃ কর্ত্তনোপযোগী হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ৬-৭ মণ ফসল জন্মে।

যবের ছাতু প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উহা জলে ভিজাইতে হয় পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ঢেঁকিতে দিয়া ধান হইতে যে ভাবে চাউল বাহির করিয়া লওয়া হয় ঐভাবে ঢেঁকিতে কুটিয়া খোসা স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিতে হয়।

ঐ যবের চাউল অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া ঢেঁকিতে দিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া উহা পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা সূক্ষ্ম ছিদ্র-যুক্ত চালনী দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই যবের ছাতু প্রস্তুত হইল। যবের বার্লিও ঠিক উপরোক্ত ভাবে প্রস্তুত করা যায়, কেবল অগ্নির উত্তাপে না ভাজিয়া রৌদ্রের উত্তাপে বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। দেশী যব অপেক্ষা আমেরিকার কালিফোর্নিয়া প্রদেশে উৎপন্ন Mariout নামক উৎকৃষ্ট যব হইতে দেশী প্রথায় বার্লি প্রস্তুত করিলে উহা প্রায় বিলাতীর সমকক্ষ হইয়া থাকে। যবের মধ্যে উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা এদেশে আনিয়াও চাষ করা চলে। যব হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলরোধক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক এবং পিত্ত, কাস, শ্বাস, পীনস, পিপাসা, প্রমেহ ও ত্বক্‌দোষে হিতকর। দুই বৎসরের অধিক কালের পুরাতন সব গুণহীন। যবের ছাতু—মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

গোধূম বা গম

বঙ্গদেশের যেমন প্রধান শস্য ধান, পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ প্রধান শস্য গম। চাউল হইতে প্রস্তুত ভাত যেমন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য, ময়দা হইতে প্রস্তুত রুটীও সেইরূপ পশ্চিমদেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য। বাঙ্গলাদেশে ইহার চাষ অতি অল্প হয়। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ান গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হয়। শক্ত ও নরম দানা ভেদে গমকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। শক্ত দানা হইতে আটা ও সুজি এবং নরম দানা হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হয়। খেড়ী, দুধিয়া, জামালী, গঙ্গাজলী, পুষা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় গম এদেশে চাষ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গঙ্গাজলী ও পুষা উৎকৃষ্ট।

খেড়ী :—ধূসরবর্ণের মাঝারি আকারের শস্য, শক্ত, শীঘ্র পাকে।

দুধিয়া :—শ্বেতবর্ণের মাঝারি আকারের গোলাকৃতি শস্য, নরম, ইহার পাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চওড়া।

জামালী :—লালবর্ণের বড় শস্য, নরম, ইহার পাতা অন্যান্য গম অপেক্ষা সরু।

গঙ্গাজলী :—ধূসরবর্ণের বড় আকারের শস্য, শক্ত। ফসল উৎকৃষ্ট। গমে শুঁয়া আছে।

পুষা ঃ—গমের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থানীয়। পুষা গভর্ণমেণ্ট কৃষি ফার্ম হইতে পুষা ১২ ও পুষা ৪ এই দুই প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম আবিষ্কৃত হইয়াছে। অম্লরসযুক্ত জমির পক্ষে পুষা ৪ খুব উপযোগী। ইহা শীঘ্র পাকে এবং ছাতাধরা রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না।

নিঃসার ও নীরস জমিতে গম ভাল জন্মে না। পলিযুক্ত সরস অথবা হালকা দোআঁশ মাটিতে গোধূম বা গম ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। গমের জমিতে উত্তম কর্ষণের প্রয়োজন। ইহার জমি ৩।৪ বার উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ১৫।২০ মণ গোবরসার, ১০।১২ সের সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া ও ১০।১২ সের সুপারফস্ফেট বা হাড়ের গুঁড়া মাটির সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া জমি প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োগ না করিয়া চারাগুলি ১০।১২ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে জমিতে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিবার পর জমিতে জল-সিঞ্চন প্রয়োজন।

বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ আউস ধান, পাট প্রভৃতি কাটিয়া লইবার পরই ইহার চাষ দেওয়া হয়। মসুরি, ছোলা, তিসি প্রভৃতির সহিত ইহা একত্রে লাগান যাইতে পারে। ইহার বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ তুঁতের জলে ভিজা-

ইয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাতে বীজের মধ্যস্থিত রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। আধপোয়া তুঁতে জলে ভিজাইয়া এক বিঘা জমির উপযোগী বীজ-শোধন (disinfect) করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি ৮।১০ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করা আবশ্যক। ইহার জমি মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দেওয়া, জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা, এবং আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচন প্রয়োজন।

ফসল সম্পূর্ণ পরিপক না হইলে কাটিয়া আনা উচিত নহে। বীজ সম্পূর্ণ পরিপক হইতে পাঁচ মাস সময় লাগে। সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করিলে চৈত্র বৈশাখ মাসে ফসল কাটিবার উপযুক্ত হয়। বিঘাপ্রতি ৫-৬ মণ ফলন হইয়া থাকে। যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে ৭-৮ মণ ফলনও পাওয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে গম চাষ করিলে অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই জমিতে গম না লাগাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফসল লাগাইলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না এবং পোকা-মাকড় বা ফসলের রোগ খুব কম হয়।

গমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার মাঠফড়িং-এর উপদ্রব আরম্ভ হয়। ইহারা অঙ্কুরিত চারা গাছগুলি খাইয়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহারা গম, যব ব্যতীত অন্যান্য রবিশস্যও এইভাবে খাইয়া নষ্ট করিয়া থাকে। বর্ষাকালে যে-সমস্ত জমি জলে ডুবিয়া যায় তথায় ইহাদের উপদ্রব থাকে না, উঁচু বা ডাঙ্গা জমিতেই ইহাদের

প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। এই ফড়িং মাটির মধ্যে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতে অল্পদিনের মধ্যে বাচ্চা ফুটিয়া বাহির হয় এবং উহারাও এইভাবে ফলনের অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করে। মাঠফড়িং-এর বর্ণ সবুজ। ইহারা গাছের মধ্যে থাকিলে সহজে পোকা বলিয়া মনে হয় না। জমির মধ্যে ঘাস থাকিলে ইহারা সহজে নব অঙ্কুরিত চারা গাছের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পোকা-ধরা থলিয়া দ্বারা ইহাদের ধরা সহজ।

মাজরা পোকাও গব ও গম গাছের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ গাছের মাঝের অংশ আক্রমণ করে। ইহারা ধান গাছও এইভাবে আক্রমণ করে। মাজরা দ্বারা আক্রান্ত হইলে মাজপাতা শুকাইয়া যায়। সাধারণতঃ শীতের পরেই মাজরার প্রজাপতি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই ডিম হইতে কীড়া হয় এবং এই কীড়াগুলি বড় হইয়া ফসল আক্রমণ করে ও পরে প্রজাপতির আকারে বহির্গত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। গাছের মাজ-পাতা শুকাইয়া যাইলেই উহা মাজরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাজরা দ্বারা আক্রান্ত গাছ শিকড় সমেত উপরে তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। জমিতে পরিত্যক্ত গাছের ডালপালায় ইহারা স্বভাবতঃ ডিম পাড়ে। এইজন্য জমিতে কোন পরিত্যক্ত অংশ ফেলিয়া না রাখিয়া উহা পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে যত্ন লইলে ইহারা ক্ষেত্রময় বিস্তৃত হইতে পারে না।

জাব পোকা নামক একপ্রকার সরু শুঁড় বিশিষ্ট শোষণ-কারী পোকা যব, গম প্রভৃতি গাছের পাতায় ও ডাঁটায় শুঁড় ঢুকাইয়া রস চুষিয়া খাইয়া গাছকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। সংখ্যায় অধিক হইলে ইহারা গাছের রস এত অধিক পরিমাণে খাইয়া ফেলে যে, গাছ আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহারা ডিম পাড়ে না, একবারে বাচ্ছা প্রসব করিয়া থাকে। মেঘলা বা বাদলার দিনে ইহাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্রুড্ অয়েল ইমাল্সান্, কেরোসিন ইমাল্সান্ প্রভৃতি জাবের গায়ে লাগিলেই উহারা মারা পড়ে। পিচকারী দ্বারা উহা গাছে প্রয়োগ করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, দেহের স্থিরতাকারক, আয়ুবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত ও পিত্তনাশক এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক। নূতন গোধূম—আম ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

ভুট্টা

পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে দক্ষিণ আমেরিকা ভুট্টার আদি জন্মস্থান বলিয়া অভিহিত হয়। উহা জনার, মকোই, মক্কা, ভুট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ পশ্চিমাঞ্চলে অধিক জন্মিয়া থাকে এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ আদরের বস্তু। যদিও এদেশীয় লোকের ইহা প্রধান খাদ্যশস্য নহে, তথাপি বঙ্গ-দেশের প্রায় সকল স্থানেই অল্প-বিস্তর ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। গবাদি জন্তুর খাদ্যরূপেও অনেকস্থানে ইহার আবাদ করা হয়।

সকল প্রকার জল-বায়ুতে ভুট্টা জন্মিতে পারে। বাংলার আর্দ্র জল-বায়ুতে এবং পঞ্জাবের শুষ্ক জল-বায়ুতেও ইহা জন্মিয়া থাকে। অধিক বৃষ্টিতে ইহার গাছ ভাল জন্মে না। অল্প জলে ভুট্টার আবাদ ভাল হয়। উত্তর ও পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় এবং আসামে বারিপাত অধিককাল স্থায়ী হয় বলিয়া এইস্থান অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে বারিপাতের অল্পতাহেতু সেই স্থানেই ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভুট্টা হইতে ময়দা প্রস্তুত হয়। মুড়ির ন্যায় ভাজিলে ইহার বড় বড় খই হয়। ভুট্টার খোলা হইতে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

এদেশে জিগজাগ, মেক্সিকান, গোল্ডেন ব্যাণ্টাম, রেড করি,

হোয়াইট করি, হোয়াইট ডেণ্ট্, গোল্ডেন ডেণ্ট্ প্রভৃতি সাদা, হল্‌দে ও লালবর্ণের নানাজাতীয় বিদেশী ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বীজের আকার গোল ও চ্যাপ্টা উভয় রকমই হইয়া থাকে। পশুখাদ্য ও শস্যের নিমিত্ত সাধারণতঃ জৌনপুরী ভুট্টার বীজই উৎকৃষ্ট।

উঁচু দোআঁশ জমি ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু জমি বিশেষ উর্ব্বরা হওয়া প্রয়োজন। জমির উর্ব্বরতার অনুপাতে ফলনের অল্পতা বা আধিক্য ঘটে। এইজন্য সারবান মৃত্তিকায় ইহার চাষ করা আবশ্যক। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি ১৫।২০ মণ গোবর, ১০ সের সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া এবং ৬।৭ সের সুপারফস্ফেট বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চৈত্র মাসে ভুট্টার জমি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার জমি গভীরভাবে কর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। জমি ভালরূপ প্রস্তুত হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করা প্রশস্ত। পশুখাদ্যের জন্য বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করা আবশ্যক। বীজের জন্য চাষ করিতে হইলে দুই ফিট অন্তর লাইন দিয়া দেড় ফিট ব্যবধানে ইহার বীজ বপন করা দরকার। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। বীজ বপনের পর মই দিয়া মৃত্তিকা সমতল করিতে হইবে। ৬।৭ দিনের মধ্যে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত আন্দাজ বড় হইলে বিদে

অথবা অন্য যন্ত্র দ্বারা জমির মাটি আল্‌গা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভুট্টার জমি যত আল্‌গা হইবে গাছ তত শীঘ্র বাড়িয়া যাইবে। ইহার জমিতে এই সময় সলফেট অফ্‌ এ্যামোনিয়া সার প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গাছগুলি বড় হইয়া উহাতে মোচা ধরিলে গবাদি পশুর খাদ্যের নিমিত্ত উহা কাটিয়া আনা আবশ্যক। মোচা-গুলি সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে এবং গাছের মাথা শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে উহা শস্যের নিমিত্ত কাটিয়া আনা উচিত। বিঘাপ্রতি প্রায় ৪-৫ হাজার মোচা অথবা ৬-৭ মণ শস্য ও ৮-১০ মণ শুষ্ক গাছ বা খাদ্যোপযোগী গবাদি পশুর কাঁচা গাছ ৭০-৮০ মণ পাওয়া যায়। ইহার ফলাবরণী পত্র হইতে কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

যব ও গমের ন্যায় ভুট্টা গাছে মাঠফড়িং ও মাজরা পোকার উপদ্রব হইয়া থাকে। যব ও গমের যে ভাবে যত্ন লইতে হয় ইহারও সেইভাবে পরিচর্য্যার দরকার।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং অর্শ, গুল্ম, ব্রণ ও যক্ষ্মারোগের উপশম-কারক।

যই

যই ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে যে জাতীয় যই-এর চাষ হয় তাহা ব্যতীত ইহার কতকগুলি বিভিন্ন উপ-জাতি আছে। হিমালয় প্রদেশে কতকগুলি বন্য জাতীয় যই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যই গাছ দেখিতে যবেরই মত, তবে যবের দানার অগ্রভাগে একটি লম্বা শুঁয়া থাকে কিন্তু যই-এর তাহা থাকে না। শস্যের জন্য ইহার চাষ এদেশে খুবই কম হইয়া থাকে। পশুখাদ্যের জন্যই এদেশে অল্প পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকা, ইউরোপ, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে মানুষ ও পশুখাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যই-এর চাষ হইয়া থাকে।

যই বীজ সুপক্ক হইবার পূর্ব্বেই উহা কাটিয়া লওয়া উচিত। যই অধিক পরিপক্ক হইলে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। ধান বা গমের খড় অপেক্ষা ইহার খড় অধিক পুষ্টিকর। যই-এর তুষ বা খোসা ছাড়াইয়া যাঁতায় সুক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া লইলে অথবা ঢেঁকিতে কুটিয়া লইলে ওটমিল প্রস্তুত হয়। যই-এর ময়দা দ্বারা রুটী ও বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেরূপ মৃত্তিকা বা আবহাওয়ায় যব বা বার্লি ও গম জন্মে সেইরূপ স্থানে যই-এর চাষ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের নিম্নপ্রদেশে ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি

১২।১৪ মণ গোবরসার এবং ৫।৬ সের সোরা মিশ্রিত করিয়া জমি ২।৩ বার কর্ষণ করিয়া বিঘাপ্রতি ৬।৭ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।

মটর এবং যই এক সঙ্গে বপন করিতে পারা যায়। বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের যই এবং ৫।৬ সের মটর একত্রে ছড়াইয়া বপন করা চলে। পশুখাদ্যের জন্য ইহার চাষ করিলে গাছগুলি ১॥০-২ হাত বড় হইলে একবার কাটিয়া লওয়া যায়। প্রথমবার কাটিয়া লইবার পর জমিতে জল-সেচন পূর্ব্বক বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া অথবা সোরা ছড়াইয়া দিলে গাছগুলি অতি শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং একমাসের মধ্যেই পুনরায় কাটিয়া লইবার উপযোগী হয়। এইরূপে ৩।৪ বার জমি হইতে উহাদিগকে আবশ্যক মত কাটিয়া লওয়া হয়। ফসলের জন্য চাষ করিলে গাছগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবার পর মাঘ ফাল্গুন মাসে উহা জমি হইতে কাটিয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ৬-৭ মণ শস্য ও ১০-১২ মণ শুষ্ক খড় পাওয়া যায়।

জুয়ার বা দ্বেধান

জুয়ার বাঙ্গলায় দ্বেধান বা দেবধান্য নামে পরিচিত। জুয়ার গাছের আকার অনেকটা ভুট্টার মত। বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুব কম। সামান্য দুই-এক স্থানে পশুখাদ্যের নিমিত্ত ইহার চাষ হইতে দেখা যায়। পঞ্জাব, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ অধিক প্রচলিত এবং ঐ অঞ্চলে ইহা একটি প্রধান খাদ্যশস্য মধ্যে পরিগণিত। জাতি নির্ব্বিশেষে ইহা মনুষ্য ও পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অনুর্ব্বর ভূমিতেও জুয়ার চাষ করা চলে।

দোআঁশ মৃত্তিকা জুয়ার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এঁটেল মৃত্তিকায় ইহা জন্মিলেও ফলন কম হইয়া থাকে। নিম্ন জলা জমি ইহার চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পশুখাদ্যের জন্য লাগাইতে হইলে দেশী লাল ও সাদা জুয়ারের বীজই উৎকৃষ্ট। ইহাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে, যথা—রবি ও খরিপ। রবি জুয়ার বসন্তকালে পরিপক্ক হয় এবং যাহা শরৎকালে পক্ক হয় তাহাকে খরিপ বলা হয়।

জুয়ারের জমি গভীরভাবে চাষ করিবার আবশ্যক হয় না। বর্ষার পূর্ব্বেই ইহার জমি প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ সময় বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ গোবরসার অথবা ২৫।৩০ সের সলফেট্ অফ্ এ্যামোনিয়া বা নাইট্রেট অফ্ সোডা জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের (পশুখাদ্যের জন্য)

বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। শস্যের জন্য বিঘাপ্রতি ১৷৷০ সের আন্দাজ বীজ ছিটাইয়া বপন করিলে চলে। বীজ বপনের সময় ঘন করিয়া বীজ বপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঘন করিয়া বপন করিলে উহার ডাঁটাগুলি কোমল থাকে, নচেৎ উহা শক্ত হইয়া যায় ও গরুকেও সব সময় খাওয়ান চলে না।

জুয়ার গাছ ছোট অবস্থায় অর্থাৎ ফুল ধরিবার পূর্ব্বে পশুদের খাইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহার বীজ বপনের পূর্ব্বে এবং গাছ জন্মাইবার পর বৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃষ্টির অভাবে জুয়ার গাছ ভাল বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে স্থানে অনাবৃষ্টি ঘটে তথায় জুয়ার গাছে প্রুসিক্ এসিড্ (Prusic Acid) নামক একপ্রকার বিষ সঞ্চারিত হয়। বীজ সম্পূর্ণ পক্ব হইলে শস্যের জন্য কাটিয়া লওয়া আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ২-৩ মণ ফসল ও ১৫০-২০০ মণ পশুখাদ্যোপযোগী কাঁচা গাছ বা ৪০-৫০ মণ শুষ্ক খড় পাওয়া যায়। গাছে ফুল ধরিবার পর হইতেই উহা জন্তুদের খাইতে দিতে পারা যায়। গাছের সবুজ অবস্থায় উহার গোড়া হইতে কাটিয়া পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহার করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, ক্লেদজনক, পিত্তশ্লেষ্মানাশক এবং শরীরের কৃশতাকারক।

কাঁওন

এদেশে ইহার চাষ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার ব্যবহার আছে। ইহার বীজ অতি ক্ষুদ্র। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হয়। দরিদ্র লোকেরাই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

সকল প্রকার মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার জমিতে লাঙ্গল দিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিঘাপ্রতি দুই সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। শ্রাবণ মাসে গাছে শীষ জন্মে এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল পারিপক্ব হয়। ফসল সম্পূর্ণ পরিপক্ব হইলে জমি হইতে কাটিয়া আনা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ৩ মণ বীজ ও পশুখাদ্যের উপযোগী ৪-৫ মণ শুষ্ক খড় উৎপন্ন হয়।

বাজরা

ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। এদেশে ইহার চাষের প্রচলন নাই। পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বেলে মাটিতে এবং এদেশ অপেক্ষা যে দেশে বৃষ্টির পরিমাণ কম সেইস্থানে ইহা ভাল জন্মে। জমিতে লাঙ্গল

দিয়া জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বিঘাপ্রতি দুই সের আন্দাজ বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল পাকিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ২ মণ বীজ ও ৪-৫ মণ শুষ্ক খড় উৎপন্ন হয়।

কোদো

ইহা বাজরা জাতীয় ফসল। এদেশে ইহার চাষ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহার চাষ হয়। দরিদ্র লোকেরাই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহা হইতে একপ্রকার চাউল উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহা পুষ্টিকর নয়। ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক নাই। বেলে জমিতে এবং অল্প বৃষ্টিতেও ইহা ভালরূপ জন্মে। জমিতে লাঙ্গল দিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বিঘাপ্রতি ৩ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি তিন মণ দানা উৎপন্ন হয়। ইহার খড় বা বিচালি বিষাক্ত। সুতরাং গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুদের অভক্ষ্য। শস্য পাকিলে বীজ সমেত শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া পরিত্যক্ত খড়গুলি জমিতে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

পশুখাদ্য

নিম্নলিখিত শস্যগুলি পশুখাদ্যের জন্য চাষ করা যাইতে পারে। বালুকাময় জমিতে এবং অল্প বৃষ্টিতেও ইহারা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের চাষে কোন সারের আবশ্যক নাই এবং বিশেষ কোন পরিচর্য্যারও আবশ্যক করে না।

মাড়ুয়া:—জমিতে পূর্ব্ব হইতেই লাঙ্গল দিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিঘাপ্রতি ২।৩ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। ভাদ্র মাসে ফসল পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি ২-৩ মণ বীজ ও ৪-৫ মণ খড় উৎপন্ন হয়।

শ্যামা:—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে লাঙ্গল দিয়া বিঘা-প্রতি ২ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করা চলে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি ৩ মণ দানা ও ৫-৬ মণ শুষ্ক খড় উৎপন্ন হয়।

চিনা:—মাঘ ফাল্গুন মাসে জমিতে চাষ দিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিঘাপ্রতি ২ সের বীজ লাগে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি ৩ মণ বীজ ও ৪-৫ শুষ্ক খড় জন্মিয়া থাকে।

জাপানী মিলেট নামক এক জাতীয় শস্য কৃষি বিভাগ

হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ইহা বৎসরে দুইবার,—একবার বর্ষায় ও একবার শীতে জন্মান চলে এবং ইহার ফসল ৩।৪ বার কাটিয়া লওয়া যায়।*

ফাপর বা রাজগীর

কোন কোন স্থানে ইহাকে রাজগীর বলে। ইহার গাছ সামান্য লতানিয়া। গাছের পাতা ছোট ছোট ও চাকা চাকা। বীজের আকার গমের ন্যায় কিন্তু মেস্তার ন্যায় কোণবিশিষ্ট। ফাপরের বীজ হইতে গমের ন্যায় উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রস্তরময় নীরস জমিতেও ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত করিয়া বিঘাপ্রতি ৮।১০ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। বীজ ছড়াইবার পর দুই-আড়াই মাসের মধ্যেই ফসল পাকিতে আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার বীজ বপন করা আবশ্যক। তিন মাসের মধ্যেই ফসল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়। এই সময় জমি হইতে ফসল কাটিয়া আনা আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ৬-৭ মণ শস্য জন্মে।

---

* এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখকের 'পশুখাদ্যের চাষে' বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার খড়, ডাঁটা প্রভৃতি গবাদি পশুর পুষ্টিকরখাদ্য। ইহার ছাতু ও ময়দা যব অপেক্ষা পুষ্টিকর। ফাপরের কচি পাতা শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া ব্যবহার করা যায়। ইহার দানা খাইলে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি অধিক পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করে। ফাপর, আর্টিচোক প্রভৃতি ফসল শীত ও গ্রীষ্মে বিনা-সারে, অল্পবৃষ্টিতে এবং কঠিন মৃত্তিকাতেও জন্মিতে পারে। এই সমস্ত ফসলের চাষ যাহাতে এদেশে অধিক বিস্তৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ফসলের দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

নেশার গাছ ও মসলা (Spices & Narcotics)

তামাক

ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রকূট বা ধূম্রপর্ণী। বাঙ্গলায় ইহাকে তামাক এবং হিন্দীতে তামাকু কহে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইহা আমেরিকা হইতে বিলাতে আমদানি হয়। পর্ত্তুগীজেরাই ইহা ইউরোপ হইতে ভারতে আনিয়াছিল। ১৬১৭ অব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইহা ভারতের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় তিনি আইন প্রবর্ত্তন দ্বারা তামাকের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকাল হইতেই এদেশে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত।

পূর্ব্বে কেবল গুড়ুকের প্রচলন ছিল কিন্তু অধুনা বিড়ি, চুরুট, সিগারেট, নস্য, জরদা, খৈনী প্রভৃতি নানা আকারে ইহার প্রচলন হওয়ায় ভারতে বিভিন্ন জাতীয় তামাকের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। দোক্তা তামাক গুড় ও নানাপ্রকার মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়ুক তামাক প্রস্তুত করা হয়। বঙ্গদেশে ইহারই ধূমপান অধিক প্রচলিত। এই ধূমপানের

বিশেষ কিছু গুণ লক্ষিত হয় না। বরং ইহা দ্বারা শারীরিক কৃষতা, ফুস্‌ফুসের বলহানি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

মতিহারী তামাক পানের মসলা বা দোক্তারূপে ব্যবহৃত হয়। স্ফূর্ত্তি, জর্দ্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে তামাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকায় সাজিয়া হুঁকায় যে তামাক ব্যবহার করা হয় তাহা পুরুপাতাবিশিষ্ট ও উগ্রগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মতিহারী, ভেঙ্গী, হিংলী, উজানী প্রভৃতি তামাক হুঁকার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই অনেকটা মতিহারের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কিন্তু ইহাদের মধ্যে মতিহার তামাকই এই কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেঙ্গী তামাক বর্ম্মা চুরুট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিড়ি প্রস্তুতের জন্য যে তামাকের পাতা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রায় অনেকটা হরিদ্রাবর্ণের হয় এবং তাহা মতিহার প্রভৃতি তামাকের ন্যায় সেরূপ উগ্রগন্ধযুক্ত হয় না। সাধারণতঃ নেপালী ও গুজরাটী তামাক বিড়ি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোম্বাই ও পশ্চিমাঞ্চল হইতেই প্রধানতঃ ইহা অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। সুমাত্রা তামাকের পাতা পাতলা, মসৃণ এবং সুন্দর সোনালি রংয়ের। এই তামাকের পাতা দিয়া ভাল চুরুটের বহির্ভাগ বা আবরণী তৈয়ারী হয়। সুমাত্রা তামাক হইতে যেমন চুরুটের আবরণী তৈয়ারী হয় ম্যানিলা, মরিসাস্‌, হ্যাভানা প্রভৃতি তামাক হইতে সেইরূপ

চুরুটের ভিতরের অংশ তৈয়ারী হইয়া থাকে। ভার্জ্জিনিয়া ও এড্‌কক তামাক হইতে সুন্দর সিগারেট প্রস্তুত হয়।

ভারতে প্রায় সর্ব্বত্রই তামাকের চাষ হইয়া থাকে কিন্তু মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের তামাকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ইহার চাষ হয় বটে কিন্তু চাষের বিবরণ উত্তমরূপে জানা না থাকায় অনেক স্থানে ইহা ভাল জন্মে না। বঙ্গদেশে রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পুর্ণিয়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাবনা, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে ভেঙ্গী, হিংলী ও মতিহারী তামাকের চাষ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে আনীত সুমাত্রা, হ্যাভানা, তুরস্ক, ভার্জ্জিনিয়া, মরিসাস্, ম্যানিলা, এড্‌কক প্রভৃতি নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট চুরুট প্রস্তুতের উপযোগী তামাকের অল্প-বিস্তর চাষ হইতেছে কিন্তু সকল জাতীয় তামাক বঙ্গদেশে ভালরূপ জন্মে না। ইহা স্থানীয় জলবায়ুর উপর কতকটা নির্ভর করিয়া থাকে। বাংলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রংপুর জেলা তামাকের চাষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। রংপুর জেলার উত্তরাংশেই তামাকের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

উচ্চ অপেক্ষা ঈষৎ নিম্ন ও সমতল ভূমিই তামাকের পক্ষে প্রশস্ত এবং ইহার চাষের জন্য বিশেষ উর্ব্বরা জমি আবশ্যক। লতাপাতা, ঘাস, জঙ্গল প্রভৃতি পচা কালরঙ্গের দোআঁশ মৃত্তিকায় তামাক ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ঈষৎ বেলেমাটিতেও তামাক মন্দ হয় না। কিন্তু বালুকাপ্রধান জমিতে ইহা ভাল

জন্মে না। সাধারণতঃ বেলে দোআঁশ জমিতে তামাকের চাষ দেওয়া উচিত। নদীর চর বা পলিপড়া জমিতে তামাকের পাঁতা অত্যন্ত মোটা হয় কিন্তু কর্দ্দমাক্ত জমিতে তামাক অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জমিতে সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী তামাকের চাষ করা হয় তাহাতে গোবরসার না দেওয়া ভাল। জমিতে খইল না দিয়া গাছের গোড়ায় জিপসাম্ দিলে খুব ভাল হয়। তামাককে সহজদাহ্য ও সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট করিতে হইলে পটাসিয়াম্ সলফেট্, কার্ব্বনেট, সোরা ও জিপসাম্ প্রয়োগ করা বিশেষ আবশ্যক।

মাটি।

সাধারণতঃ ভাদুই ফসল সংগৃহীত হইবার পরই ভাদ্র আশ্বিন মাসের মধ্যেই জমি প্রস্তুত ও জমি কর্ষণাদি কার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হয়। ইহাঁর জমিতে গভীরভাবে চাষ দিয়া ক্ষেত্রস্থ ইট-পাটকেল, গাছের শিকড়, পরগাছা প্রভৃতি বাছিয়া মাটি পরিষ্কার করিয়া বিঘাপ্রতি ১ মণ চূণ মিশাইয়া পুনঃপুনঃ জমিতে লাঙ্গল দিয়া মাটি চূর্ণ করা আবশ্যক। তামাকের মাটি অত্যন্ত মিহি হওয়া দরকার। মোট কথা, ৮।১০টি চাষের কম উৎকৃষ্ট তামাক জন্মাইতে পারা যায় না। লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে জমিতে পুষ্করিণীর পাঁকমাটি, গোয়ালের আবর্জ্জনা, পুরাতন গোবরসার প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর-সার, ২।৩ মণ কাঠের ছাই ও ৮।১০ সের সোরা অথবা ১ মণ

সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া বা ২০।২২ সের হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রে সার দিবার পর মই দিয়া সারের সহিত ক্ষেত্রের মাটি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তামাকের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা দরকার।

চারা প্রস্তুত।

অনেকে প্রস্তুত জমিতেই তামাকের বীজ বপন করিয়া থাকেন কিন্তু উহা অপেক্ষা হাপোরে চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেই চারা জমিতে বপন করাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রাবণ মাসের শেষে অথবা ভাদ্র মাসের প্রথমেই হাপোরে বীজ বপন করিতে হয়। ১০।১২ হাত লম্বা ও ২॥০ হাত প্রশস্ত স্থান বীজতলার জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। উহা পার্শ্ববর্ত্তী মাটি অপেক্ষা উচ্চ হওয়া উচিত। উহার মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে কিছু উদ্ভিজ্জসার, পুরাতন গোময়, কাঠের ছাই ও সামান্য হলুদের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া উহা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। হাপোরের মাটি সম্পূর্ণ ঝুরা হওয়া আবশ্যক। বীজ বপনের সময় সামান্য হাল্‌কা ঝুরা মাটি অথবা বালি বীজের সহিত মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক, কারণ তামাকের বীজ এত ক্ষুদ্র যে উহা ক্ষেতে সমভাবে ছিটান বিশেষ কষ্টসাধ্য। বীজ বপন করিবার পর হাপোরের মাটি হস্ত দ্বারা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া অল্প চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। বীজ বপন করিবার ২।৪ দিন পরে বৃষ্টি না হইলে কোন সূক্ষ্ম

ছিদ্রযুক্ত ঝারি দ্বারা জমিতে অল্প জলসিঞ্চন আবশ্যক। বীজ বপনের পর ৫০।৬০ দিনের মধ্যেই চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। এই সময় চারাগুলি জমিতে রোপণ করা যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি আড়াই তোলা বীজ লাগে অর্থাৎ হাপোরে ২॥০ তোলা বীজের চারা প্রস্তুত করিলে উহা এক বিঘা জমির পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে। ঘনভাবে বীজ বোনা মোটেই উচিত নহে। বীজতলা অতিবৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্য হোগলার ছাউনি করিয়া দিতে হয় এবং তাহাতে সুফল ফলিয়া থাকে।

ক্ষেত্রের কর্ষণাদি কার্য্য শেষ হইয়া থাকিলে কার্ত্তিক মাসে ক্ষেতে চারা রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪।৫টি পত্রবিশিষ্ট হইলে উহা জমিতে নাড়িয়া বসান আবশ্যক। হাপোর হইতে চারা তুলিবার পূর্ব্বে হাপোরে জল-সেচন করা দরকার। রোপণকার্য্য অপরাহ্নকালেই করা যুক্তিসঙ্গত। বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট গাছ হইলে দেড় হাত অন্তর লাইন দিয়া জমিতে দেড় হাত ব্যবধানে এক-একটি চারা রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর কিছুদিন যাবৎ চারাগুলি দিবাভাগে কলার পেটো, কচুপাতা, কলাপাতা বা ঐরূপ কোন দ্রব্য দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। তামাকের জমিতে জল দেওয়া একান্ত আবশ্যক, নহিলে ফলন ভাল হয় না। সার

চারা রোপণ।

ও জলের উপর তামাকের অনেক কিছু নির্ভর করে। তামাকের জমিতে খইলসার দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে তামাকের গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং উহার পাতা তত পরিপুষ্ট হইতে পারে না। অপুষ্ট তামাকের পাতা শুষ্ক অবস্থায় ঝাঁঝাল হয় না। উহা তিক্ত আস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। গাছগুলি বড় হইলে নিড়ান দিয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া এবং জমি হইতে তৃণাদি আগাছা তুলিয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক। গাছ একটু বড় হইলে গোড়ায় পিলি বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। গাছে কুঁড়ি বাহির হইলে আর জমিতে নিড়ান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক গাছে ১০।১২টি পাতা রাখিয়া কুঁড়ি সমেত গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। গাছে অধিক পাতা জন্মিতে দিলে উহা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বীজের জন্য কতকগুলি সতেজ গাছ ক্ষেত্রমধ্যে নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিতে হয়। এই গাছে কুঁড়ি জন্মিলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত নহে। বীজের গাছ ব্যতীত অন্য গাছে মুকুল জন্মিলে ডগা সমেত উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং গাছের নীচের দিকের ৩।৪টি পাতাও ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। নীচের পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট জাতীয় তামাকের চারা ঘনসন্নিবিষ্ট-ভাবে এবং যে জাতি তত উৎকৃষ্ট নহে তাহাদের একটু ব্যবধান রাখিয়া রোপণ করা ভাল।

মৃত্তিকা এবং স্থানভেদে তামাকের পাতাগুলি ৩।৪ মাসের

মধ্যেই পরিপুষ্টি লাভ করে। তামাকের পাতার সবুজ রং নষ্ট হইয়া হরিদ্রাভ হইলে অথবা তাম্রবর্ণ ধারণ করিলে এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কর্কশ ও চট্‌চটে বোধ হইলে উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। পত্র পরিপক্ক হইলে উহা অধিক দিন ক্ষেতে রাখা উচিত নহে, ইহাতে তামাকের স্বাভাবিক গুণ হ্রাস হইতে থাকে। গাছের পাতা সংগ্রহ করিবার সময় হইলে যদি ২।৪ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে পাতাগুলি সত্বর কাটিয়া লইতে হয়, কারণ ঐ সময় বৃষ্টি হইলে তামাকের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কুয়াসা অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিবস বাদ দিয়া যে দিন রৌদ্র উঠিবে সেই দিন প্রাতঃকালেই তামাকের পাতা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

পত্র-সংগ্রহ।

দেশী তামাক :—ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে তামাকের পাকা পাতাগুলি কাটিয়া লইয়া ডাঁটাশস্তে চারিটি করিয়া পাতার গুচ্ছ বাঁধিয়া প্রায় শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত তীব্র আলোক ও বাতাসযুক্ত ছায়াশীতল স্থানে দড়ি অথবা বাঁশের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। পাতাগুলি প্রায় শুকাইয়া আসিলে পর উহাদিগকে ঘরে রাখা হয় এবং ২।২॥০ মাস পরে ব্যবহারোপ-যোগী হইয়া উঠে। তখন ইহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করা হয়।

মতিহারী :—পাতাগুলি কাটিয়া লইবার পর উহাদিগকে গুচ্ছ বাঁধিয়া দড়ি বা বাঁশের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এমনভাবে

রাখিতে হইবে যাহাতে উহার পত্রগুলি দিবাভাগে রৌদ্র ও রাত্রে শিশিরসিক্ত হইতে পারে কিন্তু বৃষ্টি হইলে তখনই উহা কোন আবৃত স্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। ২।৩ দিবস পরে পত্রগুলি শুষ্ক হইলে পর উহাদিগকে জাগ দিতে হইবে। জাগ দিবার সময় পাতাগুলি পর পর সাজাইয়া স্তূপীকৃত করিয়া উহার উপর কিছু পলখড় বিছাইয়া কোন ভারী জিনিস চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ৫।৬ দিন এইরূপ ভাবে রাখিবার পর পাতাগুলি বাহির করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পলখড় বিস্তৃত করিয়া জাগের উপরিভাগস্থ পত্রগুলি নিম্নদিকে ও নিম্নভাগস্থ পত্রগুলি উপরের দিকে পর পর সাজাইয়া পুনরায় জাগ দিতে হইবে। ২।৩ বার এইরূপ জাগ দিবার পর উত্তম পত্রগুলি বাছিয়া লইতে হয়। পুনঃপুনঃ জাগ দেওয়ায় পাতাগুলি ভাঙ্গিবার উপক্রম হইলে পাতার উপর কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিতে পারা যায়। ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে বিঘাপ্রতি ৭-৮ মণ শুষ্ক পত্র বা তামাক পাওয়া যায়।

অন্যান্য ফসল অপেক্ষা তামাকের শত্রু অল্প। তামাকের তীব্রগন্ধে ক্ষেতের অনেক ফসলের পোকা পালায় কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তামাকের পাতা পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া তীব্র-গন্ধযুক্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত পোকা-মাকড়ের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ তামাকের ক্ষেতে হল্‌দে রঙ্গের এক জাতীয় আগাছা জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা তামাক গাছের গোড়া হইতে রস সংগ্রহপূর্ব্বক গাছ-

গুলিকে ক্ষীণজীবী করিয়া তোলে। এইজন্য এই আগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটন করাই শ্রেয়ঃ। বীজ বুনিবার পর হইতে তামাকের জমিতে মাঠফড়িঙের বিশেষ উপদ্রব হয়। ইহারা অঙ্কুরিত বীজের কল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতাগুলি পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। জমিতে নিম্বের খোল অথবা কেরোসিন মিশ্রিত ছাই ছড়াইয়া দিলে ইহারা পলাইয়া যায়।

চারা অবস্থায় এক জাতীয় উইচিংড়ি এবং চোরা পোকা তামাক গাছের পাতা ও কচি ডগা কাটিয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। চোরা পোকা এবং উইচিংড়ি দিনের বেলায় গর্ত্তের মধ্যে মাটির নীচে থাকে এবং রাত্রিকালে বাহির হইয়া ফসলের ক্ষতি করে। সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে সাধারণতঃ ঝিল্লিরব শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চীৎকারকেই ঝিল্লিরব কহে। যে সময় এই পোকা ডাকিতে থাকে তখন তাহাদের গর্ত্ত খুঁজিয়া বাহির করিয়া গর্ত্তমধ্যে জল ঢালিয়া দিলে ইহারা বাহির হইয়া পড়ে। তামাক বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ক্ষেতে উইচিংড়ি আছে জানিতে পারিলে জমি পরিষ্কার করিয়া ইহারা যে গাছের পাতা খাইতে ভালবাসে সেই গাছের পাতা অভাবে অন্য গাছের সবুজ পাতা লেড আর্সিনিয়েট নামক সেঁকোবিষের জলে ভিজাইয়া রাত্রিকালে জমির মধ্যে মধ্যে রাখিয়া দিলে এই বিষাক্ত পাতা খাইয়া পোকাগুলি মরিয়া যায়। কাঁচ পোকা উইচিংড়ির পরম শত্রু; উইচিংড়ি দেখিতে পাইলেই ইহারা মারিয়া ফেলে।

তামাক গাছের ডাঁটা সময় সময় আবের ন্যায় ফুলা ফুলা দৃষ্ট হয়। এইরূপ হইলে ফুলা স্থানটি চিরিয়া পোকা বাহির করিয়া দিতে হয়। আবশ্যক হইলে গাছটিকে জমি হইতে উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এক জাতীয় কীট সাধারণতঃ পাতার ডাঁটায় বালুকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। ঐ ডিম ফুটিয়া কীড়াগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঁটার মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে এবং ক্রমে ভিতরে ছিদ্র করিয়া গাছের কাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। পোকাগুলি যেস্থানে একত্র অবস্থান করে সেই স্থান ফোলা ফোলা দেখায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—ক্রিমিনাশক ও শোথনিবারক। তামাকের ধূম পান করিলে দাঁতের গোড়ার শোথ নিবারিত হয় এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হইয়া থাকে। তামাকের ধূমপানে কৃশ ও অজীর্ণরোগী, এবং শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তির বিশেষ অপকার হইয়া থাকে।

তামাকের গুণ।

ইহা হইতে তৈলাংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে পাতাগুলি মদে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পাতাগুলি নরম এবং বর্ণ উজ্জ্বল করিতে হইলে গন্ধকের ধূম দিতে হয়। পাতার দুর্গন্ধ দূর করিতে হইলে জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

কাফি

ইহার আদি জন্মস্থান আফ্রিকা। আফ্রিকার আবিসিনিয়া দেশ হইতে ইহা প্রথমে আরব ও তুরস্কে নীত হয়। তথা হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হল্যাণ্ডে আনীত হয় এবং সেখান হইতে ইহা অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে।

আরব ও পারস্য দেশে ইহার ব্যবহার ও চাষ অধিক প্রচলিত। ভারতবর্ষে ইহার চাষ কদিচ্ দৃষ্ট হয়। আরব দেশে কাফিকে কাওয়া বলে। ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। সাহেবেরা ডিনারের পর কাফি পান করেন। এইজন্য অনেক বড় বড় সাহেবী হোটেলে কাফিপানের বন্দোবস্ত থাকে।

পার্ব্বত্য উর্ব্বরা জমিতে ইহা ভাল জন্মে। ৬০ হইতে ৮০ ডিগ্রী ফার্ণহাইট উত্তাপযুক্ত স্থানে ও যেখানে বৃষ্টিপাত গড়ে ১৫০ ইঞ্চি অপেক্ষা অধিক নয় সেস্থানে কফি গাছ ভাল জন্মে। এদেশে দার্জ্জিলিং, চট্টগ্রাম, ময়ূরভঞ্জ, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে অল্প পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ১।০ সের বীজ লাগে। জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর অন্তর ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ৩।৪টি পত্রবিশিষ্ট হইলে হাপোরে প্রায় এক হাত অন্তর অন্তর নাড়াইয়া বসাইতে হয়। গাছ-

গুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে উহাদিগকে জমিতে ৫।৬ হাত অন্তর স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে। গাছ ২।৩ বৎসরের হইলে পুষ্পিত হয়। সাধারণতঃ চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতেই ফল পক্ক হইতে আরম্ভ হয়। ফল কাল্‌চে লালবর্ণ ধারণ করিলেই উহা পক্ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কাফির গাছ সাধারণতঃ ১২।১৪ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার ফুল সাদা এবং মটরের আকৃতিবিশিষ্ট। ফলের সূক্ষ্ম চূর্ণ কোকোর ন্যায় পান করা হয়। ইহার ব্যবহার গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পক্ষে অহিতকর। সেইজন্য এদেশে ইহার চাষ বা ব্যবহার অধিক প্রচলিত নহে। ইহা কিছুদিন নিয়মিতরূপে পান করিলে হৃৎপিণ্ড খারাপ হয় এবং যৎকৃতের রোগ জন্মে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—নিদ্রানাশক, অত্যন্ত উত্তেজক এবং স্ফূর্ত্তিদায়ক। ইহা পানে চা অপেক্ষা শরীর গরম থাকে। মদ্যপান জনিত অবসাদে চা অপেক্ষা ইহা অধিক ফলদায়ক। ডাঃ হিস্পারের মতে অতিরিক্ত মূত্রস্রাবে এবং স্নায়বিক এবং তরুণ অজীর্ণরোগে অল্প পরিমাণে কড়া কাফিপানে সুফল পাওয়া যায়।

চা

কেহ কেহ ইহা চীনদেশ হইতে এদেশে নীত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা সত্য নহে। হিমালয়ের পাদদেশ এবং তৎসন্নিহিত উপত্যকা, বিশেষতঃ ত্রিপুরা, লুসাই, চীন, মণিপুর, নাগা, পাটকই প্রভৃতি পর্ব্বত-মালা বেষ্টিত স্থানই ইহার প্রাকৃতিক জন্মভূমি। ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত চীন পর্ব্বতস্থ চা গাছ মণিপুর, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে জাত গাছ অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। উহার পাতা সাধারণতঃ এক ইঞ্চি লম্বা ও অর্দ্ধ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। আসামের চা-এর পাতা ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা এবং দেড়-দুই ইঞ্চি চওড়া হয় কিন্তু কাছাড় ও লুসাই অঞ্চলের চায়ের পাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় হইয়া থাকে। ঐ স্থানে জাত চায়ের পাতা ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫।৬ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে।

ইহার জন্য পার্ব্বত্য ঢালু ও আর্দ্র জমি দরকার। ইহার জমিতে কিছু চূণ, নাইট্রোজেন এবং পটাস সার বিশেষ আবশ্যক। যে স্থানে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয় সেই স্থানের উৎপন্ন চা বীজ চায়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। চৈত্র মাসে ইহার বীজ বপন করা হয়। প্রথমে বীজতলায় চারা জন্মাইয়া চারাগুলি ৮।১০ মাসের হইলে উহাদিগকে কর্ষিত জমিতে ৩-৩৷৷০ হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে।

বিঘাপ্রতি প্রায় ৬০০ চারা লাগে। প্রথম দুই বৎসর গাছ হইতে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা উচতি নয়, তৃতীয় বৎসর হইতে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাতা তুলিবার উপযোগী হইয়া থাকে। এক বিঘা জমি হইতে প্রায় দুই মণ পাতা পাওয়া যায়। ইহার গাছ হইতে প্রায় ২০।২৫ বৎসরকাল পাতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

চায়ের বীজ হইতে প্রায় শতকরা ২০।২৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। উহা সাবান প্রস্তুত কার্য্যে এবং আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা গবাদি জন্তুর আহারের অনুপযোগী—উহা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

আমাদের দেশে আজকাল চায়ের ব্যবহার খুব বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামেও চা পান প্রচলিত হইয়াছে।

চায়ের চাষ ও শিল্প বিষয়ে অনেক বড় বড় পুস্তক লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকে তাহা আলোচনার প্রয়োজন নাই। এই চাষ ও শিল্পে চা-করগণের প্রচুর অর্থাগম হইতেছে।

পান

পান চাষ বিশেষ লাভজনক। বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। অল্প ভূমি অপেক্ষা অধিক ভূমিতে পান চাষ করিলে গড়ে খরচা কম পড়ে; সুতরাং এক সঙ্গে ৮।১০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতে পারিলে পান চাষের খুব সুবিধা হয়। হিসাবমত চাষ করিতে পারিলে এক বিঘা জমি হইতে বৎসরে খরচ বাদে ৪০০।৫০০৲ টাকা লাভ করা যাইতে পারে।

পানের অনেক গুণ আছে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, মলভেদক, মলবর্দ্ধক, মুখের শুদ্ধি ও দুর্গন্ধনাশক। নূতন পান—অধিক গুরুপাক ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। পুরাতন পান—অল্প কটুরস ও অধিক গুণশালী। কবিরাজগণ অনেক রোগে ঔষধের সহিত অনুপানরূপে ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শরীরে এবং জ্বর, পিত্ত, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগে পান খাওয়া অনিষ্টকারক। পানের বোঁটার রস চক্ষুতে দিলে রাত্র্যান্ধতা নিবারিত হয়। ইহাতে ভিটামিনের প্রাচুর্য্য আছে।

বঙ্গদেশে নানাজাতীয় পান দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের প্রত্যেকের আস্বাদনও বিভিন্ন প্রকার। বাজারে সাধারণতঃ ছাঁচিপান, মিঠাপান, দেশীপান, কর্পূরীপান প্রভৃতি নানপ্রকার পান দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একপ্রকার পান আছে,

জাতিভেদ।

তাহা সাধারণের পক্ষে জন্মান অতি সহজ ব্যাপার। সেগুলি দেওয়ালের গায়ে এবং আম, কাঁঠাল, সুপারী প্রভৃতি গাছগুলিতে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। উহাকে গাছপান বলা হয়। বরোজে ইহার স্থান নাই।

ইহার জন্মস্থান মোদনাপুর এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশ। ইহার বর্ণ একটু শ্বেত আভাযুক্ত সবুজ।

মিঠাপান। এই পান সুস্বাদু ও সুগন্ধজনক। পানের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সেইজন্য ইহার মূল্যও অধিক।

এই পান বর্ণে ও আকারে সাধারণ পানের ন্যায় কিন্তু ইহা একটু খস্‌খসে। নিম্নভাগে সূক্ষ্ম কাল

ছাঁচিপান। কাল শিরা দৃষ্ট হয়। ইহা সুগন্ধযুক্ত এবং মুখের রুচিকারক।

ইহা আকারে ও বর্ণে মিঠা পানের ন্যায়। কেবল আস্বাদনে ইহাতে কর্পূরের ন্যায় গন্ধ

কর্পূরীপান। অনুভূত হয়।

উল্লিখিত তিন প্রকার পান ব্যতীত বাজারে সচরাচর যে সমস্ত পান দেখিতে পাওয়া যায় উহারা

দেশীপান। সকলেই দেশীপানের অন্তর্গত। দেশী-পানও আবার জন্মস্থানভেদে এক একপ্রকার বিশেষত্ব লইয়া রংপুরী, বারুইপুরী, যশুরে প্রভৃাত বিভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়াছে। রংপুরী পান ক্ষুদ্রাকৃতি এবং উহার পাতা একটু মোটা, সহজে খিলি করা যায় না।

যশুরে পান আকারে বড়, সামান্য পাতলা এবং ঈষৎ কৃষ্ণাভাযুক্ত।

বারুইপুরী পান চর্ব্বণে ছিবড়া পাওয়া যায় না। ইহার পাতা মোটা অথচ কোমল, সহজে খিলি করা যায়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশীপান চর্ব্বণে ছিবড়া থাকে এবং আস্বাদনে সামান্য ঝাল্ লাগে।

গাছপান বাড়ীর আসে-পাশে আম, কাঁঠল প্রভৃতি গাছের উপর লতাইয়া জন্মিতে পারে। ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে পৌষ মাঘ মাসে কোন নির্দ্দিষ্ট গাছের গোড়া হইতে ২।৩ হাত দূরে এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ছাই ও গোবরসার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর বর্ষার সময় চারা সংগ্রহ করিয়া ঐ গর্ত্তে লাগান আবশ্যক। রোপণের পর বৃষ্টি না হইলে আবশ্যক বুঝিয়া কিছুদিন যাবৎ উহার গোড়ায় জল দিতে হইবে। গাছ একটু বড় হইলে কঞ্চির সাহায্যে উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট গাছের উপর উঠাইয়া দিতে হয়। এইরূপে উহা নির্দ্দিষ্ট গাছটি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ লতাইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। গাছ বড় হইলে আবশ্যক মত উহা হইতে পত্র সংগ্রহ করা যায়। কোন কোন স্থানে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত এই গাছ জীবিত থাকে।

স্থান-নির্ব্বাচন।

যে স্থানে বর্ষার জল উঠিতে পারে না এবং বৃষ্টির জলও দাঁড়াইতে পারে না এইরূপ উচ্চ জমি পান চাষের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। অম্ল

বালির ভাগ মিশ্রিত (চেলে) দোআঁশ জমিই পানচাষের বিশেষ উপযোগী। পানের জমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক।

পান গাছের চতুর্দ্দিকে ঘেরা এবং উপরে আচ্ছাদন থাকে বলিয়া উহাকে বরোজ বলা হয়। প্রখর রৌদ্র এবং প্রবল ঝড়ের হাত হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। পান গাছের চতুর্দ্দিকস্থ বেড়া এরূপ শক্ত হওয়া আবশ্যক যাহাতে গৃহপালিত অথবা বন্যপশুগণ বরোজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গাছের অনিষ্ট করিতে না পারে। বরোজের বেড়া সাধারণ বাগিচার বেড়ার ন্যায় ফাঁকা রাখা উচিত নহে। উহার বেড়া এরূপ ঘন হওয়া আবশ্যক যাহাতে অতি অল্প ফাঁকও না থাকে। বাঁশের কঞ্চি, ধঞ্চে কাঠি, পাট কাঠি প্রভৃতি দ্বারা ইহার বেড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বরোজের চতুর্দ্দিকে এক হাত দেড় হাত অন্তর বংশখণ্ড অথবা অন্য কোন সরল খুঁটি পুঁতিয়া উহাদের সাহায্যে বেড়াকে শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। মাঝে মাঝে শক্ত এবং অনেকদিন স্থায়ী থাকে এরূপ খুঁটি পুঁতিতে হইবে ও লম্বা বাখারী বরোজের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে সাজাইয়া ঐ সমস্ত খুঁটির সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। বাঁশের চাটাই ঘনভাবে সাজাইয়া বাঁধিয়া উপরে ছাউনি করিয়া দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি উলু-খড় বিছাইয়া এরূপ শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে যাহাতে ঝড়-

বরোজ।

বৃষ্টিতে উপড়াইয়া না যায়। একবার প্রস্তুত করিলে ১০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত উহা রাখা চলে।

. বরোজের মধ্যে রৌদ্রকিরণ আসিবার জন্য মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা আবশ্যক। উপরের আচ্ছাদন জমি হইতে অন্ততঃ ৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে বরোজের মধ্যে লোকের ইচ্ছানুযায়ী যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটে এবং পানলতাও সেরূপ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। পানের জমিতে যদি'ও হল চালনা করিতে হয় না, তথাপি ইহাতে অনেক পরিশ্রম আছে। ক্ষেত্রমধ্যে পান গাছ রোপণের জন্য সরু সরু জুলি কাটিয়া লাইন করিয়া আইল বাঁধিতে হইবে এবং উহার মধ্যে যাতায়াতের রাস্তার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বরোজের মধ্যে চই, পুঁইডাঁটা, মানকচু, ওল, উচ্ছে, পটল, আকাশ লঙ্কা প্রভৃতি জন্মাইতে পারা যায়। উহাতে বরোজের কোন ক্ষতি হয় না। এতদ্ব্যতীত বরোজের বেড়ার চতুর্দ্দিকে লাইন দিয়া সুপারী গাছও লাগান চলে। ইহাতে বরোজের কোন ক্ষতি হয় না বরং ইহা হইতেও বৎসরে কিছু কিছু লাভ হইতে পারে। এক স্থানে ২০ বৎসরের অধিককাল বরোজ না রাখিয়া স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে পানের চাষে সাফল্য লাভ হইয়া থাকে।

পানের জমিতে পুকুরের পাঁকমাটি প্রয়োগ করিয়া জমি উঁচু করিয়া লইতে হয়।

বর্ষার জল পাইলে পানের গ্রন্থিসমূহ হইতে শাখা

বহির্গত হয়। ঐ শাখাকে পানের 'ল' বা ডগা বলে। ঐ সমস্ত ডগার গ্রন্থিতে মাটি চাপা দিলে উহাতে শিকড় উদ্গত হইয়া থাকে। এইরূপে উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন পুরাতন পানের লতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহাতে মাটি চাপা দিয়াও চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে সমস্ত পানের লতা হইতে গাছ জন্মান হইবে সেগুলি দুই বৎসর কিংবা আরও অধিক পুরাতন হইলে ভাল হয়।

চারা প্রস্তুত প্রণালী।

বঙ্গীয় পানচাষীগণ পানের জমিতে যথেষ্ট খইল ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে শুষ্ক পাঁকমাটির সহিত খইলচূর্ণ মিশাইয়া উহা জমিতে ব্যবহার করা হয়। বিঘাপ্রতি ৬।৭ মণ রেড়ি বা সরিষার খইল ও ২ মণ ছাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্ষার পূর্ব্বে জমিতে বিঘাপ্রতি ১ মণ সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া, ২০।২২ সের সুপারফস্ফেট ও ১ মণ সলফেট অফ্ পটাস ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে পানের আকার বড় হয় এবং ফলন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। আজকাল নাইট্রোফস্ নামক একটি নূতন সার বাহির হইয়াছে। পানের জমিতে ইহা ব্যবহারে বিশেষ সুফল ফলে। উহা বিঘাপ্রতি ১॥০ মণ হইতে ২ মণ প্রয়োগ করা যায়।

সার।

জমি হইতে পরগাছা ও তৃণাদি তুলিয়া ফেলিয়া মাটি চাঁচিয়া

সমতল করিতে হইবে। অনন্তর দুই হাত আড়াই হাত অন্তর সারি দিয়া এক-একটি নালা কাটিতে হইবে। উহা অন্ততঃ ৭৷৮ ইঞ্চি প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। পরে ঐ নালা বা জুলির মধ্যস্থিত মাটি উত্তমরূপে ধূলার ন্যায় চূর্ণ করিয়া তাহাতে পাঁকমাটি ও খইল মিশ্রিত করিতে হইবে। রেড়ির খইল পানের পক্ষে অনিষ্টকারক; সুতরাং উহা প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রত্যেক জুলিতে ৬৷৭ ইঞ্চি অন্তর দুইটি করিয়া চারা জুলির দুই পার্শ্বের দক্ষিণে ও বামে বসাইয়া গোড়ায় মাটি চাপা দিতে হইবে। চারার গোড়ার মাটি যাহাতে আলগা না থাকে এইজন্য উহা অল্প চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি একটু বড় হইলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কঞ্চি অথবা পাটকাঠি পুঁতিয়া যাহাতে লতাগুলি উহাদের সাহায্যে উপরে উঠিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিঘাপ্রতি ৮০০৷৯০০ চারা আবশ্যক।

রোপণ-প্রণালী।

চারাগুলি রোপণ করিবার ৭৷৮ মাস পরে বড় হইলে উহার পত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া পান ভাঙ্গা চলে। মাঘ ফাল্গুন ও আষাঢ় শ্রাবণ মাসই পানের চারা রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। রোপণের পর বৃষ্টি হইলে পানের জন্য জল-সেচনের আবশ্যক হয় না কিন্তু বৃষ্টি না হইলে মাটির অবস্থা বুঝিয়া জল-সেচন করা কর্ত্তব্য। এক বৎসর উহা জন্মাইলে সামান্য পরিশ্রমে ৫৷৬ বৎসর

পর্য্যন্ত উহার পত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। চেষ্টা ও যত্ন করিলে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত একাধিক্রমে পান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় পানচাষেও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আছে। অধিক বর্ষাতে জমিতে জল বসিয়া গাছ হাজিয়া বা পচিয়া যায় এবং অধিক গ্রীষ্মে রৌদ্রের তেজে উহা শুকাইয়া যায়।

পানের 'ধসা' লাগা রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পানের বরোজে ঘুঁটে ও গন্ধকের ধূম প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায়। উইচিংড়ি, ঘুরঘুরে প্রভৃতি পোকাও পানের ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সমস্ত উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গন্ধকের ধোঁয়া দিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। ইন্দুর, সজারু, শূকর প্রভৃতি জন্তুগণও পানের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যাহাতে ক্ষেতের কোন অনিষ্ট না হয় সে বিষয়ে ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষ লক্ষ রাখা আবশ্যক। ধসাধরা রোগ দৃষ্ট হইলে পান গাছটি শিকড় সমেত তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত, কারণ পানের ধসারোগ সাধারণতঃ সহজেই ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া বিশেষ ক্ষতি করে। পানের ধসাধরা রোগের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ অনিষ্টকারক।

ইহার আরও দুই-এক প্রকার রোগ হয় যেমন পাবে-মরা রোগ, মূল-মরা রোগ ইত্যাদি।

পাবে-মরা রোগ :—এই রোগ গাছের পাতায় প্রথমে আরম্ভ হয় তৎপরে উহা ক্রমশঃ ডাঁটার মধ্য পর্য্যন্ত

বিস্তারলাভ করে। সমস্ত গাছটিতে কাল রংএর একপ্রকার দাগ হয় তাহাতে গাছ শীঘ্র মরিয়া যায়। ঐ রোগ আবহাওয়া অনুযায়ী গাছের দেহে বিস্তার লাভ করে। যদি বৃষ্টি-বাদল না হয় তাহা হইলে উহা পাতাতেই নিবদ্ধ থাকে। এই রোগ পানগাছের একটি বিষম রোগ বলিয়া পরিগণিত। ইহার আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিকারের আবশ্যক। এই রোগ হইলে তুঁতের জল বা পাথুরে চূণের জল পিচকারীর সাহায্যে গাছের গায়ে ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে উহার প্রতিকার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লতানিয়া ভূমিসংলগ্ন গাছগুলিতে ঐ রোগ হইয়া থাকে। উহাদের রোগ হইবার পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে বোর্দ্দো মিকশ্চারের জল পিচকারীর সাহায্যে উহার গায়ে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ঐ রোগ সহজে পানের গাছে ধরিতে পারে না।

Angari (আঙ্গারী) :—এই রোগে ডাঁটার গ্রন্থিগুলি কাল কাল হইয়া যায় এবং পচ ধরে।

Bont Angari (বণ্ট আঙ্গারী) :—এই রোগে ডাঁটা পচিয়া যায়।

Tuto (টিউটো) :—এই রোগে পানের পাতায় প্রথমে কাল দাগ ধরে এবং ক্রমে উহা বড় হইয়া সমস্ত গাছে বিস্তৃত হয়।

Nana (নানা) :—এই রোগে পানের ডাঁটা শুকাইয়া যায়।

মূল-মরা রোগ ঃ—সাধারণতঃ শরৎকালের শেষের দিকে এই রোগ গাছের শিকড়ে আরম্ভ হয়। শিকড়ে এই রোগ হইলে সমস্ত গাছ ফ্যাকাশে হইয়া যায় ও শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যায়। উহার প্রতিকার করিতে হইলে বোর্দ্দো মিক্‌শ্চার উহার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। তবে ঐ রোগ হইবার পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পানের জমিতে তুঁতের জল পিচকারীর সাহায্যে প্রয়োগ করিলে ঐ রোগের দ্বারা গাছ আক্রান্ত হইতে পারে না।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশ একপ্রকার সংক্রামক রোগে পানের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য বঙ্গীয় সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

নিম্নলিখিত উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাসে একবার করিয়া পানগাছে পিচকারী দ্বারা ছিটাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বোর্দ্দো মিক্‌শ্চার (Bordeaux Mixture)

তুঁতে	...	...	৬ ছটাক ২ তোলা
পাথরে চূণ	...	...	৬ „ ২ „
জল	...	...	১ মণ

প্রথমতঃ একটি মাটির কিংবা কাঠের গামলাতে আধ মণ জল দিয়া উক্ত জলের মধ্যে তুঁতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং অন্য

একটি পাত্রে চূণ রাখিয়া অল্প অল্প জ্বাল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইতে হইবে। ঐরূপে সমস্ত চূণ ফুটিয়া গেলে তাহাতে আধ মণ জল মিশাইয়া চূণ ভাল করিয়া গুলিয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত চূণের জল একত্র মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ছিটাইতে হইবে।

এই ঔষধ তৈয়ারী হইল কি না তাহা দেখিতে হইলে ঔষধের মধ্যে একখানা পরিষ্কার ছুরির ফলা ডুবাও। এক মিনিট পরে যদি উক্ত ফলার উপর তামাটে রং দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আরও চূণের জল দরকার। সুতরাং ছুরি ডুবাইলে যে পর্য্যন্ত উহার উপর তামাটে রং না দেখা যায়, সেই পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে আরও চূণের জল দিতে থাকিবে। চূণের ভাগ কম হইলে উক্ত ঔষধ গাছের পক্ষে অনিষ্টকারী।

পরে নিম্নলিখিত ঔষধটি উপরোল্লিখিত ঔষধের সঙ্গে মিশাইতে হইবে। কারণ ইহা মিশাইলে বর্ষার সময় ঔষধ সহজে বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় না।

বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার (Burgundy Mixture)

কাপড়-কাচা সোডা	...		...	৩ ছটাক ৩ তোলা
রজন	...	...	...	৩ ছটাক
জল	...	...	...	/১॥০ সের

প্রথমতঃ জল ফুটাইয়া তাহাতে সোডা মিশাও। সোডা গলিয়া গেলে উহাতে গুঁড়া রজন অল্প অল্প করিয়া দিয়া অনবরত নাড়িতে থাক ও আধ ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাও। ঠাণ্ডা হইলে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত এক মণ ঔষধের সঙ্গে মিশাও। এই মিশ্রিত ঔষধ পিচকারী দ্বারা ছিটাইবার পূর্ব্বে চালনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। মাটি হইতে লতার এক হাত উপর পর্য্যন্ত ঔষধ ছিটান দরকার। পিলির দু'পাশের মাটিও ঔষধ দ্বারা ভিজান প্রয়োজন। বৃষ্টির জলে ঔষধ ধুইয়া গেলে পুনরায় উহা ছিটান দরকার।

চই

চই একপ্রকার লতাবিশেষ। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলভেদক, কফনাশক এবং শ্বাস, কাশ ও শূলরোগে উপকারক। ইহা কবিরাজগণের ঔষধে এবং প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চই লতার পাতা দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায় কিন্তু ইহার আস্বাদন ভিন্ন প্রকারের। ইহার আকৃতি মোটা লতার ন্যায় এবং অন্যান্য গাছের সাহায্যে উর্দ্ধে প্রায় ২৫।৩০ হাত পর্য্যন্ত লতাইয়া থাকে। ইহার আস্বাদন ঝাল এবং ইহা খুব মুখরোচক।

চই সাধারণতঃ বাড়ীর পাশে সুপারী, নারিকেল, সজিনা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের উপরে লতাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন বৃক্ষের সাহায্য ব্যতীত ইহারা বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সুতরাং বাটীর আস-পাশের স্থান ভিন্ন মুক্ত জমিতে ইহার চাষ করা সম্ভব নহে। বড় হইলে ইহা বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। চই গাছ ২০।২৫ বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।

চই-এর মূললতা অথবা শাখালতা হইতে গাছ জন্মান যাইতে পারে। সাধারণতঃ ছায়াযুক্ত স্থানে ও দোআঁশ মাটিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। কাঠের ছাই ও গোবরসার ইহার জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। চৈত্র হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্দ্ধ হস্ত গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহার মূল সমেত লতা রোপণ করিতে হয়। এক বৎসরের মধ্যে উহা ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

পিঁপুল

পিঁপুল চাষ অতি লাভজনক কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহা বুঝি না। আমরা মনে করি পিঁপুল আপনা হইতেই বনে-জঙ্গলে হইয়া থাকে, সুতরাং উহার আবার চাষের প্রয়োজন কি? পিঁপুল আপনা হইতে বনে-জঙ্গলে জন্মিলেও যত্নের

অভাবে উহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। সারপ্রয়োগ, পরিচর্য্যা প্রভৃতি দ্বারা চাষ করিতে পারিলে ইহা অতি উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে।

পিঁপুল নানাপ্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয় এবং উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সময় সময় ইহা প্রতিমণ ৬০৲ হইতে ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে আমদানি হইলেও ইহার প্রতিমণ ৪০৲ টাকা মূল্যের কম বিক্রয় হয় না।

পিঁপুল সাধারণতঃ দুই প্রকার; এক জাতীয় সরু ও লম্বা, আর একপ্রকার মোটা ও বেঁটে। মোটা ও বেঁটে জাতীয় পিঁপুলই উৎকৃষ্ট। উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহার চাষের স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মণ গোবরসার এবং কিছু ছাই ও হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া আধ হাত গভীরভাবে উত্তমরূপে কর্ষণ করা আবশ্যক।

মাঘ ফাল্গুন মাসে এইরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া তিন হাত অন্তর লাইন দিয়া ২৷৷-৩ হাত ব্যবধানে ধঞ্চে, অড়হর বা জয়ন্তী গাছ লাগাইতে হইবে। ধঞ্চে গাছগুলি একটু বড় হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসে পিঁপুলের গাঁটযুক্ত লতা সংগ্রহ পূর্ব্বক ১৫।১৬ অঙ্গুলি আন্দাজ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একত্রে ৩।৪ খণ্ড ধঞ্চে গাছের মাঝে মাঝে ৪।৫ অঙ্গুলি মাটির নিম্নে খাড়াভাবে পুঁতিতে হইবে। গাছগুলি বড় হইলে ঐ ধঞ্চে

গাছ অবলম্বন করিয়া উহারা বাড়িয়া উঠিবে। বৃষ্টি হইলে জমিতে জল দিবার আবশ্যক হয় না; বৃষ্টি না হইলে আবশ্যক মত মাঝে মাঝে জমিতে জল-সেচনের আবশ্যক হয়। পৌষ মাঘ মাসে ফসল পরিপক্ক হয়। তখন পাকা পিঁপুলগুলি বাছিয়া জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। বিঘাপ্রতি প্রায় ২ মণ ফলন হইয়া থাকে। ইহা একবার চাষ করিলে ক্রমান্বয়ে ৫।৬ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে। প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসর ইহার জমিতে বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক করে না।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, জ্বরনাশক ও রসায়ন এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, কাশ, শ্বাস, অর্শ, গুল্ম, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশমকারক। মধু-মিশ্রিত পিঁপুল—অগ্নিবর্দ্ধক ও মেধাজনক এবং কফ, কাশ, শ্বাস, জ্বর ও মেদো রোগের পক্ষে উপকারক। এক ভাগ পিঁপুলের সহিত দুই ভাগ গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, কাশ, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু ও কৃমিরোগের শান্তি হয়। কাঁচা পিঁপুল—মধুর রস, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, কফকারক ও পিত্তনাশক। শুষ্ক পিঁপুল—পিত্তপ্রকোপক।

রাঁধুনী

ইহা রবিশস্যের মধ্যে পরিগণিত। রাঁধুনী প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ব্যবহার্য্য মসলা রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ইহার জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। ইহার জমিতে আবশ্যক মত জল-সেচন করিতে হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার ফসল পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি এক পোয়া বীজ লাগে এবং প্রায় ২ মণ ফলন পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বায়ু, কফ, বমি, কৃমি, হিক্কা ও নেত্ররোগে হিতকর।

মৌরী

ইহা একপ্রকার তৃণ শস্যের নাম। ইহা সাধারণতঃ পানের ও রন্ধনের মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাল্‌কা দোআঁশ মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মৃত্তিকা সরস হইলে সার-প্রয়োগের বিশেষ

আবশ্যক হয় না। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিঘাপ্রতি এক পোয়া আন্দাজ বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। ইহার জমিতে আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচন করা দরকার। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার বীজ পরিপক্ক হয়। বিঘাপ্রতি ২ মণ ফসল জন্মে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটু-তিক্ত-মধুর রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শুক্রজনক, দাহনাশক এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার, নেত্র, ব্রণ ও শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর।

মৌরীর জল—মধুর রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত ও পিত্তনাশক এবং মুখশোষ নিবারক। মৌরীর তৈল—অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ূ, গুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

ধনে

ইহা রবিশস্যের অন্তর্গত। ধনে সাধারণতঃ মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতি লাভের ফসল অথচ ইহা উৎপন্ন করা সহজসাধ্য। ইহার জমিতে বিশেষ পাট করিবার আবশ্যক হয় না এবং মৃত্তিকা সরস হইলে বিনাসারেও জন্মিয়া থাকে। এঁটেল মৃত্তিকাতেও ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ভাদুই ফসল উঠাইয়া লইবার পর সেই জমিতে ইহার চাষ করা চলে।

ভাদুই ফসল উঠাইয়া লইবার পর আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই জমিতে লাঙ্গল দিয়া মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া বিঘা প্রতি ৪।৫ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। কোন কোন স্থলে বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়াও ইহা জমিতে বপন করা হইয়া থাকে। ধনে বীজগুলি একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর উহা সিক্ত বস্ত্রে আলগাভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রাখিলে ৫।৬ দিনের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোৎ-পাদন হইয়া থাকে; পরে কিছু শুষ্ক ও ঝুরা হাল্কা মাটি বীজের সহিত মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। অনন্তর জমির আবশ্যকতা বুঝিয়া মাঝে মাঝে জল-সেচন ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন পাট নাই।

ধনের পাতা সুগন্ধযুক্ত। কচি অবস্থায় উহার পাতা ডাল এবং তরকারী সুগন্ধ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ধনে পাকিয়া থাকে। তখন গাছগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি প্রায় ৩-৪ মণ ফলন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, রুচিকর, মলরোধক, মূত্রকারক, ত্রিদোশনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, কৃশতা ও কৃমিরোগে উপকারক। কাঁচা ধনে—পিত্তনাশক।

জিরা

জিরা সাধারণতঃ দুইপ্রকার; কালজিরা ও সাদাজিরা। কালজিরার চাষ এদেশে প্রচলিত আছে কিন্তু সাদাজিরার চাষ বাংলাদেশে হয় না। উহার বর্ণও ঠিক সাদা নয়, অনেকটা কটা রঙের। জিরা বেশ লাভজনক ফসল এবং বাংলাদেশে দৈনিক রন্ধনকার্য্যে মসলা হিসাবে ইহার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে ইহার আবশ্যকতা এবং ব্যবহার অধিক সেখানে ইহার চাষের আদৌ প্রচলন নাই এবং বাংলার চাষীরা ইহার চাষ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নহে।

হাল্‌কা দোআঁশ মৃত্তিকাই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ যে জমিতে ধনে, জোয়ান, মৌরী, রাঁধুনী প্রভৃতি ভাল জন্মে তথায় ইহার চাষ করিতে পারা যায়।

কিন্তু ইহার চাষের একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, এখানে ইহার বীজ পাওয়া যায় না এবং বাজারে যে জিরা পাওয়া যায় তাহা হইতে গাছ জন্মে না। সাধারণতঃ বরোদা রাজ্যে এবং আফগানিস্থান, বোম্বাই, পঞ্জাব এবং তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে ইহার সমধিক চাষ হইয়া থাকে।

জিরার চাষ প্রণালী :—জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া মাটি

ধূলার মত চূর্ণ হইলে উহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা কর্ত্তব্য। বরোদা, বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বীজ বপনের পূর্ব্বে সেচ দিয়া মাটি সরস করিয়া লওয়া হয় এবং 'যো' হইলে বীজ বপন করা হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বিঘাপ্রতি দুই সের বীজ আবশ্যক হয়। ইহার ফলন বিঘাপ্রতি প্রায় ৩-৪ মণ হইয়া থাকে। কাল-জিরার বীজও এই সময়ে বপন করা হইয়া থাকে। বাংলার মাটি এই সময়ে সাধারণতঃ সরস থাকে, সুতরাং সব ক্ষেত্রে সেচ দিবার আবশ্যক হয় না। টান জমিতে অথবা যে স্থানের মাটি অত্যধিক শুষ্ক তথায় আবশ্যক মত সেচ দিয়া 'যো' হইলে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ চৈত্র মাসে বীজ পরিপক্ক হয়। বাংলায় ইহার চাষ প্রচলিত নাই ; সুতরাং এদেশে যত্নপূর্ব্বক ইহার চাষ করিতে পারিলে এবং ইহার চাষে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে যে বিশেষ লাভজনক হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জমি :—জিরা চাষের জন্য যে মাটি নির্ব্বাচিত হইবে তাহা পোড়ামাটি ও পলিমাটি হইলেই ভাল হয়। মাটি সরস হইলে অধিক সার মিশ্রিত করিবার আবশ্যক নাই। যদি মাটি সরস না থাকে তাহা হইলে উহাতে পচা গোবরসার, পাতাসার, কাঠের ছাই ও অন্যান্য আবর্জ্জনার সার উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া জল-সেচন করিতে হয় এবং তাহার পর উত্তমরূপে উহার চাষ করা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা মনে হয় যে সাধারণ

সারই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। বিশেষ রাসায়নিক সার এস্থলে প্রয়োজন হয় না। তাহার কারণ এই যে ইহা সাধারণ ভাবেই চাষ করা চলে। তবে একটা কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক এই যে, ইহার চাষ যে-কোন গাছের ন্যায় হয়। উন্মুক্ত স্থান জিরা চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। অতএব ইহার চাষের জন্য উন্মুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা চাষীদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—বায়ুনাশক, কটু-রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কৃমিনাশক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ব্রণনাশক, কফনাশক, তীক্ষ্ণ, লঘু ও পিত্তবৃদ্ধিকর, স্বরভঙ্গ ও অজীর্ণতায় বিশেষ উপকারক।

বীজ সংগ্রহ :—ইহা বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ; জীরাগুলি পরিপক্ক হইলে গাছগুলি তুলিয়া এক স্থানে রাখিতে হয় এবং তাহার পর ইহা শুকাইয়া উহার উপর লাঠির দ্বারা আঘাত করিতে হয়। তাহাতে বীজগুলি গাছ হইতে ছাড়িয়া যায় ও মাটিতে পড়ে। সেই বীজ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয় এবং ইহার মধ্য হইতেই জিরার বীজ রাখা হয়।

গোলমরিচ

ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ পানের ন্যায় ইহার গাছ লতাইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং পানের ন্যায় গোলমরিচেরও

লতার কাটিং পুতিয়া চারা জন্মান হয়। কাটিংএর প্রতি গ্রন্থি বা গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়।

ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক কিন্তু বাংলাদেশে কোন স্থানে বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ হইতে দেখা যায় না। গোলমরিচ নানাবিধ ঔষধে অনুপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মসলারূপে জিরার সহিত ইহার ব্যবহার এবং চাহিদা বাংলাদেশে বিশেষ কম নহে। ইহা এরূপ আবশ্যকীয় দ্রব্য হইলেও বাংলার বাহির হইতে আমদানি করিয়া ইহার অভাব মিটাইতে হয়। সাধারণতঃ মালাবার উপকূলে, মহীশূর রাজ্যে এবং চীন ও ব্রহ্মদেশে ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

জমিতে ভালরূপে চাষ দিয়া ৫।৬ হাত অন্তর অন্তর লাইন দিয়া ধইঞ্চা বা জয়ন্তী গাছ পুঁতিয়া ঐ লাইনের ফাঁকে ফাঁকে একটি করিয়া গোলমরিচের লতা লাগাইতে হয় এবং গাছ লতাইতে আরম্ভ হইলে ঐ গাছে উঠাইয়া দিতে হয়। গোলমরিচের লতা ঐ সমস্ত গাছ অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গোলমরিচের লতা লাগাইতে হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় দুইশত চারা লাগে। গাছগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ফসল প্রদান করে। পৌষ মাঘ মাসে ফসল উত্তোলন করিতে হয় এবং এক-একটি গাছ হইতে /১ সের পর্য্যন্ত গোলমরিচ পাওয়া যায়। গোলমরিচ প্রথমে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

(Underground Crops)

এরারুট

ইহা মূল জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার আদি জন্মস্থান আমেরিকা। পূর্ব্বে এদেশে ইহার চাষ ছিল না কিন্তু ইহার চাষে খুব লাভ দেখিয়া ভারতীয় কৃষকগণ আজকাল ইহার চাষে মন দিয়াছেন। ইহার গাছের গোড়ায় যে মূল জন্মে সেই মূল হইতে এরারুট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হাল্কা দোআঁশ অথবা পলিপড়া জমি ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাঘ ফাল্গুন মাসে জমির কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। ইহার জমিতে বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ মণ গোবর-সার ও ২০।২২ সের অস্থিচূর্ণসার প্রয়োগ করিয়া জমি গভীর-ভাবে বারংবার কর্ষণপূর্ব্বক মাটি গুঁড়াইয়া ধূলার মত করিতে হয়। মাটি যত ঝুরা ও আলগা হইবে তত ভাল মূল উৎপন্ন হইবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে এরারুটের মূল সংগ্রহপূর্ব্বক হাপোরে রাখিয়া উহা হইতে কলা বাহির করিয়া লইতে হয়।

একটি খাদ বা জুলি কাটিয়া উহার তলদেশে কিছু সিক্ত খড় বা বিচালী বিছাইয়া তাহার উপর এরারুটের মূল সাজাইয়া উহার উপরেও আর এক প্রস্থ খড় বিছাইয়া আল্‌গাভাবে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। ৮।১০ দিন এইরূপ ভাবে রাখিলেই উহা হইতে অঙ্কুর বা কলা বাহির হইবে। পরে জমিতে দুই ফিট অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে এক ফুট ব্যবধানে এক-একটি গেঁড় রোপণ করিতে হইবে। গাছগুলি একটু বড় হইলে ২।১ বার নিড়াইয়া ইহার জমি আল্‌গা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ইহার জমির আর অন্য কোন পাট নাই। ইহার মূল পরিপুষ্ট হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার মূল তুলিতে হয়।

পালো বা এরারুট প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার গেঁড়গুলি সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মল জলে ভাল করিয়া ধুইয়া মূলগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে ঢেঁকি অথবা কলে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালনি দ্বারা ২।৩ বার ছাঁকিয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ৬৪০০ গেঁড় অথবা প্রায় ৩/ মণ মূল আবশ্যক হয় এবং প্রায় ৪০-৫০ মণ ফলন হইয়া থাকে।

শটী

ইহা আদা, হলুদ প্রভৃতির ন্যায় মূল জাতীয় গাছ এবং আদা, হলুদ প্রভৃতির ন্যায় অল্প ছায়াযুক্ত স্থানেও ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া বারংবার লাঙ্গল দিয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। ইহার জমি গভীরভাবে কর্ষণ করা এবং মাটি গুঁড়া ও আল্‌গা হওয়া আবশ্যক, নতুবা ভাল মূল জন্মিতে পারে না। ইহার জমিতে ৪০।৫০ মণ গোবরসার ও ২০।২২ সের সলফেট অফ্‌ এ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে উত্তম ফলন হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে ইহার মূল বা গেঁড় সংগ্রহ পূর্ব্বক জমিতে দুই ফিট অন্তর লাইন দিয়া ১ ফুট ১॥০ ফিট ব্যবধানে এক-একটি মূল বসাইতে হয়। গাছগুলি বড় হইলে ২।৩ বার নিড়াইয়া জমির মাটি আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এক বৎসরের মধ্যে মূলগুলি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তখন সযত্নে সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা হইতে পালো প্রস্তুত করিতে হয়। বিঘাপ্রতি প্রায় ১ মণ মূল লাগে ও ৫০-৬০ মণ ফলন হইয়া থাকে।

ইহার মূল হইতে যে পালো প্রস্তুত হয় উহা অতি পুষ্টিকর

এবং বলকারক। এমন কি বিলাতী বার্লি অপেক্ষাও উহা বহু-গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক অথচ চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই। বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে শটী গাছ বহু পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায় কিন্তু ইহা হইতে পালো প্রস্তুত করিতে পারিলে যে বিশেষ লাভবান হইতে পারা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শটী হইতে আবির এবং গায়ে মাখিবার পাউডারও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ইহার পালো প্রস্তুত করিতে হইলে মূলগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া উহা কোন পরিষ্কার কাপড়ে রাখিয়া জলপূর্ণ গামলায় উহা নাড়িয়া-চাড়িয়া উহার শ্বেতসারভাগটি বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে গামলার মধ্যস্থিত জল থিতাইলে আস্তে আস্তে উপরকার জল ফেলিয়া দিলে তলায় এক প্রকার সাদা পদার্থ পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে পরিষ্কার শটীর পালো প্রস্তুত হইল।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখ-পরিষ্কারক, রক্তপিত্তের প্রকোপক, ক্রিমি, শ্বাস, কাশ, অর্শ, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও বায়ুর উপশমকারক।

ক্যাসোয়া

ইহা দেখিতে অনেকটা মৌ-আলুর ন্যায়। ইহা হইতে সুন্দর পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহা শটী, এরারুট প্রভৃতির সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

কলম অথবা মূল বা গেঁড় হইতেও ইহা জন্মাইতে পারা যায়। যে স্থানে অল্প বৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানেও ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার জমি উচ্চমরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। মাটি গুঁড়াইয়া ধূলার ন্যায় করিয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে তিন হাত অন্তর লাইন দিয়া ২-২॥০ হাত ব্যবধানে ইহার মূল বা ডগা লাগাইতে পারা যায়। স্থান বিশেষে ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বপনকার্য্য চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে বারমাসই ইহা জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু ফাল্গুন চৈত্র মাসই প্রশস্ত। গাছগুলি ২।৩ হাতের অধিক উচ্চ হইতে দিতে নাই। গাছ অধিক উচ্চ হইলে বা বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট হইলে মূলের পরিমাণ কম হয়। এইজন্য মধ্যে মধ্যে গাছগুলির ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছগুলি খর্ব্বাকৃতি ও ঝাড়বিশিষ্ট হইয়া থাকে। মূল পরিপুষ্ট হইতে এক বৎসর সময় লাগে।

পর বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের গোড়া হইতে

মূলগুলি সযত্নে সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিষ্কার জলে ধুইয়া জলপূর্ণ বড় গামলায় ২।১ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং ছুরি অথবা বঁটির সাহায্যে উপরের পুরু ছালগুলি ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। অবশেষে উহা ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পরিষ্কার গামলার জলে নাড়িয়া উহার মধ্যস্থিত শ্বেতসারভাগটি বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে গামলার উপরকার জল ফেলিয়া দিয়া তলার শ্বেত পদার্থ রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে সুন্দর পালো প্রস্তুত হইল। ইহার গাছ গবাদি জন্তুকে খাইতে দিতে পারা যায়। লাল আলু, শকরকন্দ আলু, ভুট্টা, যব প্রভৃতি হইতেও এইরূপে পালো প্রস্তুত করিতে পারা যায়। উহা যে অতি বলকারক ও পুষ্টিকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়



বাঁশ

আওলাতী গাছের মধ্যে এদেশে বাঁশ অন্যতম। একবার জমিতে বাঁশ লাগাইতে পারিলে উহা ঝাড় বাঁধিয়া বারমাস বংশবৃদ্ধি করে। এদেশে বাঁশ, বাঁশিনী, তল্‌দা, বেউর ও ও জাওয়া এই পাঁচ জাতীয় বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দোআঁশ, পলি অথবা দুধে এঁটেল মাটিতে বাঁশ ভাল জন্মিয়া থাকে। ঈষৎ উচ্চ জমিতে বাঁশ গাছ লাগান আবশ্যক। যে জমি বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় না সেই জমি বাঁশ চাষের পক্ষে প্রশস্ত। নির্ব্বাচিত জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর গর্ত্ত খুঁড়িয়া উহাতে পাঁকমাটি, ছাই ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া বর্ষাকালে উহাতে বাঁশের তেউড় তুলিয়া লাগাইতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত জমিতে বাঁশের তেউড় লাগাইতে পারা যায়। ৭।৮ মাসের মধ্যে বাঁশের গোড়া হইতে অসংখ্য তেউড় বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিয়া উঠে।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে কর্ত্তিত বাঁশের পুরাতন শুষ্ক গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং বাঁশবাগানে যে

সমস্ত শুষ্ক পত্র পড়িয়া থাকে উহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। চৈত্র মাসে ঝাড়গুলির গোড়ায় পুষ্করিণীর পাঁকমাটি প্রয়োগ করিলে গাছ বেশ সতেজে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাঁক-মাটি প্রয়োগ করিবার সময় ঝাড় পিছু /২ সের খইলচূর্ণ, /২ সের সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বেশ মোটা বাঁশ জন্মিয়া থাকে। বাঁশবাগানে আনারস গাছ বেশ ভাল জন্মিয়া থাকে এবং উহা রসাল, মিষ্ট ও বড় হইতে দেখা যায়; সুতরাং বাঁশবাগানে আনারসের চাষও বেশ একটি লাভের ফসল।

রবার

প্রায় দেড়শত বৎসরের উপর ইহা শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শিল্প জগতে ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্য অনেক স্থানে ময়দা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। বিশুদ্ধ রবারের ব্যবহার অতি অল্প। শতকরা ৩০ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রবার নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। ওয়াটারপ্রুফ, ম্যাটিং, পাপোষ,

জুতার সুকতলা, ব্যাগ, স্প্রিং, কোট, গাড়ীর চাকা, টায়ার, ইরেজর, নল, পাইপ, খেলনা ও নানাবিধ ডাক্তারি যন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে ইহা আবশ্যক হয়। রবারের বিশেষ গুণ স্থিতিস্থাপকত্ব। এইজন্য শিল্প-জগতে দিন দিন ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। যে রবার টানিয়া ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা উৎকৃষ্ট এবং যাহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে একটু বিলম্ব হয় উহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল, আকন্দ প্রভৃতি গাছ হইতেও একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা বৃক্ষ বিশেষের আঠা বায়ুর সংস্পর্শে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেই রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। টার্পিণ, ইথার, ক্লোরোফরম, পেট্রোলিয়াম সহযোগে উহা সম্পূর্ণ বিগলিত করিতে পারা যায়।

পৃথিবীতে যত প্রকার ক্ষীর-নিস্রাবণকারী উদ্ভিদ্ আছে তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষীরে প্রোটিন, রজন ও রবার প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের নিঃসৃত ক্ষীরে রবারের ভাগ অধিক এবং কোন কোনটিতে বা ইহা অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে, মহীশূর, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মান্দ্রাজ, মালয়, ব্রহ্ম, ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আফ্রিকা, গ্যাম্বিয়া, নাটাল, রোডেসিয়া, সুইডেন, সিংহল, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, ব্রেজিল, বলভিয়া, মেক্সিকো, পেরু, কলম্বিয়া, জ্যামাইকা, ডমিনিকা প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে

রবার গাছ জন্মিয়া থাকে। আজকাল ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, কুচবিহার, ডুয়ার এবং আসাম অঞ্চলে অল্লাধিক ইহার চাষ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সরস দোআঁশ জমিতে রবার গাছ জন্মাইতে পারা যায়। জাতি বিশেষে ইহা ৫ হাত হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের আয়তন অনুসারে ১০।১২ হাত অন্তর রোপণ করা উচিত। বীজ অথবা কলম হইতেও ইহার গাছ জন্মাইতে পারা যায়। অল্প স্থানে ইহার চাষ সুবিধাজনক হয় না। ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অধিক পরিমাণে জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক।

যাবতীয় বৃক্ষ জাতীয় রবারের মধ্যে হিভিয়া ব্রেজিলিয়ান্‌সিস্ (Hevea Braziliensis) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। সাধারণতঃ ইহাকে প্যারা রবার (Para Rubber) বলা হইয়া থাকে। আমেরিকার ব্রেজিল নামক দেশই ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। সমুদ্রতট হইতে ৩।৪ সহস্র ফিট উচ্চ-ভূমিতে হিভিয়া ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। নদী বা সাগরোপকূল-বর্ত্তী সরস দোআঁশ জমি ইহার চাষের জন্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক।

ইহার বীজ অথবা কলম হইতে চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার বীজ অত্যন্ত তৈলাক্ত এবং শীঘ্রই উহার অঙ্কুরোৎ-পাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। নির্ব্বাচিত জমিতে ১৩।১৪ হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ৯।১০ হাত অন্তর ইহার চারা

বসান যাইতে পারে। গাছগুলি ৮।১০ হাত উচ্চ হইলে ৩।৪ মাস অন্তর উহার শাখাপ্রশাখা ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে গাছগুলি উপরের দিকে বৃদ্ধি না পাইয়া পাশের দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ইহাতে গাছ হইতে রবার বাহির করিবার সুবিধা হইবে। গাছগুলি ৫।৬ বৎসরের পুরাতন হইলে প্রতি বৎসর গাছের কাণ্ড ক্ষত করিয়া প্রায় অর্দ্ধসের পরিমিত রবার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২।১৪ বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ হইতে বৎসরে ⁄২৷৹ সের ⁄৩ সের রবার পাওয়া যাইতে পারে। গাছগুলি যত অধিক পুরাতন হইবে এবং গাছের কাণ্ড যত অধিক মোটা হইবে উহা হইতে তত অধিক পরিমাণে আঠা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। হিভিয়া ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় রবারবৃক্ষে এত অধিক রবার উৎপন্ন হয় না।

খেজুর প্রভৃতি গাছের ন্যায় কাণ্ডের ত্বক্ ভাগ করিয়া হিভিয়া প্রভৃতি রবার গাছ হইতে ক্ষীর আঠা বাহির করিয়া লইতে হয়। সকল জাতীয় বৃক্ষের ক্ষীর একই উপায়ে ঘনীভূত হয় না। কোন কোন জাতীয় বৃক্ষের ক্ষীর বায়ু সংস্পর্শে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন জাতায় ক্ষীর অগ্নিতে ভাপাইয়া জলভাগ উড়াইয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। অল্প পরিমাণ এ্যাসেটিক এ্যাসিড (Acitic Acid) বা ক্রিয়োসোট (Creosote) উভয়ের সংমিশ্রণে হিভিয়ার ক্ষীর রবারে পরিণত হয়।

পানামা রবার (Panama Rubber) :—ইহার জন্মস্থান মধ্য আমেরিকা। সরস দোআঁশ মৃত্তিকায় উহা ভাল জন্মে।

ইহার চারা বা কলম অপেক্ষা বীজের গাছই রোপণ করা প্রশস্ত। ইহার গাছ ৮।১০ বৎসরের বড় হইলে কাণ্ডে ক্ষত করিয়া রবার-ক্ষীর বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ম্যানিহট রবার (Manihot or Ceara Rubber) :—ইহা ব্রেজিলদেশীয় রবার। সাধারণতঃ ম্যানিকোবা (Manicoba Rubber) নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। এঁটেল বা কঙ্করপূর্ণ মৃত্তিকাতেও এই জাতীয় গাছ জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। গাছগুলি ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হয় ও ৬০।৭০ বৎসরকাল জীবিত থাকে। গাছগুলি ৭।৮ বৎসরের মধ্যে রবার-ক্ষীর নিস্রাবণের উপযোগী হইয়া উঠে। সিংহল, মহীশূর, মান্দ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে আজকাল ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে।

ফাইকাস ইলাষ্টিকা (Ficus Elastica) :—ইহা সাধারণতঃ ইণ্ডিয়া রবার নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে এই বৃক্ষ হইতেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রবার পাওয়া যায়। আসামের বিভিন্ন প্রদেশে, দার্জ্জিলিং জেলায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলবর্ত্তী পার্ব্বত্যময় প্রদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। মালয়, জাভা, সিংহল, সিঙ্গাপুর, পিনাং প্রভৃতি স্থানে ইহার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

এই জাতীয় গাছ ঊর্দ্ধে ৩০।৩৫ হাত উচ্চ হয়। সরস দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহা ভাল জন্মায়। জমি উত্তমরূপে

কর্ষণ পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ১৫।২০ হাত অন্তর ইহার চারা রোপণ করিতে পারা যায়। বীজ হইতে প্রথমে চারা প্রস্তুত করিয়া উহা এক হাত দেড় হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে জমিতে রোপণ করা বিধেয়। চারাগুলি জমিতে রোপণের পর ১০।১২ বৎসরের মধ্যে উহারা রবার-ক্ষীর নিস্রাবণের উপযোগী হইয়া উঠে। বড় হইলে গাছের কাণ্ডে অস্ত্রাঘাত দ্বারা ক্ষত করিয়া ক্ষীর লওয়া হয়। এই ক্ষীরবৎ পদার্থ কোন পাত্রে বায়ু সংস্পর্শে স্বভাবতঃই কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। গাছগুলি ২০।২২ বৎসরের পুরাতন হইলে প্রতি বৎসরে ১০।১৫ বার পর্য্যন্ত উহার আঠা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ হইতে প্রতি বৎসর ৮।১০ সের পর্য্যন্ত রবার পাওয়া যাইতে পারে।

গাটাপার্চ্চা (Guttaparcha)

গাটাপার্চ্চা বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শোধিত ও কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেই গাটাপার্চ্চা প্রস্তুত হয়। ইহা অনেকাংশে রবারের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে ইহা পাওয়া যায়। সিংহল, মালয়, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে গাটাপার্চ্চার নির্য্যাস-উৎপাদনকারী কয়েক

জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। ভারতে মান্দ্রাজ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে উত্তম গুণসম্পন্ন কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে কিন্তু তাহাদের নির্য্যাস অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন।

সমুদ্রগর্ভস্থ টেলিফোনের তার প্রস্তুতের জন্য, ওয়াটার-প্রুফ্ প্রভৃতি শিল্পদ্রব্যে এবং নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে গাটাপার্চ্চার আবশ্যক হয়। ইহা হইতে বোতাম, ফাউন্টেন পেনের খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঠ ও কাঁচ জুড়িবার জন্য ইহার আঠার আবশ্যকতা আছে। আবলুশ, ম্যাঙ্গোষ্টীন, গাব, আকন্দ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ হইতেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাটাপার্চ্চা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

টালি (Dichopsis Polyantha) :—ইহা প্রকৃত গাটা-পার্চ্চা জাতীয় উদ্ভিদ্। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। গাছগুলি ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ হয়। এই গাছের নির্য্যাস বা আঠা হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাটাপার্চ্চা প্রস্তুত হইতে পারে।

পাশস্তী (Isonandra Acuminata) :—ইহা মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ প্রভৃতি জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। গাছ ৫০।৬০ হাত লম্বা হয়। এই গাছের গায়ে কোন এক স্থানে আঘাত করিলে প্রচুর পরিমাণে ক্ষীরবৎ আঠা নির্গত হয়। ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর আঠা।

বালাটা (Balata) :—দক্ষিণ আমেরিকায় Mimusops

Globosa নামক বৃক্ষ হইতে এই নির্য্যাস উৎপন্ন হয়। এদেশের বকুল গাছ এই শ্রেণীর বৃক্ষ। ইহা হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর আঠা পাঁওয়া যায়।

টাবান মিরা (Taban Mera), (Dichopsis Gutta, Syn. Palaquium Gutta) :—জন্মস্থান মালয় উপদ্বীপ। সাধারণতঃ মালয় উপদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রকৃত গাটা উৎপাদনকারী উদ্ভিদ্ জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাটা পাওয়া যায়। মলয়দেশে ইহাকে Taban Mera বলে। বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে ৫০।৬০ মাইল অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে।

এতদ্ভিন্ন Palaquium Obovata, Palaquium Grandis, Kiri Hembiliya, Ficus Elastica, Gutta Soosoo, Taban Simpoo প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জাতীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাটা উৎপাদনকারী বৃক্ষ ঐ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে জন্মিয়া থাকে।

নীল

আজকাল বাজারে কৃত্রিম নীল আমদানি হওয়ায় নীলের চাষ এদেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। পূর্ব্বে এদেশে ইহার চাষ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এই নীলের চাষ লইয়া কত মারামারি, লাঠালাঠি প্রভৃতি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একমাত্র ভারতেই প্রায় ৪০ প্রকারের নীল জাতীয় গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ প্রকারের নীল গাছ আছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিহারের Indigofera Arrecta ও বাংলার I. Tincto জাতীয় যে নীল গাছ আছে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে নীল পাওয়া যায়।

নদীর চরযুক্ত পলি অথবা দোআঁশ মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। ইহার জমিতে সামান্য চুণ, পটাশ ও ফস্ফরাস সার আবশ্যক। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে এবং শুষ্ক মৃত্তিকাযুক্ত প্রদেশে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বীজ বপন করা হয় এবং ঐ সমস্ত স্থানে ইহার জমিতে জল-সেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে। বাংলাদেশে সাধারণতঃ আশু ধান্য লাগাইবার সময়ই নীল চাষ করা হইয়া থাকে। ইহার জমিতে মধ্যে মধ্যে জল-সেচন, নিড়ান দেওয়া এবং আগাছা জন্মিলে তুলিয়া

ফেলা ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। ইহার বীজ সরিষা অপেক্ষা কিছু বড়। ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে এবং পাট, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির ন্যায় শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ বপন করিলে উহা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাটিবার উপযোগী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গাছে ফুল ধরিবার সময়ই গাছ কাটিয়া লওয়া হয়।

ফুল ধরিবার সময় ইহার গাছগুলি ধঞ্চে, পাট প্রভৃতির ন্যায় কাটিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া কোন বাঁধান চৌবাচ্চার জলে জাঁক দিয়া রাখিতে হয়। জাঁক দিবার সময় যাহাতে কর্ত্তিত গাছের সমস্ত অংশ জলে ডুবিয়া থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ২।১ দিন এইভাবে রাখিয়া বাণ্ডিলগুলি উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিলে ঐ চৌবাচ্চার সমস্ত জল নীলবর্ণ ধারণ করে। ঐ জল অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিয়া অথবা অন্যান্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা নীল প্রস্তুত করা হয়। এক বিঘা জমিতে উৎপন্ন নীল গাছ হইতে প্রায় দেড় সের নীল রং পাওয়া যায়।

গুণ :—ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, কাস, কফ, বায়ু, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ ও কৃমিরোগে উপকারক এবং অপস্মারাদি রোগে ও কেশের পক্ষে হিতকর।

পরিশিষ্টাংশ

(ক)

লাভ লোকসানের কথা

চাষ-আবাদের কালাকাল সাধারণতঃ জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এইজন্য ঠিক একই সময়ে সমস্ত স্থানে একই শস্যের বা একই ফসলের চাষ করা যায় না। পূর্ব্ব-বঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা বর্ষা কিছু আগে হয়, সুতরাং ঐ অঞ্চলে আশু ধান্য, পাট প্রভৃতি ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতেই বপন করা চলে। আবার উড়িষ্যা অঞ্চলে বিহার ও ছোটনাগপুর অপেক্ষা বর্ষা কিছু আগে হয় বলিয়া ঐ স্থানে রবিশস্য বা অন্য ফসলের বীজ বপন কার্য্য কিছু পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া থাকে। স্থান, কালাকাল, জলবায়ু, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ থাকায় যে কোন ফসলের চাষে ঠিক নিট লাভ কত হইবে তাহা বলা সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ বেচা কেনার সুবিধার জন্য ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে হাট বাজার থাকিলে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি যান-বাহনের সুবিধা থাকিলে, কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকিলে এবং হিসাব পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া চাষ করিতে পারিলে লোকসানের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। যে কোন সব্জী বা ফসল সময়ের কিছু পূর্ব্বে উৎপন্ন করিতে পারিলে এবং

পর্য্যায় কৃষি দ্বারা চাষ করিলে লাভ একটু বেশী পাওয়া যায়। আবার যে কোন শস্য বা ফসল কাঁচা বিক্রয় না করিয়া উহাকে শিল্পে প্রযুক্ত করিতে পারিলে লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একই জমিতে ক্রমান্বয়ে একই ফসলের চাষ করিতে থাকিলে কেবল যে ফসলের হ্রাস ঘটে তাহা নহে; কোন বিশেষ বিশেষ রোগ বা ব্যাধি দ্বারাও ফসলের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, এইজন্য কৃষি পর্য্যায় অবলম্বনে চাষ করিতে পারিলে জমির কোন অনিষ্ট হয় না এবং ফসলেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক বৎসর একই ফসলের চাষ না দিয়া বিভিন্ন ফসলের চাষ করার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। সাধারণতঃ দীর্ঘমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদের চাষ উঠাইয়া লইবার পর গুচ্ছমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদের চাষ করা চলে, কারণ দীর্ঘমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ মাটির অনেক নীচে হইতে সার সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে মাটির উপরের সারাংশ বিদ্যমান থাকে বলিয়া গুচ্ছমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদের চাষ করায় ফসলের সার সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং এইভাবে একবার সার প্রয়োগের দ্বারা দুই-তিনটি ফসল উঠাইয়া লওয়া যায়। ইহাতে সারের খরচও অনেকটা বাঁচিয়া যায়। এইরূপ হিসাব পূর্ব্বক চাষ-আবাদ করিতে পারিলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না এবং লাভের পরিমাণও অধিক হইয়া থাকে। সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নে একটি আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইল।

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
অড়হর	চৈত্র-বৈশাখ	/২৷৷-/৩	৭৷৮ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
আদা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১ মণ	৪০৷৫০ মণ	পৌষ-মাঘ
এরারুট	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৬৪০০ মূল	৫০৷৬০ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
ইক্ষু	আশ্বিন-ফাল্গুন	৪০০০ টিকলী	৩০৷৪০ মণ	মাঘ-চৈত্র
কাওন	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/২ সের	২৷৷ মণ	ভাদ্র-আশ্বিন
কুলতি	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/৩-/৪ সের	২৷৷ মণ	মাঘ-ফাল্গুন
ক্যাসোয়া	ফাল্গুন-চৈত্র	৬০০ চারা	১০০ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
কুসুম ফুল	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/১৷৷ সের	১০ সের	মাঘ-ফাল্গুন
কোদো	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	/১৷৷০	৩ মণ	আশ্বিন-কার্ত্তিক
খেসারী	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/৩-/৪ সের	৩৷৷ মণ	মাঘ-ফাল্গুন
গম	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	৮৷১০ সের	৫৷৬ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
গোঁদালি	আষাঢ়	⁄২॥০ সের	৩ মণ	কার্ত্তিক
গোলমরিচ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	২০০ গাছ	গাছ পিছু ⁄১	মাঘ-ফাল্গুন
চই	বৈশাখ-আষাঢ়	৪০০ গাছ	—	—
চিনা	ফাল্গুন-চৈত্র	⁄১॥০ সের	২-২॥ মণ	বৈশাখ
চিনাবাদাম	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৭।৮ সের	১২।১৪ মণ	কার্ত্তিক
ছোলা	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	১০।১২ সের	৪।৫ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
জোয়ার	বৈশাখ-আষাঢ়	।১॥ সের	৩।৪ মণ	আষাঢ়-ভাদ্র
জিরা	আশ্বিন-কার্ত্তিক	⁄২ সের	৪ মণ	চৈত্র-বৈশাখ
তামাক	ভাদ্র-কার্ত্তিক	২॥ তোলা	৭।৮ মণ	মাঘ-চৈত্র
তিল	কার্ত্তিক-চৈত্র	⁄২ সের	২॥ মণ	মাঘ-ফাল্গুন

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
তূলা	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ / বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/২-/২॥০ সের	বীজ সমেত ২॥০ মণ-৩ মণ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / পৌষ
তিসি	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/৩ সের	২॥ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
ধঞ্চে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/৪ সের	৫ মণ	আষাঢ়-শ্রাবণ
পাট	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	/১॥ সের	৭।৮ মণ	শ্রাবণ-ভাদ্র
পান	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৬৭০০ কাটিং	—	—
পিঁপুল	আষাঢ়-শ্রাবণ	১৬০০ কাটিং	৩ মণ	ফাল্গুন
ফাঁপোর	আষাঢ়	৭।৮ সের	৫ মণ	কার্ত্তিক
ভুট্টা	চৈত্র-আষাঢ়	৫।৬ সের	৬।৭ মণ	ভাদ্র-আশ্বিন
ধান আউস	চৈত্র-বৈশাখ	/৫ সের	৬।৭ মণ	ভাদ্র-আশ্বিন
„ আমন	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/৬-/৭ সের	১০।১২ মণ	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
ধান বোরো	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/৫ সের	৫।৬ মণ	চৈত্র-বৈশাখ
ধনে	ভাদ্র-আশ্বিন	/১ সের	৪/০ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
নীল	ফাল্গুন-চৈত্র	৪।৫ সের	দেড় সের নীল	আষাঢ়-শ্রাবণ
মাষ কলাই	আষাঢ়-শ্রাবণ	/৫ সের	২-২॥ মণ	আশ্বিন-কার্ত্তিক
মুগ	আশ্বিন-কার্ত্তিক জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	/২-/২॥ সের	৩।৪ মণ	ফাল্গুন আশ্বিন-কার্ত্তিক
মটর	আশ্বিন-কার্ত্তিক	৮।১০ সের	৬/০ মণ	মাঘ-ফাল্গুন
মাদুর কাঠি	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	—	—	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ
মাডুয়া	আষাঢ়	/২ সের	২॥ মণ	ভাদ্র
মুর্গা	চৈত্র-বৈশাখ	৩।৪ শত চারা	—	—
মস্থর	কার্ত্তিক	২॥-৩ সের	৩॥-৪ মণ	চৈত্র

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
মসিনা	আশ্বিন-কার্ত্তিক	/২ সের	৩ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
মৌরী	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	/১ সের	১॥ মণ	চৈত্র
মেথী	ঐ	ঐ	৪০/ মণ	ঐ
মেস্তা	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	৪।৫ সের	৬ মণ সূতা	শ্রাবণ
যব	আশ্বিন-কার্ত্তিক	১২।১৪ সের	৩॥-৪ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
যই	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	৬।৭ সের	২-২॥ মণ	মাঘ-ফাল্গুন
রিয়া	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/২ সের	২-২॥ মণ	আষাঢ়-শ্রাবণ
রেড়ি	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৩।৪ সের	৪ মণ	পৌষ-মাঘ
বাজরা	আষাঢ়-শ্রাবণ	/২ সের	২ মণ	আশ্বিন
বিরীকলাই	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/২ সের	২ মণ	আশ্বিন-কার্ত্তিক
শণ		৪।৫ সের	৩।৪ মণ	ভাদ্র-আশ্বিন

ফসলের নাম	বপনের সময়	বীজের পরিমাণ	উৎপন্নের পরিমাণ	ফসল উত্তোলনের সময়
শ্যামা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	/২ সের	৩৷৷ মণ	ভাদ্র-আশ্বিন
সরিষা	ভাদ্র-আশ্বিন	/১ সের	১৷৷-২ মণ	ফাল্গুন-চৈত্র
সরগুঁজা	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	৫৷৬ সের	২ মণ	অগ্রহায়ণ-পৌষ
কুলথকলাই	আশ্বিন-কর্তিক	৩৷৪ সের	১ মণ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
রবার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	—	গাছ প্রতি /৩	—
হলুদ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৩০ সের	১৫৷২০ মণ	মাঘ-ফাল্গুন
শটী	আশ্বিন	১ মণ	৫০৷৬০ মণ মূল	পৌষ
অ্যালো	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ	৩০০ চারা	—	৩ বৎসর পর

ফসলের নাম		আয়	ব্যয়	লাভ
অড়হর		২০৲	৮৲	১২৲
ইক্ষু	গুড়ে	২০০৲	১২৫৲	৭৫৲
	কাঁচা গাছে	২৫০৲	১২৫৲	১২৫৲
এরারুট		১০০৲	৫০৲	৫০৲
ক্যাসোয়া		১৫০৲	৫০৲	১০০৲
কাওন		১০৲	৫৲	৫৲
কুসুম ফুল		১৫৲	৫৲	১০৲
কোদো		১০৲	৫৲	৫৲
খেসারি		১২৲	৫৲	৭৲
গম		৩০৲	২০৲	১০৲
গোঁদলি		৮৲	৪৲	৪৲

ফসলের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ
গোলমরিচ	২০০৲	৫০৲	১৫০৲
চই	১০০৲	৫০৲	৫০৲
চিনা	১০৲	৫৲	৫৲
চিনাবাদাম — শুঁটী			
চিনাবাদাম — তৈল	৭০৲	২০৲	৫০৲
জোয়ার	২০৲	১০৲	১০৲
তামাক — দেশী (হিংলী ও মতিহারী) অপেক্ষা বিলাতী সিগারেট, চুরুট প্রভৃতি তামাকের চাষে লাভ বেশী।	১০০৲	৫০৲	৫০৲
তিল — শস্য	২০৲	১০৲	১০৲
তিল — সুগন্ধি তৈল	১৫০৲	৫০৲	১০০৲

ফসলের নাম		আয়	ব্যয়	লাভ
তুলা	আঁশ বা সূতা বাহির করিয়া লইলে যে বীজ অবশিষ্ট থাকে তাহা কলে পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া যায়। যে ছিবড়া বা খইল অবশিষ্ট থাকে তাহা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ইহাদের একটি মূল্য আছে।	৩০৲	১০৲	২০৲
ধঞ্চে		১০৲	৪৲	৬৲
পাট		৪০৲	২০৲	২০৲
পান	প্রথম বৎসরে খরচা বেশী। দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত খরচা খুব কম লাগে। গড়ে	৭০০৲	২০০৲	৫০০৲

ফসলের নাম		আয়	ব্যয়	লাভ
ফাপর		১২৲	৫৲	৭৲
ভুট্টা	কাঁচা	৩০৲	৮৲	২২৲
	পকদানা	১৫৲	৮৲	৭৲
মটর	কাঁচা শুঁটী	৩০৲	৫৲	২৫৲
	ডাইল	১৫৲	৫৲	১০৲
মুগ		১৫৲	৫৲	১০৲
মাদুর কাঠি		৮০৲	২০৲	৬০৲
মাড়ূয়া		৬৲	২৲	৪৲
মুর্গা		৬০৲	২০৲	৪০৲
মসুর		১৬৲	৬৲	১০৲
মসিনা বা তিসি	তৈল	১৫৲	৫৲	১০৲
	সূতা	৫০৲	৫৲	৪৫৲

ফসলের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ
যব	২২৲	১২৲	১০৲
যই	১২৲	৪৲	৮৲
পিঁপুল	২০০৲	৩০৲	১৭০৲
রিয়া	৪০৲	১৫৲	২৫৲
রেড়ি	৪০৲	১২৲	২৮৲
বাজরা	৮৲	৩৲	৫৲
বিরীকলাই	৭৲	২৲	৫৲
মাষকলাই	৬৲	২৲	৪৲
কুলথকলাই	৮৲	২৲	৬৲
শণ	৩০৲	১৫৲	১৫৲
সরিষা	৮৲	৩৲	৫৲
সরগুঁজা	১০৲	৩৲	৭৲

ফসলের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ
শ্যামা	৮৲	৩৲	৫৲
নীল	১২৫৲	২৫৲	১০০৲
হলুদ	১২৫৲	২৫৲	১০০৲
শটী	১০০৲	৫০৲	৫০৲
ছোলা	১২৲	৫৲	৭৲
ধনে	২০৲	৫৲	১৫৲
মৌরী	২৫৲	৫৲	২০৲
ধান আউস	২২৲	১৪৲	৮৲
আমন	৩৫৲	২০৲	১৫৲
বোরো	২০৲	১৪৲	৬৲

পরিশিষ্টাংশ

(খ)

ফসলের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Crops)

ফসলের শ্রেণীবিভাগ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নানা লোকে নানাভাবে করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ফসল জন্মাইবার সময় অনুযায়ী উহাদিগকে ভাগ করিয়া থাকেন। ইহাকে Seasonal Classification বলা হয়। কেহ কেহ ফসলকে খাদ্যশস্য, ডাইল, তৈল, তন্তু প্রভৃতি এক-একটি বিভিন্ন বর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভাগ করিয়াছেন। ইহাকে ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ (Economic Classification) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক কৃষি-অভিজ্ঞ মনীষিগণ ফসলের প্রকৃতি বা উহাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন-না-কোন একটি মিল বা সামঞ্জস্য রাখিয়া ফসলকে ভাগ করিয়া থাকেন। ইহাকে Botanical Classification বলা হইয়া থাকে।

Seasonal Classification

(সাময়িক শ্রেণীবিভাগ)

ফসলকে মোটামুটি রবি ও খরিপ এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। যে সমস্ত ফসল শরৎকালে লাগাইয়া

শীতের পর উঠান হয় তাহা রবি এবং যাহা বর্ষার পূর্ব্বে লাগাইয়া শরৎকালে উঠান হয় তাহা খরিপ ফসলের অন্তর্ভুক্ত। রবি ফসল সাধারণতঃ বৃষ্টির জল পায় না। শিশির ও সেঁচের জল এবং বর্ষার পর মাটিতে যে রস থাকে তাহাতেই রবি ফসল জন্মান যায় কিন্তু বর্ষার জল না পাইলে খরিপ ফসল হয় না, কেবল সেঁচের জলে ইহা ভাল জন্মান যায় না। গম, তামাক, মটর, মসূর, মসিনা, যব, যই, সরিষা, কুলতি, কুসুম ফুল প্রভৃতি রবি এবং পাট, ফাপর, ভুট্টা, শণ, নীল, ধান, তূলা, বরবটী, চিনাবাদাম, জুয়ার প্রভৃতি খরিপ ফসলের অন্তর্ভুক্ত। কাওন, কোদো, ফাপর, শ্যামা, চিনা, জুয়ার প্রভৃতি সাধারণতঃ বর্ষার সময় জন্মাইয়া শরৎকালে উঠান হইলেও এগুলি অনাবৃষ্টির শস্য, অল্পবৃষ্টিতেও ইহাদের জন্মান চলে। মুগ, তূলা, ভুট্টা, বরবটী, শণ, জুয়ার প্রভৃতি রবি ও খরিপ এই দুই সময়েই বপন করা চলে। আবার আদা, হলুদ, পান প্রভৃতি কতকগুলি ফসল রবি বা খরিপের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্ভিন্ন এমন দু'চারটি উড়ো ফসল (Catch Crops) আছে যাহাদের ফলন রবি ও খরিপের মাঝে ২।১ মাসের মধ্যেই পাওয়া যায়।

Economic Classification
(ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ)

খাদ্যশস্য (Cereal Crops), ডাইলবর্গ (Pulses), তন্তুবর্গ (Fibre Crops), তৈলবর্গ (Oil Seeds) প্রভৃতি এক-একটি বিভিন্ন বর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যবহারের সুবিধা অনুযায়ী যে সমস্ত ফসলের শ্রেণীবিভাগ ঠিক করা হইয়াছে তাহাকে ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ (Economic Classification) বলা হয়।

Cereal Crops (খাদ্যশস্য) :—ধান, চাল, গম, যই, যব, ফাপর, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি খাদ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত।

Pulses (ডাইলবর্গ) :—ছোলা, মটর, মসুর, খেসারী, অড়হর, বরবটী, মুগ, কুলত্থি প্রভৃতি ডাইল শস্য।

Oil Seeds (তৈলবর্গ) :—সরিষা, তিসি, রাই, রেড়ি, সরগুঁজা, চিনাবাদাম প্রভৃতি তৈলশস্য।

Fibre Crops (তন্তুবর্গ) :—পাট, শণ, তূলা, রিয়া, ওলট-কম্বল, মেস্তা, মুর্গা ইত্যাদি তন্তুবর্গের অন্তর্গত।

Spices (মসলা জাতীয়) :—ধনে, মৌরী, মেথি, জিরা, রাঁধুনি ইত্যাদি মসলা জাতীয় শস্য।

Narcotics (নেশা জাতীয়) :—আফিং, গাঁজা, সিদ্ধি, তামাক, চা, কাফি, পান ইত্যাদি।

Underground Crops (মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ফসল) :—আদা, হলুদ, এরারুট, ক্যাসোয়া, শটী, শিমুলআলু, গোলআলু ইত্যাদি।

Sugar Crops (শর্করা জাতীয়) :—আক, তাল, খেজুর, বীট প্রভৃতি।

Fodder Crops (পশুখাদ্য) :—ভুট্টা, জোয়ার, যই, মটর, বাকলা, রিয়ানা, লুসার্ণ, ম্যাঙ্গোল্ড, গিনিঘাস, নেপিয়ারঘাস ইত্যাদি।

Dyes (রং জাতীয়) :—নীল, কুসুম ফুল, পলাস, বাবলা, জাফরাণ, নটকান ইত্যাদি।

Timber (কাষ্ঠ জাতীয়) :—শাল, সেগুণ, মেহগ্নি, দেবদারু, শিশু ইত্যাদি।

Fruits (ফল জাতীয়) :—আম, জাম, লিচু, জামরুল, গোলাপজাম, আতা, নোনা, সপেটা ইত্যাদি।

Country Vegetables (দেশী সব্জী) :—লাউ, কুমড়া, বেগুন, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, পটল, ঢেঁড়শ, সীম ইত্যাদি।

English Vegetables (বিলাতী সব্জী) :—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, লেটুশ, শালগম, গাজর, বীট, টমেটো ইত্যাদি।

Pot Herbs (শাক জাতীয়) :—পালম, নটে, বেথুয়া, সেজ, থাইম, পুদিনা ইত্যাদি।

Botanical Classification
(প্রাকৃতিক বর্গ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ)

ধান, গম, যব, আক, বাঁশ, শণ প্রভৃতি গাছের গ্রন্থি ও পাতার মধ্যে সাদৃশ থাকায় উহারা Graminaceae (ঘাস জাতীয়) ; মটর, মসূর, মুগ, খেসারী, অড়হর, থইঞ্চা, সীম, বরবটী প্রভৃতির শুঁটীর মধ্যে সাদৃশ থাকায় উহারা Leguminosae (শুঁটী বা সীম্বী জাতীয়) ; ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মূলা, সরিষা প্রভৃতির বীজের আকার প্রায় একই রূপ বলিয়া উহারা Cruciferea (সরিষা জাতীয়) প্রভৃতি এই ভাবে প্রাকৃতিক বর্গ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করার নাম Botanical Classification.

সমাপ্ত